প্রেম

সম্পাদনা / অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের
যশস্বী কথাসাহিত্যিক,
কবি ও প্রবন্ধকারদের নির্বাচিত
প্রেমের গল্প, প্রেমের কবিতা,
প্রেম বিষয়ক প্রবন্ধ এবং
পাঁচজন খ্যাতনামা শিল্পীর
পাঁচটি প্রেমের ছবি নিয়ে
প্রকাশিত হ'ল এই অনবদ্য
প্রেম-সংকলন

লেখসূচী

*** গল্প ***

*** কবিতা ***

* প্রবন্ধ *

* ছবি *

—

গল্প

গল্প

॥ আদি ॥

"আমি অস্বীকার করছিনে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা…"

সুপর্ণা দু'হাত বাড়িয়ে শৈবালের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো, "দোহাই তোমার, বুড়ো বাবা-ঠাকুর্দার মতো জ্ঞানের বাক্য শুনিও না। কোথায় একটা মজার গল্প বলতে এলুম, শুনে এন্‌জয় করবে। তা না, সেলফ্ ক্রিটিসিজম শুরু করে দিলে।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মধু।" শৈবাল সুপর্ণার ডাক নামে ডেকে, ওর নিখুঁত ম্যানিকিওর করা পারফিউমের নেশা ধরানো গন্ধমাখা কোমল ফরসা হাত দুটি মুখ থেকে টেনে বুকে রাখল, "তোমার মজার গল্পের নায়ক নায়িকা, অরিন্দম আর কৃষ্ণা সম্পর্কে তা হলে লোভের কথা বললে কেন? আর ওদের করুণা করার কথাই বা তোমার মনে এলো কেন?"

সুপর্ণা ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার দেখে নিল। কারণ শৈবাল যে কেবল ওর হাতদুটো টেনে বুকের ওপর নিল, তা নয়। ওকেও টেবিলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা কাছে টেনে নিল। ঈষৎ বাধা দেবার চেষ্টা করলো। ফলে ফবুজ বনে লাল ফুল ছাপানো পিওর সিল্কের শাড়ির আঁচল খসলো। শাড়ির সঙ্গে অভিন্ন রঙের মেশানো জামায়, অনম্র উদ্ভিন্ন বুকের একদিক উদাস। অতি অনুজ্জ্বল ওষ্ঠরঞ্জনী মাখা পুষ্ট ঠোঁট টিপে, ওর স্বাভাবিক সরু ভ্রূকুটি চোখে শৈবালকে হানলো। কপালের সামনে, ছাঁটাই করা নরম কালো চুলের গোছা এসে পড়েছে প্রায় ওর দীর্ঘায়ত কালো চোখের ওপর। "কী করছো? এটা তো তোমার অফিস-ঘর বলেই জানি। দরজাটাও খোলা।"

"ভুল কথা একটাও বলোনি।" শৈবাল ওর ঝকমকে দাঁতে হেসে সুপর্ণাকে কোনো অবকাশ না দিয়েই ঝটিতি প্রায় বুকের সংলগ্ন করলো, "কেবল ভুলে গেছ, দরজার বাইরে একজন বেয়ারা আছে। আর দরজার বাইরে, লাল বাতিটার সুইচ আমি আগেই অন করে দিয়েছি। যাকে বলে রক্ত-চক্ষুর নিষেধ-সংকেত।"

সুপর্ণা দেখল, ওর বুকে ঠেকেছে শৈবালের কপাল। পোশাকে-আশাকে আর বাকচাতুর্যে যতো আধুনিকই হোক, বুকের স্পর্শে একটা শিহরিত লজ্জাকে চাপা দায়। বদ্ধ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও কোনরকমে শৈবালের হাত থেকে, একটা হাত ছাড়িয়ে, ওর মাথাটা সরিয়ে দিল। ঢেউ খেলানো চুলের মুঠি আলগা করে ধরলো। মুখে ততক্ষণে লেগে গিয়েছে রক্তচ্ছটা, "মতলবটা কি তোমার বল দিকিনি? আমি তো তোমাকে ওরকম প্রভোক করতে চাইনি। তবে কেন...."

"আমার ইংরেজি বাঙলা, দুই-ই খুব খারাপ।" শৈবাল চেয়ার থেকে মুখ তুলে সুপর্ণার লজ্জা আর অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আসলে, তুমি তো সমস্ত দিক দিয়ে আমার চোখে মূর্তিমতী প্রোভোকেটর। কিন্তু ঘরে ঢুকে দু'কথার পরেই তুমি আমাকে বলেছিলে, আমার মধ্যে তুমি অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা দেখতে পাও না। ...আহা, না না, আমি অবিশ্যি ও কথাটার জবাব দিতে বা শোধ নিতেই, এসব কিছু করছিনে। তুমি ভালোই জানো, অরিন্দমের পাগলা দাপানি আমার সত্যি নেই, কারণ আমার স্থান কাল পাত্রী নিয়ে হারানোর ভয় আর ছটফটানি নেই। অফিসের কামরায়, এমন অসময়ে, তোমার সদ্য লাগিয়ে আসা ঠোঁটের রঙ চুষে নেবো, এতোটা কাণ্ডজ্ঞানহীনও আমি নই। তবু যে কেন তোমাকে কাছে টেনে নিলুম—মানে—"

শৈবাল কথাটার শেষ খুঁজে পেলো না। মুখের হাসিতে একটা অসহায় অভিব্যক্তি। ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে, সুপর্ণা দু'হাত সরে

দাঁড়ালো। ঘাড় ঝটকা দিয়ে কপালের চুলের গুচ্ছ সরাতে গিয়ে, নতুন করে আর এক গুচ্ছ চুল কপালে এসে পড়লো। বয়েজ কাট থেকে কয়েক ইঞ্চি বড় চুল, ঘাড়ের কাছে বন্ধনহীন অবাধ্য হয়ে যেন ফুঁসছে। ঘাড় ওর সোজা হল না। সুক্ষ্ম কাজলটানা আয়ত কালো চোখে ভ্রুকুটি দৃষ্টি। সবুজবনে লাল ফুল ছাপানো রেশমী শাড়ির আঁচল টানল বুকে। কিন্তু যতটা টানলো, ততটা খসলো। টানা চোখ, টিকলো নাক, ঈষৎপুষ্ট ঠোঁট, প্রায় ফরসা রঙ, সব মিলিয়ে ওকে রূপসী বলা যাবে কি না সন্দেহ। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্ত-রকম রমণীয় সৌন্দর্যই ওর আছে। স্বাস্থ্যে আছে দীপ্তি। বাড়তি মেদ বলে কিছুই নেই, অথচ প্রায় দীর্ঘ শরীরের গঠন নিখুঁত। কাঁধে ঝুলছে কাজের মেয়েদের মতোই বড় ব্যাগ। বাঁ হাতে ঘড়ি। কানে ছুটো ছোট মুক্তো। বয়েসটা বাড়িয়ে বলতে ভালবাসে। কারণ জানে, ওর বয়েসটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে হলে ওকে নিয়েই ঘামাতে হয়। চব্বিশটাকে আটাশ বললেও, আটাশে টসটসই করে। কিন্তু এখন ওর ঘাড় বাঁকানো ভ্রূকুটি চোখে যেন খুবই বিরক্তি, উত্তেজনা আর অভিযোগ "মানেটা বলো, তবু কেন ওরকম কাছে টেনে নিলে?"

"যে-কথাটার জবাব কোনদিন দিতে পারিনি, সেই কথাটাই তুমি জিজ্ঞেস কর।" শৈবাল ওর ঘুরন্ত চেয়ারে একটু বাঁ দিকে টাল খেলো। "তোমার সঙ্গে যা সব করি, তাকে অসভ্যতা বলে কিনা জানিনে। তবে এখন তুমি আমাকে অসভ্য বলোনি। যে-শব্দটা সত্যি প্রোভোকেটিং। আসলে কী জানো রিন্‌টি (সুপর্ণার ডাক নাম) এক এক সময় কেমন হেলপলেস হয়ে যাই। অসহায়কে করুণা কর। দয়া করে বস। অরিন্দম আর কৃষ্ণার মজার কিস্‌স্যাটা শোনা যাক।"

বত্রিশ বছরের শৈবাল। অধিকাংশ বাঙালীর মতোই শ্যামলা রঙ। বড় চোখ ছুটো ঢুলুঢুলু। বুদ্ধির দীপ্তিটাকে শানিয়ে রাখার

দরকার করে না। নিজেকে কোনো দিক থেকেই অসাধারণ দেখানো বা জানানো লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। ভালো কোম্পানির একজন উপযুক্ত একজিকিউটিভ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সহজেই। প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ডিরেকটদের আস্থা-ভাজন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আছে একটা অনায়াস মেলামেশা। অথচ এর সমস্ত কিছুর মধ্যেই কোথায় যে একটা দূরত্ব আছে, তা সহজে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু অপরকে সেটা অনুভব করতেই হয়। তবে অহংকারি কেউ বলে না ও কে। মাঝারি লম্বা। সাদা ফুল স্লিভ শার্ট আর ট্রাউজার ওর প্রিয়। অপ্রিয় হল, রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলে কণ্ঠ-লেঙুটি। রোমাণ্টিক চেহারার বাঙালী যুবক বলতে যা বোঝায়, একরকম তাই বলা যায়। কিন্তু এখন ও সুপর্ণার সঙ্গে যা-ই করে থাকুক, আসলে বত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় ওকে শান্ত আর চিন্তাশীল বলে মনে হয়।

সুপর্ণা বোধহয় ভেবেছিল, আরও কিছু বলবে। কিন্তু শৈবালের কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে ওর ভ্রূকুটি চোখে হাসির ঝিলিক হানলো। এবং ঠোঁট ফুলিয়ে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করলো, "অসভ্য !"

"উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে।" শৈবাল যেন দাঁড়াবারই উদ্যোগ করলো।

সুপর্ণা বসে পড়লো মুখোমুখি চেয়ারে, "কারণ আবার অসহায় হয়ে উঠছো, না? কিন্তু ঐ যে কী সব সেলফ্ ক্রিটিসিজম শুরু করেছিলে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা··· ?

"সেটা আর বলতে দিলে কোথায়?" শৈবাল টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখালে। দু'চোখে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সুপর্ণার অনুমতি প্রার্থনা।

সুপর্ণা ঠোঁটের ভঙ্গি করে, আবার ভ্রূকুটি চোখে তাকালো, "যেন বারণ করলেই শুনবে।"

"অথচ শুনলে কত ভাল হয়।" শৈবাল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। টেবিল থেকে গ্যাস লাইটারটা জ্বেলে নিল। জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল, "ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার ঘটনা বলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমাকে বসতে বলেছিলুম। তখন তোমার সেই অ্যালিগেশনটা শোনা গেল, অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাও না। জানতুম, কথাটা, তুমি মন থেকে বলোনি। তাই হেসে আবার বলেছিলুম, বস, তারপরে বল। কিন্তু তুমি বসোনি। আমাকে মিথ্যেই একটু খোঁচা দিয়ে, তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সমালোচনা শুরু করে দিলে। বললে ওরা নির্লজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র তখনই আমি এদের সমর্থনে ঐ কথাটা বলেছিলুম, আমি অস্বীকার করছিনে, আমরা এযুগের ছেলেমেয়েরা···"

শৈবাল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো। সুপর্ণা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে, পাশের চেয়ারে রাখলো। ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত দিয়ে তাকালো। ওর ঠোঁটের হাসিতে বক্রতা, "কথাটা শেষ কর।"

"স্বার্থপর মানে আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা।" শৈবাল হাসলো, "স্বীকারোক্তিটা তুমি আমার মুখে আগেও শুনেছো। তাই কথাটা শোনবার আগেই তোমার ঠোঁট বেঁকে উঠেছে। অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে দিয়ে কথাটা হয় তো আরো ভাল করেই প্রমাণ করা যায়। আসলে আমার বক্তব্য ছিল, অস্বীকার করবো না, আমরা স্বার্থপর। কিন্তু যাঁরা এই অভিযোগটা করেন, তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখতেন, কেন আমরা স্বার্থপর হয়েছি, তা হলে বুঝতে পারতেন, এ ভূমি আর বৃক্ষ সবই তাঁদের হাতে তৈরি। সেজন্য জেনারেশন গ্যাপ্ কথাটায় তাঁদের খুব সুবিধে করে দেয়। কিন্তু কী দেখছি আমরা ? স্বার্থপর বলে কি, বোকা কিংবা উল্লুক হয়ে গেছি ? অথবা অন্ধ ? কিছুই বুঝিনে ? আমাদের এ যুগটার ছেলেমেয়েদের

বিরুদ্ধে যাঁদের স্বার্থপরতার অভিযোগ, তাঁরা সবাই পরার্থপর ? এ সময়ের সমস্ত চেহারাটার দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। পরার্থপর পিতৃদেবদের মালিন্য....নাহ্ রিন্‌টি, এসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এর চেয়ে অরিন্দম আর কৃষ্ণার গল্প অনেক উপাদেয়। ও সব সেলফ্ ক্রিটিসিজম-টিজম, অল বোগাস্! লেট্ আওয়ার লার্ণেড প্যারেন্ট টু টেল দোজ স্টোরিজ। তারপরে অরিন্দমটা কী করলো ? ঘরের ভেতর দরজার আড়ালে যেতে না যেতেই, কৃষ্ণাকে চুমো খেলো তারপরেই হুইস্কির বোতলের মুখটা খুলে ফেলল বাসুদেবের সামনেই...”

সুপর্ণা চেয়ারের পেছনে এলিয়ে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। অবাধ্য রেশমী শাড়ির সবুজ বনে লাল ফুল কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়তে লাগলো। “বাসুদেব নয়, আমার সামনে। কিছুই মনে নেই তোমার। বাসুদেব তখন তালা লাগানো অফিস-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।”

“তোমার সামনে ?” শৈবাল যেন স্বস্তিতে এলিয়ে পড়লো ওর চেয়ারে, “সেটা তবু অনেক ভালো। তুমি হলে ওদের বন্ধু। আর বাসুদেব হল তোমার বাবার অফিসের কেয়ারটেকার। তোমার চোখে ঘটনাটা একরকম। বাসুদেবের চোখে ঠেকতো আর এক রকম। অবিশ্যি তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সম্পর্কে মন্তব্য করেছো, নির্লজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর।”

সুপর্ণা হাসতে হাসতে, কপালের চুলের গোছা সরিয়ে দিল, “তা বলেছি, কিন্তু রেগে বলিনি। ওদের পাগলামি দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। আর সত্যি লজ্জা করছিল, যদি বাসুদেব দেখতে পেতো ? আর কিছু না। একটা সাজানো খালি ঘর পেয়েই ওরা দুজনে যেরকম....হুইস্কির বোতল খোলাটা কিছু নয়। বাসুদেবই তো জল গেলাস দেবার লোক...কী ব্যাপার ? তুমি যেন আবার কিছু ভাবতে আরম্ভ করছো ?”

"আমি ?" শৈবাল চমকে সোজা হয়ে বসলো। হাসলো, "না না, কিছুই ভাবছিনে। গোটা ব্যাপারটা একেবারে প্রথম থেকেই আবার শোনা যাক। অরিন্দম অফিসে তোমার ঘরে টেলিফোন করলো। তারপর তোমাকে লাইনে পেয়ে বললো, সুপর্ণা! আমি আর কৃষ্ণা…"

সুপর্ণা ওর ঝরে পড়া রেশমী শাড়ি তুলে, বুকের জামায় গুঁজলো। ঘাড় নাড়লো, "উঁহু। অরিন্দম ইণ্টারকমে জিজ্ঞেস করলে, সুপর্ণা, ছটা বাজে। তোমার কি অফিসে এখনো কাজ আছে? আমি বললুম, একটু। কেন বলো তো? অরিন্দম…"

"থাক।" শৈবাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো, "ব্যাপারটা আজকের নয়। ক'দিন ধরেই চলছে। তার চেয়ে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। টোটাল অ্যাফেয়ারটার তো শুরু দু সপ্তাহের। মানে, তোমার বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম…"

সুপর্ণা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল। ঠোঁট বাঁকালো ঈষৎ "তোমার মতো সকলের চার বছর লাগে না। তোমার হল তুলনাহীন প্রেম।"

"সেরকম কোনো দাবী নেই।" শৈবাল সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে গুঁজে দিল "চারি চক্ষের মিলনে প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেম সঞ্চারিত হইল—মানে প্রথম দর্শনেই প্রেম। এই রীতির কথা তুমি বলছো। বেশ মেনে নিলুম। তবু গোড়া থেকেই শুনি। কী খাবে বল।"

সুপর্ণা ঘাড় নাড়লো, "কিছুই না। অন্তত তোমার এই ঠাণ্ডা অফিস ঘরে না। বাইরে চল। সময়ও বেশিক্ষণ হাতে নেই। তুমি সঙ্গে আছ বলেই, বড় জোর রাত সাড়ে ন'টা অব্দি বাইরে অ্যালাউড।"

সুপর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হয়েছে ছ' মাস। ডিপার্টমেণ্ট মার্কেটিং। কোনো কোম্পানির এ বিভাগে চাকরি পাবার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি ওর ছিল না। একেবারে অযোগ্যাও ছিল না।

কমার্সে এম-এ পাশ করে, ও যখন ভাবছিল, বেশ একটা গাল ফোলানো নামের সংস্থায়, এবং এক বিশিষ্ট অডিটরের অধীনে, একাউন্টেন্সিতে হাত পাকাবে ভবিষ্যতের কেরিয়ারের জন্য, তখনই মার্কেট রিসার্চের জন্য নামী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েছিল। অথচ দরজায় দরজায় ঘুরে ঐ সমীক্ষার কাজে ওর যাবার কথা নয়। বাবা মা আপত্তি করেছিলেন। শৈবালেরও অন্তরে সায় ছিল না। কিন্তু সুপর্ণার যুক্তির কাছে ও হার মেনেছিল। যুক্তিটা হল, 'কোনো কাজই ছোট নয়।' অবিশ্যি ফলটা শেষ পর্যন্ত খারাপ হয়নি। ইন্টারভিউ পেয়েছিল। এক ডজন মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল। কৃষ্ণা তখন সেই দলে ছিল না। অরিন্দম সেই মার্কেটিং বিভাগের একজন ছোটখাটো অফিসার। মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্য করাটা ছিল ওর কাজ। প্রত্যেক মেয়ের প্রতিদিনের রিসার্চের রিপোর্ট দেখতেন মার্কেটিং ম্যানেজার। অরিন্দমের সঙ্গে সুপর্ণার তখন থেকেই একরকমের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কারণ, অরিন্দমের বয়স কম। অফিসারসুলভ আচরণ করতো না। অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্যের ব্যাপারে, ও প্রায় সবাইকে ওর সহকর্মীর মর্যাদা দিতো। মেলামেশা করতো বন্ধুর মতো।

এক ডজন মেয়ের মধ্যে, শিকে ছিঁড়েছিল সুপর্ণার ভাগ্যে। মার্কেটিং ম্যানেজার ওর দৈনিক রিপোর্ট দেখে উৎসাহী হয়েছিলেন। নতুন করে ওর দরখাস্তটা দেখেছিলেন উল্টে-পাল্টে। মার্কেটিং-এর সঙ্গে দাম-দস্তুরের হিসাব নিকাশের সম্পর্কটা বিশেষ কেউ যাচিয়ে দেখে না। সুপর্ণা দেখতো। ওর রিপোর্টেও সেটা থাকতো। এরকম একটি কাজের মানুষের দরকারও ছিল তখন। মার্কেটিং ম্যানেজার সুপর্ণাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, ঐরকম কোনো পদ ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। সুপর্ণা কারোর সঙ্গে পরামর্শ না করেই, মার্কেটিং ম্যানেজারকে ওর সম্মতি দিয়ে দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে সুপর্ণার সেটা একটা দৈবযোগে সৌভাগ্যের ঘটনা বলতে হয়।

অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের কাজের মেয়াদ ছিল দু সপ্তাহের। কোম্পানীর গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় নেমে যাওয়া, এবং আরো পথ খরচা বাদ দিয়ে ওদের দৈনিক বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। আধুনিক কোম্পানীগুলো বাজার সমীক্ষার জন্য ডজন ডজন ছেলে মেয়েদের স্থায়ী চাকরি দেয় না। প্রয়োজন হলেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই ডাক পড়ে বেশি।

সুপর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হবার পরে, দুবার বাজার সমীক্ষার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অরিন্দম যদিও ছোটখাটো একজন অফিসার, কিন্তু সুপর্ণার সহকর্মী। অবিশ্যি বাজার সমীক্ষার মেয়েদের নিয়ে সুপর্ণার কিছু করার ছিল না। অরিন্দমকেই ঐ বিষয়টি দেখতো হতো। দ্বিতীয় বারের সমীক্ষক মেয়েদের দলে, কৃষ্ণার আবির্ভাব।

অরিন্দম ঐ সব মেয়েদের সাহায্য করে, ভালোভাবেই কাজ গুছিয়ে নিতে পারতো। ও একজন রসিক যুবক, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে, ওর রসিক প্রাণে প্রেমোদয় ঘটেনি। কৃষ্ণার চোখে চোখ পড়তেই, সেইটি ঘটে গেল। দু সপ্তাহের মেয়াদে, অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা করে ও কৃষ্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেখা গেল, কৃষ্ণার একই দশা। দুহু দোঁহা করে লীলা, সাক্ষী অন্তর্যামী। কিন্তু এসব বিষয় বেশিক্ষণ চেপে রাখা দায়। অরিন্দমের পক্ষে, অফিসে কথাটা প্রাণ খুলে বলবার মতো একজনই ছিল। সুপর্ণা। অতএব, অফিস ছুটির পরে সুপর্ণাকে বন্ধু ও তার প্রেমিকাকে দু তিনটি সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সাহচর্য দিতে হল। আর সব কথা শৈবালকে না শোনালে চলতো না।

কৃষ্ণাকে কি সুপর্ণার খুব ভালো লেগেছিল? দেখতে মেয়েটি খারাপ নয়। এক ধরনের আদুরে ফুলটুসি গোছের মেয়ে। চেহারাটি ছোটখাটো হলেও, স্বাস্থ্য ভালো। ওর ইংরেজি বলার ভঙ্গিটি আকর্ষণীয়। কিন্তু বড্ড ভুল বলে। ওর বাবা একজন অবসর-প্রাপ্ত চটকলের লেবার অফিসার। জীবনের শেষ সঞ্চয় নাকি নাক-

তলায় একটা বাড়ি আর দিদির বিয়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। তারপরেই পর পর দুবার সেরিব্রালে আক্রান্ত হয়ে, একেবারে জ্যান্ত মরা হয়ে আছেন। অথচ ভাই বোনের সংখ্যা চার। আর তাদের সকলের জ্যেষ্ঠ আপাতত কৃষ্ণা। মা আছেন সংসারে। ফলে কৃষ্ণার দায়িত্ব বেশি। টেনশনও। অথচ অরিন্দমকে প্রথম দর্শনেই, পঞ্চশরে কে যে কাকে বিদ্ধ করলো, বোঝা গেল না। কৃষ্ণার এখন অরিন্দমই গতি, মতি। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। প্রেমে নির্ভয়। অরিন্দমের কাজ মাথায় উঠলো। উভয়েরই নাকি প্রথম প্রেম। বড় উদ্দাম সেই প্রেম।

সুপর্ণা এই উদ্দামতাকে পছন্দ করেছে। তার মধ্যে অবিশ্যি কথা আছে। কৃষ্ণাকে ওর অরিন্দমের যোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু সেটা ওর দেখবার নয়। অরিন্দম আর কৃষ্ণা উদ্দাম প্রেমে মেতে আছে। এই দেখেই সুপর্ণার ভালো লাগছে। যে-কারণে শৈবালকে না শুনিয়ে পারেনি, "তোমার আপন ঘরের চৌকাট ডিঙোতে সময় লেগেছিল দু' বছর। যখন তোমার জানার সময় হল, তুমি জয় করেছো, তখন মাঝে মধ্যে তোমার মধ্যে ঝড় উঠতে দেখা গেল। ডালপালা ভেঙে প্রচুর বর্ষণে ভাসিয়েও দিলে। কিন্তু তার ভেতর থেকেই বোঝা গেল শৈবাল দত্ত কেবল প্রেমিক নয়। প্রেমিক-সাধক। প্রেম তার কাছে সাধনার বস্তু। অতএব, সুপর্ণা গুহ হল তোমার আরাধ্য দেবী। অথবা কী বলবো? মাই ফেয়ার লেডি?"

"বাজে কথা।" শৈবাল আপত্তি করেছে, "ওটা আমার সঠিক মূল্যায়ন হল না। বলতে পারো, আমার মানুষিক প্রবৃত্তির মধ্যে, প্রকৃতির একটা বড় ভূমিকা আছে। তা বলে, এতে ভাবার কোনো কারণ নেই, আমি প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। এক অর্থে তুমি যেমন প্রকৃতি, তেমনি বিশ্ব নিখিলের প্রকৃতিও আমার মস্তিষ্কে একটা জায়গা করে রেখেছে। রিন্‌টি, তাতে যদি আমি সাতদিনে চৌকাট

ডিঙোতে না পারি, চৌদ্দ দিনের মধ্যে না পারি উদ্দাম হয়ে উঠতে, তা হলে জানবে, আমি নিরুপায় বলেই তা সম্ভব নয়।'

সুপর্ণা চোখ ঘুরিয়ে, গালে হাত দিয়ে বলছে, "কী নতুন কথাই না শোনালে। তোমার এ কথাগুলো যে শুনবে, সে-ই বলবে, এ সব মাটির সংসারের প্রেমের কথা নয়। উচ্চ মার্গের ঝাঁপিতে তুলে রাখার প্রেম। দরকারের সময়, ঝাঁপি খুলে, আদরে সোহাগে চেখে খেয়ে আবার তুলে রাখতে হয়। আমি অবিশ্যি তাতেই অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এখন আমি সময়োপযোগী খাঁটি মাটির সংসারের প্রেম দেখছি। হুঁহু লাগি দোঁহা মত্ত, এক ঠাঁই বিনা, রহিতে না পারে। একটু অবিশ্যি আদেখলেপনা লাগছে। কিন্তু দোষই বা দিই কেমন করে।"

"দোষ দেবার কিছু নেই রিনটি।" শৈবাল বলেছে, "সংসারে বিবিধের মাঝেই সৌন্দর্য আছে। সত্য আছে। এ সংসারটা তো অরিন্দম আর কৃষ্ণা ছাড়া নয়।"

অরিন্দম আর কৃষ্ণা যেন লক্ষহীন নক্ষত্রের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল। ওদের এমন একটা জায়গা ছিল না, প্রেম চরিতার্থ করবার মতো যেখানে নিভৃতে আশ্রয় নিতে পারে। সুপর্ণার প্রাণ উঠলো কেঁদে। শৈবালকে ও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অফিসের কাছেই ওর বাবার অফিস। অফিস সংলগ্ন বিশ্রাম নেবার মতো ঘর বিছানা, খাবার ব্যবস্থা, একটা ফ্রিজ, ছোটখাটো কিচেন, সবই ছিল। বাসুদেব বেরা তার পুরানো বিশ্বস্ত কেয়ার-টেকার। রাত্রে সেখানে অফিস ঘরের একপাশে তার ছোট ঘর। ষাট বছরের বাসুদেব, সুপর্ণাকে চেনে ছেলেবেলা থেকেই। সুপর্ণা প্রথমে একটু লজ্জা পেয়েছিল! কিন্তু অরিন্দম আর কৃষ্ণার জন্য কিছু একটা করার দায়িত্ববোধেই লজ্জা ত্যাগ করে, ওদের নিয়ে তুললো বাবার অফিসে। বললো, "বাসুদেবদা, এরা আমার বন্ধু। ঘণ্টা-দুয়েক থেকে চলে যাবে।

দরকার হলে, তুমি একটু দেখো।” অবিশ্যি আড়ালে আগেই বলে রেখেছিল, “বাবাকে যেন বলো না।”

বাসুদেব বলেছে, “তোমার হুকুম মানছি। কিন্তু দেখো রিনটি-দিদি, শেষে তোমার কাছ থেকেই যেন সাহেবের কানে কথাটা না যায়। তা হলে চল্লিশ বছরের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।”

অরিন্দম কৃষ্ণাকে ঐরকম একটি নিভৃত ঘরের মধ্যে পেয়ে, প্রথমেই যে-ভাবে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল, সুপর্ণার মোটেই ভালো লাগেনি। শৈবালকে ও মুখ ফুটে আরো যা বলতে পারেনি, তা হল, কেবল চুমো নয়। সেই মুহূর্তেই অরিন্দম আরো অধিক কিছু করতে উদ্যত হয়েছিল। খেয়ালই ছিল না সুপর্ণা তখন রয়েছে। বাসুদেব দূরে অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণার পর্যন্ত মনে হয়নি, সুপর্ণাকে বিদায় জানিয়ে, দরজাটা বন্ধ করা দরকার। এসব যে ওদের প্রেমের উদ্দামতারই অঙ্গ, সুপর্ণা তখন ততোটা মেনে নিতে পারেনি বলেই, শৈবালের কাছে অভিযোগ করেছে। ওরা লোভী নীতিজ্ঞানহীন নির্লজ্জ স্বার্থপর। সুপর্ণাকে বাধ্য হয়েই ওদের সামনে যেতে হয়েছিল। অরিন্দম অতএব, সেই ফাঁকে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর হেসে ক্ষমা চেয়েছিল, ‘সরি সুপর্ণা।’

“সরি-টরির কিছু নেই।” সুপর্ণা হেসেছিল, “আমি যাচ্ছি। তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও। বাসুদেবদা ফ্রিজ থেকে জলের গেলাস আর বোতল আগে দিয়ে যাক। আর খাবার-টাবার কিছু দরকার হলে, বাসুদেবদাকে বলো, এনে দেবে। গুড নাইট।”

অরিন্দম গভীর কৃতজ্ঞতায়, সুপর্ণার সঙ্গে করমর্দন করেছে, “জীবনে এ উপকারের কথা ভুলবো না।”

গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, সতের দিনের এই হল অরিন্দম-কৃষ্ণার প্রেম কাহিনী। রেড রোডের ধারে, গাছের ছায়ায় অন্ধকারে। গাড়ির মধ্যে বসে শৈবাল সুপর্ণার কথা সব শুনলো। হাওয়া ছিল

না। আবহাওয়া গুমোট। গাড়ির ভেতরে গরম হচ্ছিল। ঘামছিল দুজনেই, ঘন সান্নিধ্যে বসে। শৈবাল কোনো অবকাশ না দিয়েই, ঝটতি সুপর্ণার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালো। একটা সিগারেট ধরালো, "অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে আমি বেচারি বলে ছোট করবো না। কিন্তু তোমার মহত্বের তুলনা নেই। এই একটা বিষয়ে যদি, আজ সমীক্ষা করা যেতো, কতো তরুণ-তরুণী, একটু নিভৃতে আশ্রয়ের জন্য কলকাতা শহরের পার্কে বাগানে গঙ্গার আর ঝিলের ধারে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ এক মিনিটের সুযোগ পাচ্ছে না, তা হলে দেখা যেতো, চিত্রটা কী নিষ্ঠুর আর নিদারুণ। আমি জানিনে, অরিন্দমের হোটেল ঘর নেবার যোগ্যতা আছে কি না। কিন্তু ঐসব হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর হোটেল ঘর ভাড়া করার পয়সা নেই। তারা বেকার। তুমি তাদের জন্য বন্ধুকৃত্য করতে পারো না। সম্ভব নয়। কিন্তু তারা তোমার কীর্তির কথা শুনলে জয়ধ্বনি দেবে।"

"ঠাট্টা?" সুপর্ণা ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রুকুটি চোখে তাকালো। দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

শৈবাল মাথা নেড়ে হাসলো। টেনে ধরলো সুপর্ণার একটা হাত, "বিশ্বাস কর, সব বিষয়ে ঠাট্টা চলে না। আমি এ সময়েরই বত্রিশ বছরের এক যুবক। অরিন্দম কৃতজ্ঞতায় তোমার করমর্দন করেছে। আমি হলে তোমার মতো বন্ধুর পায়ে হাত দিতুম। এ যুগের ছেলে-মেয়েদের স্বার্থপরতার প্রসঙ্গে, আমার স্বীকারোক্তিটার মূলে ছিল এই কথাটাই। এ যুগ আমাদের কোথায়, কোন্ হতচ্ছাড়া শূন্যতায় ছুঁড়ে ফেলেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সুযোগ সুবিধে নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তার মানে, আমি তো যুগ ছাড়া নই।"

সুপর্ণা নিজেই শৈবালের দিকে মুখ তুলে ধরলো। তখনই খুব কাছ থেকে অন্য একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো যেন ওদের স্নান করিয়ে দিল। সুপর্ণা তাড়াতাড়ি শৈবালের বুকে মাথাটা নামিয়ে, গুঁজে দিল।

॥ মধ্য ॥

বেলা এগারোটা। শৈবাল অফিস এসেছে সাড়ে ন'টায়। সাড়ে দশটায় ডাক পড়েছিল জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে। জেনারেল ম্যানেজারের ঘর থেকে নিজের ঘরে ঢুকতেই বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। চেয়ারে না বসে ও রিসিভারটা তুলে নিল, "হ্যালো!"

'আমি রিন্‌টি বলছি।' ওপার থেকে সুপর্ণার উত্তেজিত স্বর ভেসে এলো। "ওরা গতকাল রাত্রে কী করেছে জানো?"

শৈবাল বলতে যাচ্ছিল, "তা আর জানি নে? কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেই মাথা নাড়লো, "কী করেছে? কোনোরকম···?"

"কোনোরকম টোনোরকম কিছু নয়।" সুপর্ণার স্বরে ঝাঁজ, "ওরা গতকাল সারা রাত্রি ওখানে ছিল। অরিন্দম আজ সকালে কৃষ্ণাকে নাকতলায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরেছে। অবিশ্যি, অরিন্দমের মুখ থেকে কিছু শোনবার আগেই, অফিসে এসেই বাসুদেবদার টেলিফোন পেয়েছি। বাসুদেবদাই আমাকে বললে, ওরা সারারাত্রি বাবার অফিসের ঘরে ছিল। আজ সকাল সাতটায় সেখান থেকে দুজনে বেরিয়েছে। আমি ভাবতে পারিনা, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে, আনম্যারেড, কী করে বাড়িতে না জানিয়ে সারারাত্রি বাইরে কাটালো।"

শৈবাল যেন সুপর্ণাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো, "কৃষ্ণা হয় তো বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে—"

"কিসের টেলিফোন? কোথায় টেলিফোন?" টেলিফোনের ওপার থেকে সুপর্ণার স্বর রোষে ফেটে পড়লো, "কৃষ্ণাদের বাড়িতে টেলিফোন নেই। সে-সব কথা একটু আগেই আমি অরিন্দমের মুখ থেকে শুনলাম। ও একটু বেলায় অফিস এসেছে। ও আমার সঙ্গে দেখা করে, নিজেই সব কথা বললে। অবিশ্যি ওর মুখ দেখতে

আমার ঘেন্না করছিল। কিন্তু অকপটে সব সত্যি কথা বলেছে—মানে ও যে গতকাল রাত্রে খুবই হেল্পলেস হয়ে পড়েছিল, সেটা আমাকে বুঝিয়েছে। আর কৃষ্ণার কথাও বললো, ও নিজেই কৃষ্ণাকে বাড়ি যেতে দেয়নি। সেইজন্যে ও নিজে গিয়ে কৃষ্ণাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে। অথচ অরিন্দম এর আগে কোনোদিন কৃষ্ণাদের বাড়ি যায়নি। মা বাবা ভাইবোনরা কেউ ওকে চেনে না। এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি নে। অরিন্দম যতোই ওকে গার্ড করার চেষ্টা করুক।"

শৈবাল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, "রিন্‌টি, অরিন্দম কৃষ্ণাকে তোমার কাছে গার্ড করবে কেন? ও তো তোমার কাছে সব কথা স্বীকার করেছেই। ও নিজেই কৃষ্ণাকে গতকাল রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেয়নি। কৃষ্ণা বেচারি—"

"কৃষ্ণা মোটেই বেচারি নয়।" সুপর্ণার স্বরে অবিশ্বাস আর ঝাঁজ, দুই-ই ভেসে এলো, "আমি অরিন্দমকে বলেছি, তুমি আটকে রাখলে বলেই কৃষ্ণা কী করে বাড়িতে না জানিয়ে সারারাত্রি বাইরে কাটিয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি একটা অচেনা ছেলে। তুমি পৌঁছে দিতে গেলে। কৃষ্ণার মা তোমাকে কিছু বললেন না? অরিন্দম বললে, কৃষ্ণার মা নাকি ওর কথা আগেই কৃষ্ণার মুখ থেকে শুনেছিল। সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেনি। অরিন্দম নিজে গিয়ে পৌঁছে দিতে, কৃষ্ণার মা নাকি খুব খুশি আর নিশ্চিন্ত হয়েছে। জানি নে, এ কেমন মা, আর কী করেই বা খুশি আর নিশ্চিন্ত হতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার এতদিনের পরিচয়। বাড়িতে তোমার আমার সম্পর্কের কথা কারোর জানতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু আমি তো এখনো ভাবতেই পারিনি, বাড়িতে কোনো খবর না দিয়ে, সারারাত্রি তোমার সঙ্গে বাইরে কোথাও থেকে যাবো। পারি কী?"

শৈবাল হাসলো, "তোমার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা দিচ্ছো কেন? সব

মেয়ে যদি একরকম হতো, তা হলে তো সংসারটার চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেতো। তা ছাড়া…"

"তা ছাড়া?" সুপর্ণার স্বর তৎক্ষণাৎ তারের ভেতর দিয়ে ভেসে এসে শৈবালের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শৈবালের মুখে ঈষৎ উদ্বেগ মিশ্রিত হাসি ফুটলো, "রাগ করো না রিন্‌টি। উদ্দামতার একটা ব্যাপার আছে তো। দুজনের অবস্থার কথা তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি, তাতে এরকম ঘটাটা কি খুব অসম্ভব? তা তুমি বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়েও, যতোই নির্লজ্জ, নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থপর বল, তুমি শেলটার দিয়েছিলে বলে গতকাল রাত্রে ওরা জীবনে প্রথম—ভেরি ন্যাচারেল। বিশেষ স্বয়ং কৃষ্ণাই যখন থাকতে রাজি হয়ে গেছলো—"

"থাক।" সুপর্ণা এক কোপে শৈবালের কথা থামিয়ে দিল, "তোমার মুখে ও কথা মানায় না। আমি রাজি হলেই কি তুমি ওরকম ভাবে রাত্রি কাটাতে পারতে?"

শৈবাল মাথা নাড়লো, "না, তা পারতুম না। প্রথমত তোমার বাড়িতে কোনো খবর থাকবে না, আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভবই হতো না। তুমিও রাজি হতে পারতে না।"

"আমার বিষয়ে এত নিশ্চিত হচ্ছো কেন?" সুপর্ণার স্বরে এতক্ষণে কিঞ্চিৎ হাসির তারল্য ভেসে এলো, "রাজি যদি হয়েই যেতাম, তা হলে?"

শৈবাল জবাব দিতে গিয়ে, ভ্রূকুটি চোখে রিসিভারের দিকে তাকালো। তারপরে হাসলো, "তা হলেও, রিন্‌টি, তুমি ঠিকই বুঝেছো, তোমার বাবা মাকে না জানানোর দায়িত্ব অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। তা ছাড়া আমার বাবা মা-ই বা কী দোষ করেছেন বলো! যতো স্বার্থপরই হই, তাঁরা জানেন, আমি অকারণে বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল হতে পারিনে।"

"অকারণে? সুপর্ণার স্বরে বিস্ময়, ওর কৌতুকের হাসিকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

শৈবাল হাসলো, "একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। যাই হোক, তা অকারণেই বই কি! আমার যদি তোমাকে নিয়ে বাইরে রাত্রি কাটাতেই হয়, কেনই বা আমি অকারণে, তোমার বা আমার বাড়ির লোকদের সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় রেখে দেবো? অন্তত এটা কেন জানাবো না, আমি রাত্রে বাড়ি ফিরবো না।"

"আসলে অরিন্দমের যে গাটস্ আছে, তোমাব তা নেই।" সুপর্ণার স্বরে হাসির ঝঙ্কার এখন স্পষ্ট।

শৈবাল এবার রিসিভারটা নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলো, "অস্বীকার করবো না। সীতা হরণের বেলায় রাবণের যে গাটস্ ছিল, রামের তা ছিল না। এটা তুলনা নয়। আমি আর অরিন্দম এক নই, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু রিন্‌টি গুহ আর কৃষ্ণা এক, এ সিদ্ধান্তে আমি এখনই আসতে পারছি নে।"

"ছাড়ো ওসব কথা!" সুপর্ণার স্বরে ব্যস্ততার সুর ভেসে এলো, "ছুটির পরে তুমি আমাকে তুলছো, না আমি তোমার কাছে যাচ্ছি?"

শৈবাল হেসে উঠলো, "এত আর্লি তো কোনোদিন এটা ঠিক করা হয় না। পাঁচটায় টেলিফোনে সেটা ঠিক হয়। ভুলে গেলে নাকি?"

"সরি।" সুপর্ণার খুশির স্বর ভেসে এলো, "ভুলেই যাচ্ছি। কাজকর্ম ছাই কিছুই ভালো লাগছে না। রাখছি।"

লাইন কেটে গেল। শৈবাল রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। মাথা নেড়ে হাসলো। রিন্‌টিটার সত্যি মাথায় ছিট আছে। কখন রাগছে, কখন হাসছে, কোনো কিছুর ঠিক নেই। ওর টেবিলে এক গুচ্ছ কাগজ। প্রত্যেকটাতেই লাল রঙের আর্জেন্ট ছাপ মারা। সবগুলোই এখুনি দেখতে হবে, এবং যথারীতি ব্যবস্থা করতে হবে। ও আগে একটা সিগারেট ধরালো। আর সেই ফাঁকেই মনে পড়লো,

তখন পর্যন্ত ও অরিন্দমকে চোখে দেখেনি। অতএব কৃষ্ণাকে দেখার প্রশ্নই আসে না। তথাপি শৈবাল যে ওদের একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তার মেকি মূল্যবোধের সম্পর্কে ও সচেতন। কিন্তু নিজেকে যতোটা চিনতে শিখেছে, সেই নিরিখে, সন্দেহ নেই, অরিন্দমের মতো উদ্দাম ও বেপরোয়া ও কোনো কালেই হতে পারবে না। একটা কথা ভাবতেও লজ্জা করছে। তবু নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারছে না, কৃষ্ণা মেয়েটিকে ওর কেমন করুণ আর অসহায় মনে হচ্ছে।

বিকেল পাঁচটার আগেই বাইরে টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুপুরে আধঘণ্টা বিশ্রাম ছাড়া, শৈবাল টেবিল থেকে মুখ তুলতে পারেনি। অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। এখনো ওর কাজ সারতে বেশ বাকি। রিসিভার তুলতেই, ভেসে এলো, "রিন্‌টি।"

"...হুঁ। তোমার কাজ শেষ?"

সুপর্ণার একটু উচ্ছ্বাস ভরা ব্যস্ত স্বর ভেসে এলো, "কাজের আবার কোনোদিন শেষ আছে নাকি? অরিন্দম ধরেছে, তুমি আমি ছুজনেই আজ ওদের—মানে কৃষ্ণা অফিসের বাইরে এক জায়গায় অপেক্ষা করছে—আমরা চারজনে কোথাও বেরিয়ে পড়বো। প্লিজ, কাজের দোহাই দিও না। তুমি চলে এসো আমার অফিসের সামনে।"

"কিন্তু রিন্‌টি, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।" শৈবাল অস্বস্তিতে হাসলো, "সত্যি কাজের দোহাই দিতেই হচ্ছে। ভাবছিলুম, তুমি টেলিফোন করলে, তোমাকে আমার অফিসে আসতে বলবো। সাড়ে ছটার পরে বেরোবো।"

সুপর্ণার স্বরে আবদার ও জেদ একসঙ্গে ভেসে এলো, "না, প্লিজ, তুমি আর কাজ করবে না। আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তুমি আমি একটু আড্ডা দিতে পারি নে? তুমি গাড়িটা নিয়ে চলে এসো। আমরা এখুনি ডায়মণ্ডহারবারের দিকে চলে যাবো। এখন বেরোলে

রাত্রি দশটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবো। তুমি বললেই, আমি বাড়িতে টেলিফোন করবো।"

"রিন্টি, প্রোগ্রামটা আগামীকালের জন্য তুলে রাখলে হয় না?" শৈবালের স্বরে অস্বস্তি ও অসহায়তা। "আজ এখুনি আমার বেরোনো সম্ভব নয়!"

সুপর্ণার ঝাঁজ মেশানো দৃঢ় স্বর ভেসে এলো, "না, আজকের প্রোগ্রাম আগামীকালের জন্য তুলে রাখা যাবে না। সব সময় তোমারই একমাত্র কাজ থাকবে, তোমার কথাই রাখতে হবে, তা হয় না। আমি অরিন্দমকে বলেছিলুম, তুমি নিশ্চয় গাড়ি নিয়ে আসতে পারবে। তা আজ পারছো না, আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়েই যাচ্ছি।"

"তার মানে, আমাকে তোমাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছো।" শৈবালের মুখে বিমর্ষতার ছায়া। হাসি ও স্বরে বিষণ্ণতা।

সুপর্ণার ভেসে আসা স্বরে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না, "আমরা তোমাকে বঞ্চিত করছিনে। তুমিই আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছো না। কাজ একলা তুমিই কর, আর কেউ করে না। কিন্তু মনে রেখো, কাজ ছাড়াও জীবন আছে। বন্ধুদের কাছে আমার মর্যাদার কোনো মূল্যই তুমি দিতে চাও না। যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি যখন আসতে পারছো না, আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়েই বেরিয়ে পড়ছি।"

"প্লিজ রিন্টি, একটু বিবেচনা…"

সুপর্ণার ঝাঁজালো স্বর শৈবালের রিসিভারে ঝাঁপিয়ে পড়লো, বিবেচনার কিছু নেই। ইট ইজ ডিসিশন। আমার থেকে কাজটাই তোমার কাছে চিরদিন বড় হয়ে থাকবে, তা মেনে নিতে পারি নে, মনে রেখো তুমি বন্ধুদের কাছে আমাকে অপমান করলে। ছাড়ছি।"

মুহূর্তেই টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুপর্ণার স্বর শেষদিকে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। শৈবাল তবুও নিরুপায়।

ও রিসিভারটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলো। সুপর্ণার কান্নারুদ্ধ স্বর ওর কানে ভাসছে। কিন্তু সুপর্ণার ক্রুদ্ধ কঠিন কথাগুলোও ও ভুলতে পারছে না। ও-বেলার কথার সঙ্গে এ-বেলার সহসা ডায়মণ্ডহারবার যাবার সিদ্ধান্তকে মেলানো কঠিন। এ-বেলা, সুপর্ণার কথা শুনে মনে হয়েছিল, অরিন্দম আর কৃষ্ণার ব্যাপারে ও অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। বিশেষ করে কৃষ্ণার সম্পর্কে ওর ধারণা যে মোটেই ভালো নয়, তা বোঝা গিয়েছিল। অরিন্দমের অকপট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও। বাবার অফিসের পুরনো বয়স্ক কেয়ারটেকারের কাছে নিজের অসম্মানটা ও ভুলতে পারেনি। শৈবালের অন্তত সেইরকম ধারণা হয়েছিল। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, এমন কী ঘটে গেল, বন্ধুপ্রীতিতে হঠাৎ সকলে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল? খুবই অসঙ্গত আর যুক্তিহীন লাগছে। সুপর্ণার কাছ থেকে এমন অসঙ্গত ব্যবহার ও প্রস্তাব, প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষ ওর এমন আকস্মিক রাগ জেদ অত্যন্ত বিস্ময়কর। কেবল কি বিস্ময়কর!

শৈবাল একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চাপলো। টেবিলে হাত বাড়িয়ে, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাথা নাড়লো। ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি। মনে মনে বললো, "রিন্টি, তোমার চেয়ে কাজকে বড় করে দেখিনি। কাজ তার সমূহ দাবী মিটিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ওটার সঙ্গে জীবনযাত্রার একদিকে যোগাযোগ। আমি যদি সাহিত্যিক শিল্পী হতুম, তা হলে কাজের বিষয়টা হয়তো আলাদা করে ভাবতে হতো। তবুও স্বীকার করতে হবে, এখানে আমার সত্তা ও বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে পারি নে। কিন্তু তুমি তো সমূহ দাবী মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবার নও। তুমি আমার অফিসের টেবিলের কাজ নও। তুমি তার চেয়ে অনেক বড়। তোমার দাবী যেমন কাজের মতো নয়, তেমনি আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক,

পরস্পরের তথাকথিত নরনারীর দাবীও অধিক। অন্তত আমি মনে করি। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসায় এমন কোনো শর্ত থাকা উচিত নয়, যা জীবনের নিয়ন্ত্রণকে ভেঙেচুরে ফেলবে। চাকুরে শৈবালের মুখে কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাতে পারে। আর যাই হোক, তোমার কাছে আমার স্বার্থপরতার কিছু নেই। চার বছরে যদি আজ তোমার সে-কথা মনে হয়, তা হলে আমি নাচার। এবং উচ্ছ্বাসের বসে কোনো রকমের অসঙ্গতিকেই আমি মেনে নিতে পারি নে···

লাল অক্ষরে 'আর্জেণ্ট' লেখা সমস্ত ফাইলগুলো সামনে টেনে নিল। কিন্তু কেমন একটা অচেনা কষ্ট কোথায় বিঁধে আছে। ও ফাইল খুললো। ইণ্টারকম টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে নিল তৎক্ষণাৎ, 'ইয়েস ?···না না। আমি তো জানি, সবগুলোই খুব জরুরি।····না, তাও করবো না। আগামীকালের জন্য কিছুই ফেলে রাখবো না। আমি আজই সবগুলো মিটিয়ে ফেলবো।····আজ্ঞে না। মিস্ চৌধুরিকে আমার দরকার নেই। ওঁকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেই টাইপ করে নেবো। 'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার···নো মেনসন প্লিজ।'

ডিরেকটর-কাম-জি, এম-এর ফোন। ভদ্রলোক জেনে নিলেন, শৈবাল জরুরি কাজগুলোকে কতোটা গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেই চাইছিলেন, কাজগুলো আজ সব শেষ না করে, আগামীকাল করলেও হবে। শৈবাল সেরকমই ভেবে রেখেছিল। আরো টানা দেড় ঘণ্টা কাজ করে, বেশ কিছুটা এগিয়ে রাখবে। তারপরে সুপর্ণা এলেই উঠে পড়বে। আপাতত আর তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ঘটনার মোড় ঘুরে গিয়েছে অন্য দিকে। অতএব, সুপর্ণাহীন সন্ধ্যা কাজে ডুবে থাকাই ভালো।

পরের দিন লাঞ্চ আওয়ারের পর, শৈবালের খেয়াল হলো, সুপর্ণা টেলিফোন করেনি। গতকালের জরুরি কাজগুলো এইমাত্র সাঙ্গ

হল। শৈবাল স্বস্তি বোধ করছে। কেবল স্বস্তি নয়। আরও অধিক কিছু। সুপর্ণাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কাছে পাবার ব্যাকুলতা অনুভব করছে। অন্তত টেলিফোনে গলার স্বরটা এখন শুনতে পেলে ভালো লাগতো। আর আজ ও এখুনি, এই মুহূর্তেই অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সুপর্ণার সাধ মিটিয়ে, ওর বন্ধুদের নিয়ে যে-দিকে খুশি বেড়াতে চলে যেতে পারে। একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব মেটানোর স্বস্তি ও আনন্দ যে কতোখানি, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

শৈবাল বাইরের টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ডায়াল করতে গিয়ে, থমকে গেল। সুপর্ণার গতকালের ক্রুদ্ধ ক্ষুণ্ণ জেদের কথাগুলো বড় জোর কানের মধ্যে বেজে উঠলো। ও হয়তো এখনো রেগে আছে। শৈবাল আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ওর মুখে ফুটে উঠলো কোমল হাসি। সুপর্ণা নিজেই বিকালে হয়তো টেলিফোন করবে। কতোক্ষণ আর মাথা গরম করে থাকবে।

শৈবাল ইন্টারকম্ টেলিফোনের রিসিভার তুলে, দুটো নম্বর ডায়াল করলো। ওপার থেকে জবাব এলো, 'অফিসারস ক্যান্টিন।"

"আমি দত্ত বলছি মিঃ গুপ্ত।" শৈবালের স্বরে আলস্যের সুর, "আজ আপনার লাঞ্চের মেনু কী ?"

মিঃ গুপ্ত অফিসারস ক্যান্টিনের ম্যানেজার। তাঁর গলার স্বর শৈবালের চেনা। কিন্তু মিঃ গুপ্তের স্বরে রাজ্যের বিস্ময়, "আপনি খোঁজ করছেন লাঞ্চের মেনু ? আপনি তো স্যার কোনোদিন আমার এখানে লাঞ্চ করেন না ?"

"কোনোদিন না করলে কি একদিনও করতে নেই ?" শৈবাল হাসলো।

মিঃ গুপ্তর বিনীত ব্যগ্র স্বর শোনা গেল, "কেন নেই। নিশ্চয় করতে আছে। মেনুর মধ্যে ফ্রায়েড রাইস্, মুগের ডাল, ইলিশ মাছ, বিন্‌সের তরকারি আছে। তাছাড়া আছে ভেটকি আর ম্যাকরেলের

ফ্রাই, চিকেন স্টু। তাছাড়া যদি আরো কিছু করে দিতে বলেন…"

"আমার এত সব দরকার নেই।" শৈবাল মিঃ গুপ্তকে আশ্বস্ত করলো, আপনার ওখানে চিকেন স্যাণ্ডউইচ মিলবে না ?"

মিঃ গুপ্তের তৎক্ষণাৎ জবাব, "কেন মিলবে না স্যার ? ইলিশ মাছ ভাজা খাবেন ? খুব ভালো—মানে, বাংলাদেশের ইলিশ আছে। আমি নিশ্চয় আপনাকে খুশি করতে পারবো।"

"আমি মিনিট পনের-কুড়ি বাদে যাচ্ছি।" শৈবাল রিসিভার নামিয়ে রাখলো। ওর মুখে হাসি ফুটলো। মিঃ গুপ্ত বোধহয় ধরেই নিয়েছেন, ও ডিরেক্টরের হয়ে অফিসারস ক্যান্টিনের খাবার এবং ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণে যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে এরকম ভাবাটা কিছু অন্যায় নয়। কারণ, এমনটা ঘটতেই পারে। ও বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলো।

বেয়ারা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। শৈবাল মুখ না তুলেই বললো, "মিস চৌধুরীকে একবার ডেকে দাও।"

"আজ্ঞে !" বেয়ারা চলে গেল।

শৈবাল দ্রুত হাতে ফাইলগুলো সাজিয়ে ফেললো। গতকাল ও প্রায় রাত্রি ন'টা অবধি কাজ করেছে। সমস্ত টাইপ করা কাগজগুলো আলাদা করে রাখা ছিল। মিস চৌধুরী এলো। অনধিক তিরিশ বছর বয়স। অনতিদীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী এবং সে যতটা ভালো, তার চেয়েও সযত্নে নিজেকে সাজাতে জানে। ওর নাম পাপিয়া। এক মুখ হাসি নিয়ে ঢুকলো, "গুড আফটারনুন মিঃ ডাট্। শুনলুম, গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন ?"

"গুড আফটারনুন ! অনেক রাত নয়, ন'টা পর্যন্ত।" শৈবাল ফাইলগুলো আর টাইপ করা কাগজগুলো এগিয়ে দিল, "আমি কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছি। আপনি আজ আর আগামীকাল বিফোর লাঞ্চ, আমার সাজিয়ে রাখা কাগজগুলো পর পর শেষ করে দেবেন।

খুব জরুরী কাজ। যদি অসুবিধে বোঝেন, আমাকেও বলতে পারেন। অবিশ্যি আমার আবার রুটিনমাফিক কাজগুলো রয়েছে।

মিস চৌধুরী আগে টাইপ করা শিটগুলো হাতে তুলে নিল, "আপনার টাইপ খুব সুন্দর। আমি সব ঠিক করে ফেলবো। আপনি ভাববেন না। বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফাইলগুলো নিয়ে যাবে।"

"থ্যাংক্যু মিস চৌধুরি।" শৈবাল হাসলো।

মিস চৌধুরি তার কাজলমাখা চোখে হাসির ঝিলিক হানলো, "নো মেনশন মিঃ ডাট।"

মিস চৌধুরী বেরিয়ে গেল। শৈবাল ওপর ঘর থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনে যাবার আগে, দু'একজনের ঘরে ঢুঁ মারলো। ক্যান্টিনে গেল। দুটো ইলিশমাছ ভাজা খাবার পরে, এক কাপ কালো-কফি ছাড়া আর কিছুই খাওয়া সম্ভব হল না। ঘরে ফিরে যথারীতি কাজে বসলো। জি এম-এর ঘর থেকে ডাক এলো বিকেল চারটেয়। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলো। বাইরের টেলিফোন দু'বার বেজে উঠলো। দু'বারই আশাহত হল। কাজের লোক, কাজের কথা। সুপর্ণার স্বর শোনা গেল না। সুপর্ণা সাধারণত পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে। খুব প্রয়োজন হলে, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তার মধ্যে টেলিফোন না এলে, শৈবালই করবে। কিন্তু তা আর করতে হল না। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগেই সুপর্ণার টেলিফোন এলো। তবে ওর সেই স্বাভাবিক আর চেনা স্বরের কথা শোনা গেল না, "রিন্টি!" পরিবর্তে শোনা গেল, "তোমার কাজে ব্যাঘাত করবো না ভেবেছিলুম। তবু করতে হল। কারণ, গতকাল আমরা কী রকম ডায়মণ্ডহারবার বেড়িয়ে এলুম, তোমার নিশ্চয় জানবার কৌতুহল হচ্ছে?"

"নিশ্চয়ই হচ্ছে।" শৈবালের স্বরে অকৃত্রিম উৎসাহ, "অবিশ্যি বলবো না, আমি বঞ্চিত হয়েছি। কারণ তুমি বলবে, আমি তোমাদের ত্যাগ করেছি ...

সুপর্ণার স্বরে গতকালের উগ্র ঝাঁজ না থাকলেও, উত্তাপ মন্দ নেই। "হ্যাঁ, ত্যাগ করেছো। আর করেই ভালো করেছো। তুমি এলে, ব্যাপারটা তোমার মোটেই ভালো লাগতো না। কৃষ্ণার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। অরিন্দমের পকেটে টাকা কম ছিল। আমার কাছেও যা ছিল, তা সামান্যই। অরিন্দম শেষ পর্যন্ত অফিসে একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষে হয়নি ডায়মণ্ড-হারবার থেকে আমরা যখন এসেছি, তখন ট্যাক্সির পুরো ভাড়ার টাকা আমাদের ছিল না। যাই হোক, কী ভাবে সে-সব মিটেছে, তোমাকে বলে লাভ নেই। শুধু জেনে রেখো, তবু আমরা দারুণ এনজয় করেছি।"

"রিন্‌টি, টাকার ব্যাপারটা তুমি আমাকে···"

শৈবালের কথা থামিয়ে মাঝখানেই সুপর্ণার স্বর ঝঙ্কৃত হল, "হ্যাঁ, উচিত ছিল। আমি বোকামি করেছি। তোমার কাজ থাকলেও টাকাটা নিতে পারতুম। যাই হোক, আজ এখন তোমার বেয়ারাকে দিয়ে শ'দুয়েক টাকা পাঠাতে পারবে? হেঁটে এলে দশ মিনিট লাগবে।"

"তা পাঠাচ্ছি।" শৈবালের মুখে বিমর্ষতা ও বিস্ময়ের ছায়া পড়লো, "তুমি আজ আমার এখানে আসছো না?"

সুপর্ণার শুষ্ক স্বর ভেসে এলো, "না। আজ আমরা এক জায়গায় একটু আড্ডা দেবো। অরিন্দম আর কৃষ্ণা অফিসের নিচে অপেক্ষা করছে। আমি কি তোমার বেয়ারার অপেক্ষা করবো?"

"নিশ্চয়ই করবে।" শৈবালের মুখে আহত অভিব্যক্তি, "কিন্তু বেয়ারা যাবার দরকার কী? আমি তো আজ ফ্রি। আমি নিজেই পারি। তোমাদের সঙ্গে···"

সুপর্ণার দৃঢ় কিন্তু নিরাসক্ত স্বর ভেসে এলো, "না, আমাদের সঙ্গে তোমাকে আসতে হবে না। অবিশ্যি টাকাটা চাইতে আমার

খুব সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু মাসের শেষ। আমার আর অরিন্দম, দুজনের অবস্থাই কাহিল।”

“সেজন্য ভেবো না।” শৈবাল ওর স্বরকে তরল ও স্বাভাবিক রাখলো। কিন্তু ওর বিমর্ষ মুখে গাঢ় বেদনার ছায়া, “বেয়ারা দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছোবে।”

ওপার থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে, সুপর্ণার স্বর শোনা গেল “রাখছি।”

টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শৈবাল এক মুহূর্ত দেরি না করে, ড্রয়ার টেনে, ওর পার্সটা বের করলে। দুটো এক শো টাকার নোট তুলে নিল। পার্স ড্রয়ারে রেখে, একটি খাম বের করলো। নোট দুটো খামের মধ্যে পুরে, উঠে দাঁড়ালো। কোণে একটি কাঠের পার্টিশন সরিয়ে ভেতর থেকে বের করলো গঁদের শিশি। খামের মুখ বন্ধ করার আগে এক সেকেণ্ড ভাবলো। না, নোট দুটো পাঠানো ছাড়া, আর কিছুই পাঠাবার নেই। ও খামের মুখে দ্রুত গঁদ লেপে, মুখ বন্ধ করলো। কাঠের পার্টিশন টেনে বন্ধ করে ফিরে এলো টেবিলে। চেয়ারে বসে নিচে হাত দিয়ে বোতাম টিপলো। তারপর খামের ওপর লিখলো “মিস সুপর্ণা গুহ।”

বেয়ারা দরজা ঠেলে ঢুকলো। শৈবাল খামটা বেয়ারার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, “এটা মিস গুহকে তাঁর অফিসে এখুনি পৌঁছে দিয়ে এসো। তিনি যদি কিছু বলেন, আমাকে জানিয়ে যেও।”

“আজ্ঞে।” বেয়ারা খামটি নিয়ে দ্রুত দরজার বাইরে চলে গেল।

শৈবালের মনে হল, ওর ভেতরে কোনো একটা গানের সুর বাজছে। কোন্ গান, কী সুর, ওর জানা নেই। কিন্তু ওর ঠোঁটে করুণ হাসি ফুটলো। গতকাল খুবই অপমানিত বোধ করেছে। সে জন্য শৈবালকেই মনে মনে দায়ী করেছে। অথচ শৈবাল সত্যি নিরুপায় ছিল। এখনও সুপর্ণা ভীষণ রেগে আছে। যখন ওর রাগ

থাকবে না, মন শান্ত হবে, তখন লজ্জায় দুঃখে হয় তো এই শৈবালেরই বুকে…

নিজেকে এই সান্ত্বনাটা দিতে গিয়ে থমকে গেল, বুকে একটা তীক্ষ্ণ কষ্ট ওর ভেতরের অচেনা সুরের "অন্তু"-এর উচ্চ রাগে বেজে উঠলো। ও উঠে দাঁড়ালো। কেন দাঁড়ালো, নিজেই জানে না। এখন ওর বাইরে যাবার দরকার নেই। এ সময়ে বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। শৈবাল টেলিফোনটার দিকে তাকলো। ধীরে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুললো, 'ইয়েস ?'

"তাড়ু বলছিস ?"

গলার স্বর শুনেই শৈবাল মায়ের গলা চিনতে পারলো। ওর ডাক নাম তাড়ু। অবাকও হল, "হ্যাঁ। কী ব্যাপার মা ?"

"না ব্যাপার তেমন কিছু নয়।" মায়ের ক্লান্ত স্বর ভেসে এলো, "তোর কি আজ কোনো পার্টি বা নেমন্তন্ন আছে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে ?"

শৈবালের মুখে ভ্রূকুটি, বিস্মিত জিজ্ঞাসা, "না, কোনো পার্টি নেমন্তন্ন কিছুই নেই। কেন বলো তো ?"

"তাহলে," মায়ের ক্লান্ত শ্বাসে ধরা স্বরে কেমন একটা সংকোচের সুর, "বলছিলুম কি, তোর বাবা তো সেই তিন দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে চলে গেছেন। বীরু আর মীনাকে (শৈবালের দাদা আর বৌদি) আমার ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। তুই কি তাড়ু আজ বাড়ি চলে আসবি ?"

মায়ের স্বরে সংকোচ আর দ্বিধা শুনে, শৈবালের বুকে ভিন্নতর কষ্ট টনটনিয়ে উঠলো। আর মনে হলো, এ যেন একটা দৈব ঘটনার মতো। এ মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে এই ডাক। মা তো কোনো দিনই এমন ভাবে এ সময়ে ডাকেন না। ও দ্রুত স্বরে বললো, "আমি এখুনি যাচ্ছি মা। আমার আজ তেমন কাজও নেই।"

"রাগ করিস নে যেন তাতু।" মায়ের শ্বাস টানা ক্লান্ত স্বরে সেই সংকোচ।

শৈবাল হাসলো, "ওরকম করে বললে রাগ করবো।"

মা ওপার থেকে লাইন কেটে দিলেন। শৈবাল দ্রুত ড্রয়ার খুলে পার্স, গাড়ি ও অন্যান্য চাবির গোছা, এবং আরো টুকটাক কিছু জিনিস ট্রাউজারের পকেটে ঢোকালো। বাঁ হাতের কবজি উল্টে ঘড়ি দেখলো। ইণ্টারকমের রিসিভারটা তুলে দুটো নাম্বার ডায়াল করলো, "সিনহা, আমি বাড়ি যাচ্ছি। মনে হয়, জি, এম, আজ আর আমাকে ডাকবেন না। তবু কোনো কারণে খোঁজ করলে, তুমি বলে দিও, আমি বাড়িতেই থাকবো।"

"আচ্ছা স্যার।" জবাব ভেসে এলো।

শৈবাল রিসিভার নামিয়ে ঘর থেকে বেরোলো। করিডর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল লিফ্‌টের দিকে। লিফ্‌ট ওপরে উঠছে। লিফ্‌ট এসে দাঁড়ালো। দরজা খুলতেই ওর বেয়ারা বেরিয়ে এলো, "আজ্ঞে, উনি আমার জন্যই অফিসের নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু বলেননি।"

"কে?" লিফটের ভেতর পা দিতে দিতে, শৈবাল ভ্রুকুটি জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো। এবং পরমুহূর্ত্তেই মাথা ঝাঁকালো, "ও! আচ্ছা, ঠিক আছে।"

লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এটাই টপ ফ্লোর। লিফট নিচে নামতে লাগলো।

॥ অন্ত ॥

শৈবাল তিন দিন ধরে অফিসের নানা কাজের মধ্যেও, যতো বার বাইরের টেলিফোন বেজে উঠেছে, একটি স্বর শোনার ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়েই রিসিভার তুলেছে। প্রত্যেকবারই আশাহত হয়েছে। অথচ

ও একটি বিষয় বিশেষভাবে অনুভব করছে। সুপর্ণা ওর জীবনের যেখানে অবস্থান করছে, সেই অবস্থানগত দিক থেকে, ওর হৃদিনের ক্রোধ ক্ষোভ জেদ এবং প্রত্যাখান, শৈবালকে একটা জায়গায় স্তব্ধ করে রেখেছে। করে রেখেছে আড়ষ্ট, নিশ্চল অনড়। ও কিছুতেই সুপর্ণাকে টেলিফোন করতে পারছে না। এর মধ্যে ওর কোনো জয়ের অনুভূতি নেই। সংযম আর একান্ত অধিকারবোধের সংশয় ওর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মনে একটা প্রশ্নও জেগেছে। এ-বাধার সঙ্গে প্রেমের কোনো অন্তরায় কি ঘটেছে? জবাব মেলেনি।

সাত দিন পরে, টেলিফোনে একটি মেয়ের গলার স্বর শৈবালকে অবাক করলো। গলার স্বরে লজ্জা সংকোচ ও জড়তা, "আমি কি মিঃ শৈবাল দত্তর সঙ্গে কথা বলছি?"

"বলছেন।" শৈবাল জিজ্ঞাসু স্বরে জবাব দিল।

টেলিফোনের ওপর থেকে মেয়েটির স্বরে একটা করুণ সুর যেন বাজছে, "আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে সুপর্ণার কাছে বোধ হয় আমার নাম শুনবেন। আমার নাম কৃষ্ণা মজুমদার।"

"মানে সুপর্ণার বন্ধু অরিন্দমের···?" শৈবাল কথাটা শেষ করলো না।

কৃষ্ণার গলার স্বর ক্ষীণ শোনালো, "হ্যাঁ, সপ্তাহখানেক আগেও তাই জানতুম, আমি অরিন্দমের কৃষ্ণা। কিন্তু গত ছ'দিন আমি ওর কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে। সুপর্ণাকেও পাচ্ছিনে। ভাবলুম আপনি হয়তো মানে, সুপর্ণার কাছ থেকেহয়তো আপনি কিছু শুনেছেন। আপনার কাছে কোনো খোঁজ পাবো।"

"না, মিস মজুমদার, সুপর্ণার কাছ থেকে অরিন্দমের কোনো সংবাদ আমি পাইনি।" শৈবালের স্বর অমায়িক কিন্তু গম্ভীর। সুপর্ণার সঙ্গে ওর গত সাত দিনের ওপর সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা বললো না।

কৃষ্ণার ক্ষীণ করুণ স্বর ভেসে এলো। "আমি এমন একটা অবস্থায় আছি, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। বুঝতে পারছিনে, অরিন্দম আমাকে চিট করছে কিনা কিংবা···"

"শুনুন মিস মজুমদার, এসব কথা শোনার সময় বা মন কোনোটাই আমার নেই।" ভাষার সঙ্গে শৈবালের স্বরের কাঠিন্যের কোনো সঙ্গতি ছিল না। গম্ভীর আর শান্ত ওর স্বর, "আমি আপনাকে বা অরিন্দমকে চিনিনে। কোনো দিন দেখি নি। এ অবস্থায় আপনি আপনাদের কোনো কথা আমাকে বললেও, কিছু করার নেই।"

কৃষ্ণার স্বর শুনে বোঝা গেল খুবই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বোধহয় শৈবালের জবাবটাও ওর কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে, "মাফ করবেন শৈবালবাবু। একটাই অনুরোধ, সুপর্ণাকে আপনি বলবেন, ও যেন আমার সঙ্গে একটু দেখা করে।"

"সুপর্ণার সঙ্গে দেখা হলে বলবো।" শৈবাল রিসিভার নামিয়ে দিল।

শৈবালের মুখ ঈষৎ কঠিন দেখালো। কয়েক মুহূর্ত ও সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইলো। তারপরে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। জি, এম ইতিমধ্যেই জেনেছেন, ওর মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কও তেমন একটা নিবিড় কিছু ছিল না। কিন্তু বাবার ব্যবহারে মা ক্রমেই ভেঙে পড়ছেন। শৈবাল বাবাকে দোষ দিতে পারে না। ভদ্রলোক তাঁর জীবনে যতোটা করার করেছেন। এখন এই ষাটোর্দ্ধে জীবনটাকে নানাভাবে উপভোগ করে নিচ্ছেন। যেটা খারাপ লাগে, সেটা হল ভদ্রলোকের আদর্শবাদের কথা। ওটা ওঁদের স্বভাবের আর রক্তের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছে। এ সময়ে অসুস্থ মা বড় অসহায়। শৈবাল মাকে সান্নিধ্য দিতে গিয়ে মায়ের কাছে জীবনের নানা কথা শুনে, কথা বলে অনেক অজানাকে যেন জানতে পারছে। সব থেকে অবাক

লাগে, বাবার প্রতি মায়ের কোনো অভিযোগ নেই। সেটা যে সেকেলের অন্ধ স্বামীভক্তি বা ভালবাসাজনিত তা নয়। মা তাঁর নিজেকে দিয়ে, বাবাকে বুঝেছেন। সেই কারণেই বাবার প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ নেই।

সুপর্ণার সঙ্গে দেখা নেই। কিন্তু মায়ের সঙ্গে অবকাশের সময়-গুলো ওর জীবনে নিয়ে এলো নতুন একটা দিগন্ত। যে দিগন্তে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা যায়। কিছুটা চেনা যায়।

শৈবাল কি তবু একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল? থাকতে পারেনি। দশম দিনের অসাক্ষাতের পর, ও সুপর্ণার অফিসে টেলিফোন করেছিল। ওরই এক মেয়ে সহকর্মীর জবাব, সুপর্ণা গত সাতদিন অফিসে আসছে না। ও ছুটি নিয়েছে। শৈবাল উদ্বেগ চাপতে পারেনি। সুপর্ণার বাড়িতে টেলিফোন করেছিল। ওর মা অবাক হয়ে বলেছেন, "ও তো কোন বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছে। তুমি জানো না?"

শৈবাল মাথা নেড়েছে, "না, জানি নে।"

"তুমি আমাদের বাড়িতেও তো অনেক দিন আসো নি। এসো না।" সুপর্ণার মায়ের স্বরে আন্তরিক আহ্বান ছিল।

শৈবাল জানিয়েছে, "মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ভালো হলেই যাবো।"

শৈবাল যেন নতুন করে ওর অবস্থানটা চিনতে পারছিল।

প্রায় চার সপ্তাহ পরে একদিন সুপর্ণা এলো শৈবালের অফিসে। আগে কোনো টেলিফোন করেনি। তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি ওর চেহারায়, বা বেশেবাসে। কেবল পরিবর্তন কথায় ও ব্যবহারে। সেই ক্রোধ নেই। এলো এক ঝলক আলোর মতো হাসি নিয়ে। "কী কর্মবীর মহাশয়, তোমার খবর কী?

"কর্মবীর নয়, যন্ত্র বল।" শৈবাল ওর হাতের কলমটা টেবিলে ফেলে হাসলো, "খবর নয়। তোমার কী খবর?"

সুপর্ণা শৈবালের চোখের দিকে তাকালো, "ভালো নয়।"

"কেন?"

"আমাকে না দেখে, তুমি হয় তো ভালো ছিলে। আমি ছিলুম না।" সুপর্ণার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো, মনটাও ভালো ছিল না। তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।"

শৈবালের অকপট হাসিতে একটা স্নিগ্ধতার কিরণ, "ওসব ভুলে যাও। ওরকম হয়েই থাকে। জীবনটা একই ছন্দে সব সময়ে চলবে বা একই স্রোতে এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। ওটাকে অনিবার্য বলে ধরে নিলে, অকারণ ভুগতে হয়।"

"হঠাৎ এই দার্শনিকতা?" সুপর্ণার দীর্ঘায়ত চোখে সংশয়। ও তাকালো ঘাড় বাঁকিয়ে।

শৈবাল হেসে ঘাড় ঝাঁকালো। "দার্শনিকতা বিষয়টা তো খারাপ নয়। ওটা জীবনবোধ থেকেই আসে।

"রাখো তোমার এত বড় কথা।" সুপর্ণার রাঙানো পুষ্ট ঠোঁট ফুলে উঠলো। গলার স্বরে প্রেমোচ্ছল আমোদের সুর, "অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেরোইনি। আজ বেরোবো।"

সেটাই তো ছিল প্রায় প্রাত্যহিক একটা নিয়মের মতো। শৈবাল বাঁ হাতের কবজির ঘড়ি দেখলো। উঠে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ, "চলো তাহলে বেরোই।"

শৈবাল এক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। সুপর্ণাকে নিয়ে লিফটে নেমে অফিসের বাইরে এলো। গাড়িটা পার্ক করা ছিল যথাস্থানে। চাবি বের করে গাড়ির দরজা খুলে আগে নিজে ঢুকে বসলো চালকের আসনে। দরজা খুলে দিল সুপর্ণাকে। সুপর্ণা উঠে বসলো। শৈবাল গাড়ি স্টার্ট করলো।

"কথা বলছো না কেন বলো তো?" সুপর্ণার স্বরে অস্বস্তি ও সংশয়।

শৈবাল হাসলো, "আমি তো শুনবো বলে কান পেতে আছি।"

"আমার আবার কি কথা থাকবে ?" সুপর্ণা শৈবালের কাছ ঘেঁষে বসলো, "যা বলবার তা তো বলেছি। কিন্তু তুমি তো আমাকে একবারও রিন্‌টি বলে ডাকোনি। আর এদিকে কোথায় যাচ্ছো ?"

শৈবাল হাসলো, "তোমাকে পৌঁছে দিতে।"

"আমাকে কোথায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছো তুমি ?" সুপর্ণার স্বরে বিস্ময় ও উত্তেজনা, "উত্তর কলকাতায় কোথায় পৌঁছাবে তুমি আমাকে ? আমাদের বাড়ি তো ওদিকে না ?"

শৈবালের হাসিতে কোনো পরিবর্তন নেই, "আজ আমি তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে চাই, যেখানে তোমাকে পৌঁছনো উচিত বলে আমি মনে করি।"

"শৈবাল !" সুপর্ণা প্রায় চিৎকার করে উঠলো, "তোমার এমন কোনো অধিকার নেই যে তোমার ইচ্ছে মতো জায়গায় আমাকে পৌঁছে দেবে। আমি···আমি···অনেকদিন পরে তোমার কাছে এসেছি। তোমার সঙ্গে বেরোতে চেয়েছি।"

সুপর্ণার স্বর স্তব্ধ হয়ে এলো। গাড়ি দাঁড়ালো। উত্তর কলকাতার সেকালের এক অভিজাত পাড়া। সামনেই বিশাল অট্টালিকাটা অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটায় তেমন ভিড় নেই। আলো কম। শৈবাল গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। অন্য পাশে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো, "অরিন্দমদের বাড়ির এ-ঠিকানাটা একদিন তুমিই বলেছিলে। এসো সুপর্ণা, নেমে এসো।"

সুপর্ণা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গাড়ির মধ্যে বসে রইলো। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না। শৈবালের স্বরে এমন কিছু ছিল, ওকে কাঁধের ব্যাগটা ধরে নেমে আসতে হল। শৈবাল দরজাটা লক করে, চেপে দিল, "এটা দার্শনিকতা কিনা, সে বিচার তোমার। তোমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যেতে আমার কোথায় কতোখানি বাজছে, সেটা ব্যাখ্যা করবো না। আমার ঝরনা অন্ধকারে বহে।

তোমার জীবনের পথ তোমারই মানসিকতার দ্বারা নির্ধারিত হবে। আমি এখান থেকে ফিরছি।

"তাড়ু।" সুপর্ণার রুদ্ধ স্খলিত স্বরের ডাক শোনা গেল।

শৈবাল গাড়িতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে, ইঞ্জিনে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো, "রিন্‌টি, ডেকো না। আমার জন্য তোমার জীবন থেমে থাকবে না। কিন্তু যা চার বছরেও অপূর্ণ ছিল, তার পূর্ণতা আশা করা অনুচিত। সাত দিনে প্রেম হয়। চার বছরের প্রাসাদ এক নিমেষেই ভেঙে যায়।"

শৈবাল গাড়ি চালালো। তবু একবার পেছন ফিরে তাকালো। প্রায় অন্ধকার প্রাচীন রাস্তার ধারে বিশাল ভূতুড়ে অট্টালিকাটার সামনে সুপর্ণাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। শৈবাল সামনে ফিরলো। ও গাড়ি চালাচ্ছে। ওর চোখ ঝাপসা হলে চলবে না।

—

বিমল কর

হেমলতাদি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। কয়েক জনকে। সাধারণ নিমন্ত্রণ। এ রকম উনি মাঝে-সাঝেই করে থাকেন। কখনো আমাদের, কখনো অন্যদের। আমরা যে যার মতন তাঁর ফুলকুঠিয়ার বাড়িতে গিয়ে জড় হয়েছিলাম। জায়গাটা নিরিবিলি, মাঠের পর মাঠ, এখানে ওখানে ঝোপ ঝাড়। দু পাঁচটা অর্জুন আর বটগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাঠের দিকে। নিরিবিলি এই জায়গায় বাংলো ছাঁদের এক বাড়ি খাড়া করেছিলেন সারখেলসাহেব। বাগান সাজিয়েছিলেন বাড়ির চারদিক ঘিরে। বাড়ি আর বাগান নিয়ে ওঁদের দিন কেটে যাচ্ছিল। ওঁদের মানে, সারখেলসাহের আর হেমলতাদির। বাড়িতে এই দুটি মানুষ ছাড়া ছিল কাজকর্মের লোক, মালী, আর বুড়ো ড্রাইভার মল্লিক। হেমলতাদিদের মেয়ে জামাই বিদেশে। কারডিফে। জামাই এনজিনিয়ার, মেয়ে ডাক্তার। শুনেছি বাচ্চা-কাচ্চাদের মনের গড়ন-পেটন নিয়ে তার ডাক্তারী। একটি ছেলে ছিল হেমলতাদিদের; সে আর নেই। বছর ছাব্বিশ বয়সে জিপ উলটে মারা গিয়েছে। আর্মিতে ছিল বেচারী। ছেলেকে হারাবার পর বছর খানেক থম্ মেরে ছিলেন সারখেলরা। শোক আঘাত সামলে আবার যখন পাঁচ জনের মধ্যে ভেসে উঠলেন তখন সারখেলসাহেবের চাকরি ফুরোতে আর দেরি ছিল না। ফুলকুঠিয়ার দিকে বরাবরই নজর ছিল ওঁর। জমি কিনে নিজের ছকে বাড়ি বানাতে বসলেন সারখেলসাহেব। চাকরিও ফুরোলো, বাড়িও শেষ হল।

আমরা জানি, হেমলতাদিরা এখন এতই নিঃসঙ্গ যে, আমাদের মতন চেনাশোনাদের মাঝে মাঝে বাড়িতে পাবার জন্যে ডেকে পাঠান।

নেমন্তন্ন উপলক্ষ মাত্র। তার মানে এই নয়, আগে আমাদের ডাক পড়ত না বরং আগে ডাকাডাকি বেশি ছিল। সে সময় আমরা অনেকেই কাছাকাছি থাকতাম, দু-চার মাইলের মধ্যে; কেউ কোলিয়ারিতে, কেউ কারখানায়। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব, হাসি-তামাশা তখন বেশিই হত। এখন আমরা ছিটকে-ছটকে রয়েছি। ফুলকুঠিয়া দূরই হয়। তবু ডাক পেলে না গিয়ে পারি না। ওঁদের জন্যে আমাদের মনে কেমন এক বেদনা রয়েছে।

নেমন্তন্নটা ছিল শনিবারে। সন্ধ্যেবেলায়। শনিবারটাই সকলের পছন্দ। আমরা ছ' সাত জন ছিলাম। রবিদা আর তার স্ত্রী মাধবীবউদি; শশধর বাগচি; বেণুপ্রসাদ বলে আমাদের এক বন্ধু; আর আদিত্য। আদিত্য সস্ত্রীক এসেছিল। তার স্ত্রীর নাম রোহিণী। রোহিণী নামটার চল ছিল না আমাদের মধ্যে। তার ডাকনাম ডালিমটাই সকলের মুখে মুখে ঘুরত।

রবিদা ছিল কারখানার লোক। লোহা কারখানার। থাকত মাইল সাতেক দূরে। বুকে একবার ছোটখাট ধাক্কা খাওয়ার পর সাবধান হয়ে গিয়েছিল; মাধবীবউদিকে বাদ দিয়ে কোনো সামাজিকতা সারতে যেত না। শশধর বাগচির ছিল এক ক্লে মাইনসের মালিকানা। ব্যবসায় ডুবে হাঁসফাস করত, লোকসানে লোকসানে তার মাথার চুল গিয়েছিল পেকে। সে থাকত শহরে, তার পৈতৃক বাড়িতে। বেণুপ্রসাদ পাটনার লোক, আসল নাম বেণীপ্রসাদ—তার আস্তানা ছিল টিয়াটুকরি কোলিয়ারিতে। কয়লার গুঁড়ো তার ফুসফুসকে কাহিল করে দিয়েছিল। ব্রংকাইটিসে ভুগত; হাঁপানিতে ধরেছিল তাকে। বলত, আই অ্যাম, ভেরি ম্যাচ অ্যাফ্রেড অফ মাই ব্ল্যাক চেস্ট। সেটা যে কী জিনিস আমরা বুঝতাম না।

আদিত্য সান্যাল ছিল তাদের আর জি (কেবলস্) কারখানার সিকিউরিটির মাথা। তাকে খানিক ছোটাছুটি করতে হত। কম্পানীর দুটো কারখানা দু জায়গায়। দু তরফেই দেখতে হত তাকে। তবে

বছরের মধ্যে ন' মাস অফিস ঘরে বসেই তার দিন কেটে যেত দেখেছি। কথাটা বললে আদিত্য চটে যেত। বলত, একবার চেয়ারে গিয়ে বসো না ; বুঝবে ঠেলা।

হেমলতাদির বাড়িতে আমাদের জমায়েত হতে হতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। মাসটা কার্তিকের শেষ, হালকা ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। সারখেলসাহেব তাস নিয়ে বসে পড়লেন। বেণুর সঙ্গে তাঁর জমে ভাল। আদিত্য আর শশধর বসল পার্টনার হয়ে। আমি দর্শক। কাগুজে রাজনীতির ভাষ্যকার হয়ে রবিদা দেশের হালচাল বর্ণনা করতে লাগল।

হেমলতাদির নেমন্তন্নয় কোনো ঘটা থাকে না। তিনি পাকা রাঁধুনি বলে পরিমিত খাদ্য অতি উপাদেয় করে সামনে এগিয়ে দিতে পারেন। আমরা তাঁর হাতের গুণগান এতই গেয়েছি যে, নতুন করে বলার মতন আর কিছু খুঁজে পেতাম না।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজলো কি হেমলতাদি আমাদের খাবার টেবিলে ডাকলেন। টেবিলে আমরা বড় সময় নিই। যত কথা, গল্প, হাসি-তামাশা সবই যেন টেবিলে তুফান বইয়ে দেয়। খেতে বসে সারখেলসাহেব হেমলতাদির গল্প বলছিলেন। বাচ্চা-কাচ্চারা যেমন নাকে পেনসিল, কানে সেফটিপিন গুঁজে দেয়—দিয়ে চেঁচায়, হেমলতাদি নাকি সেদিন কানে উলের কাঁটা গুঁজে দিয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদেছেন।

আমরা হাসাহাসি করছিলাম। হেমলতাদি মাধবীবউদিকে বোঝাচ্ছিলেন—"উলের কাঁটা নয় গো, চুলের কাঁটা। আজকাল সব প্লাস্টিকের কাঁটা হয়েছে না চুলে গোঁজার, সেই কাঁটা। আমার দু-চারটে পড়ে থাকে। কখনো মাথায় দি এক আধটা, কখনো কান চুলকোই। তোমাদের সারখেলসাহেব কানকে ধান করেন।"

এমন সময় বাইরে গাড়ি এসে থামার শব্দ হল। হর্ন বাজল।

হর্ন শুনেই আদিত্য বলল, "আমার অফিসের জিপ মনে হচ্ছে। তোমরা বসো, আমি দেখছি।"

আদিত্য খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছিল, মল্লিক এসে জানাল—সান্যালসাহেবের অফিস থেকে লোক এসেছে।

বেণুপ্রসাদ বলল, "সান্যাল, এগেইন দ্যাট নিমিয়াপুর? দোজ মাফিয়াজ?"

"গড নোজ!" আদিত্য তাড়াতাড়ি বেসিনে হাত ধুয়ে বাইরে চলে গেল।

আমরা খাওয়া শুরু করলাম। খানিকটা খাপছাড়াভাবে। অফিস থেকে জিপ্ নিয়ে ছুটে এসেছে যখন—তখন ব্যাপারটা জরুরি। আদিত্যকে না ছুটতে হয় এক্ষুণি। ওর আর খাওয়া শেষ হল না। হেমলতাদি গজগজ করতে লাগলেন।

একটু পরেই আদিত্য হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এল। বলল, "আমি যাচ্ছি। বেনিয়াডিহি যেতে হবে। কী ব্যাপার ভাল বুঝতে পারলাম না। সিং একলা এসেছে। সারখেলদা, আমি জিপেই চলে যাচ্ছি।" বলে রোহিণী—মানে ডালিমের দিকে তাকাল। "তুমি—তোমাকে কে পৌঁছে দেবে?" আমার দিকেই চোখ ফেরাল, "এই গগন, তুমি তো আমার লেজুড় হতে। তুমিই ওকে পৌঁছে দিও। চাবি রেখে যাচ্ছি।" বলে পকেট থেকে গাড়ির চাবি বার করে টেবিলের একপাশে রেখে দিল। "চলি হেমলতাদি, চলি রবিদা। চলি হে!···এই চাকরি কোনো ভদ্রলোকের নয়। ডালিম, তোমার ঘরের চাবিটাবি সব তোমার কাছে। আমার কাছে কিছু নেই।" আদিত্য টেবিল থেকে গ্লাস উঠিয়ে এক চুমুকে পুরো জলটাই খেয়ে নিল। তারপর আমায় বলল, "একটু সাবধানে চালিয়ো, আসবার সময় দেখলাম ব্রেকটা কম ধরছে। ভয়ের কিছু নেই। জাস্ট বলে দিলাম।"

আদিত্য চলে গেল।

আমরা এক একজন এক একদিকে থাকি। একই জায়গায় অল্প-

বিস্তর কাছাকাছি আর থাকি না। আগে অনেকেই অনেকটা পাশা-পাশি ছিলাম। এখন নয়। রবিদা থাকে মাইল চারেক তফাতে। তাকে যেতে হবে পূবদিকে। রবিদার গাড়ি আছে। কিন্তু তার গাড়ি ডালিমের কাজে লাগবে না। বেণু এসেছে শশধরের সঙ্গে। শশধর মোটর বাইক নিয়েই বেশির ভাগ সময় ঘোরাফেরা করে। বেণু তার পেছন ধরে এসেছে। ফেরার সময়ও একই সঙ্গে ফিরবে। শহরে পৌঁছে বেণু হয় ট্যাক্সি না হয় অটো-রিকশা নেবে। তা ছাড়া তাদের রাস্তা আমাদের রাস্তা নয়। ওদের হল উত্তর দিক। আমি আর আদিত্য একই দিকে থাকি। আদিত্য যেখানে থাকে সেখান থেকে মাইল দুই তফাতে। আমি আসার সময় অফিসের শর্মার গাড়িতে এসেছিলাম, আমায় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে সে দুর্গাপুরের দিকে চলে গিয়েছে। ফেরার সময় আদিত্যের শরণাপন্ন হতাম। আমার মোটর বাইক হপ্তা দুই হল গোপীমিস্ত্রির সারাইখানায় পড়ে আছে। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে দিচ্ছে না। মিস্ত্রিদের ধরনই এই।

হেমলতাদি বললেন, "তোমরা বাপু তাড়াহুড়ো করো না। এখনও ন'টা বাজেনি। সাড়ে ন'টার মধ্যেই সব বেরিয়ে যেয়ো। শীত সবেই পড়ব পড়ব করছে। চাঁদের আলো আছে। ভাবনার কিছু নেই।"

আমরা জানতাম, উঠতে উঠতে সোয়া নয় সাড়ে নয় হবে।

॥ দুই ॥

রবিদা চলে গেল সোয়া নটা নাগাদ। সামান্য পরে শশধর আর বেণু মোটর বাইক হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমাদের বেরুতে বেরুতে সাড়ে ন'টা বাজল। এই দেরিটুকু ডালিমের জন্যে। হেমলতাদির সঙ্গে তার কী-সব কথা শেষ করে নিচ্ছিল।

আমরা বেরোবার সময় সারখেল সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপে

তামাক ঠাসছিলেন, বললেন, "শীত এসে গেল, গগন। গরম কিছু নেবে নাকি ?"

মাথা নাড়লাম। আমার জামার তলায় পাতলা গেঞ্জি ছিল উলের। মাফলার ছিল গায়। এই যথেষ্ট।

ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন হেমলতাদি। বললেন, "দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। সাবধানে যেয়ো।...ডালিম, কাল এদিকে যদি কেউ আসে—চোখের ওষুধের নামটা লিখে পাঠিয়ে দিবি।...আদিত্য কোথায় ছুটলো কে জানে।"

গাড়িতে উঠে আমি ঠাট্টা করে ডালিমকে বললাম, "মেমসাহেব, তুমি যদি দশটার আগে পৌঁছতে চাও—পৌঁছে দিতে পারি।"

ডালিম বলল, "স্বর্গে, না, নরকে ?" হালকা করেই বলল, হাসির গলায়।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললাম, "একেই কপাল বলে, বুঝলে। আমি এঁচে রেখেছিলাম এক পেট খেয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে তোমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরব। কে জানত আমায় ড্রাইভারি করতে হবে।"

"বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ো। এখন ড্রাইভারি করো।"

"যো হুকুম মেমসাহেব," বলে আমি গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে এগিয়ে গেলাম। হেমলতাদি তখন আর ফটকের সামনে নেই।

ডালিমকে আমি ঠাট্টা করে অনেক সময় মেমসাহেব বলি। এদিককার কেতায় অফিসার টফিসাররা সবাই সাহেব, আর তাঁদের স্ত্রীরা মেমসাহেব। আদিত্য যদি সান্যালসাহেব হয়, ডালিম কেন মেমসাহেব হবে না!

তবে ঠাট্টাতামাশা না করেও ডালিমকে হয়ত মেমসাহেব বলা যায়। ডালিমের চেহারার আট আনা, বাংলা মতে, মেম-মেম। মাথায় লম্বা ডালিম, গড়ন ছিপছিপে, গায়ের রঙ মাখনের মতন, ধবধবে সাদা নয়। যদি মুখের গড়ন ধরতে হয়, ডালিমের মুখ লম্বা

ধাঁচের, চোয়াল সামান্য ভাঙা, টিকলো নাক, চোখের মণি একটু যেন ছাই রঙের। দাঁতগুলো ধবধবে। সুন্দর।

ডালিম আমাদের ভবানীপুরের মেয়ে। যদিও আমার পাড়ার নয়। ওর বাপের বাড়ি এলগিন রোডে। ডালিমের বাবা ছিলেন জিওলোজিস্ট। মা বায়োকেমিস্ট। দুজনেই বইপত্র ঘেঁটে জীবন কাটাতেন। বাবা মারা যান হার্টের রোগে। মা এখনও রয়েছেন। ডালিমের বয়েসও তো কম হল না। চল্লিশ ছাড়িয়ে এসেছে। তার মেয়ে ঝুমুরের বয়েসই বছর সতেরো। সে কলকাতায় তার দিদিমার কাছে থাকে। বরাবরই। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় মা-বাবার কাছে আসে। মুখচোরা, শান্ত মেয়ে। কোথাও যেন সামান্য অস্বাভাবিকতা রয়েছে। মেয়েকে নিয়ে আদিত্য আর ডালিমের মধ্যে এক ধরনের রাগারাগি অশান্তি আছে। আদিত্য চেয়েছিল, মেয়ে হয় তাদের কাছে থাকবে, না হয় আদিত্যর মায়ের কাছে। ডালিম রাজী হয়নি। আদিত্যর মা এখন অবশ্য আর নেই।

গাড়ির আলো আমার চোখে কেমন কমজোরি লাগছিল। ফাঁকা রাস্তা, দু'পাশে মাঠ, গাছগাছালি। আলো আরও জোর হওয়া উচিত ছিল।

"আলো এত কম লাগছে কেন?" আমি বললাম।

"কী জানি।"

"আদিত্য নিজে গাড়ি চালায়, কিছুই খেয়াল রাখে না?"

"সব রাখে না। দরকারেরটা রাখে?" ডালিম বলল। "তোমায় যে কী বলল। ব্রেক···?"

"কম ধরছে। অসুবিধে হবে না। চলে যাবে কোনোরকমে।" হাতের সিগারেট ফেলে দিলাম। "আদিত্যকে বলো, এদিককার রাস্তাঘাটে এভাবে গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা ভাল না। ক'দিন আগে কী বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে শোনোনি?"

"কানে এসেছিল। ভাল করে শুনিনি।"

"ফায়ার ব্রিক্সের এক চ্যাটার্জি, মোহানির লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা মেরে দিল। মিস্টার আর মিসেস স্পট ডেড। বড় মেয়েটা হাসপাতালে পড়ে আছে। সিরিয়াস কণ্ডিশান। ছোট ছেলেটা বেঁচে গেছে। শুনলাম, ব্রেক ফেল করে গিয়েছিল। ঠিক কী হয়েছিল জানি না।"

ডালিম প্রথমটায় কিছু বলল না। বোধহয় ঘটনাটা ভাববার চেষ্টা করছিল। পরে বলল, "দেখো, তুমি যেন ব্রেক ফেল করো না।"

ডালিমকে একবার পলকের জন্যে দেখে নিলাম। হালকা রঙের শাড়ি, গায়ে বুঝি রেশমী চাদর, মেয়েলি ; এলোমেলো চুলে কানের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে।

"পা আমার, কিন্তু গাড়ি তোমাদের, তোমরা কী করে রেখেছ ব্রেকের হাল কেমন করে বলবো।" বলে আমি হাসলাম। "দেখা যাক··· ।"

ডালিম কোনো কথা বলল না।

মাইলটাক পথ পেরিয়ে এসেছি, কিছু বেশিই হবে।

আমাদের রাস্তা সিধেসিধি নয়। মাইল চার-পাঁচ রাস্তা নাক বরাবর ছুটতে হবে। তারপর ডাইনে বাঁয়ে পাক খেতে খেতে এগুতে হবে। এ দিককার রাস্তাঘাট কোনো কালেই ভাল নয়। যদিও বলে পাকা সড়ক, আসলে সড়কের বারো আনা এবড়োখেবড়ো, গর্তে ভরা। পিচ্ উঠে পাথর বেরিয়ে আছে মাঝে মাঝেই। ওরই মধ্যে এই রাস্তাটুকু মন্দের ভাল ; পরের দিকে খুবই খারাপ। রাস্তাও পাকা নয়, মানে পাথর ছড়ানো, পিচ পড়েনি।

গাড়ির আলোয় আমার অসুবিধে হচ্ছিল। চোখে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। মেটে হলুদ মতন আলোটুকু সামনে পড়েছে—তাতে পঁচিশ-তিরিশ ফুটের বেশি বড় নজরে আসে না।

সাবধানেই যাচ্ছিলাম। রাস্তার দু'পাশে হয় ঢালু জমি না হয়

গাছপালা। চাঁদের আলো পরিষ্কার নয়। কার্তিকের শেষদিকে কুয়াশা নামছে ঘন হয়ে। আশপাশের ধূলোধোঁয়া কোথাও কোথাও মাঠের মাথায়, বাতাসে জমে আছে। কোলিয়ারির কাছাকাছি জায়গাগুলো বরাবরই এই রকম।

"তোমার নাকি বদলি হচ্ছে?" ডালিম বলল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ডালিমকে। এ-বাড়িতে শুনল নাকি কথাটা। বললাম, "শুনছি। গুজব।...আর বদলি করলেই বা কী, দু-চার বছর পর পর তো করছেই।"

"এবার কোথায় যাচ্ছ?"

একবার আয়নাটাকে দেখে নিলাম। আলোর মতন লাগল। "গুজব যদি সত্যি হয়—ভাল জায়গায় যাচ্ছি।"

"জায়গাটা কোথায়?"

"খাড়ি বলে একটা নদী আছে শুনেছ? নদী নয়, নালা। বর্ষাকালে বরাকর নদীর জল ঢুকে পড়ে, অন্য সময় খটখটে শুকনো, বালি আর পাথর..."

"যেখানে মেলা হয় মাঘ মাসে?"

"ঠিক ধরেছ। একদিকে মেলা হয়। আর অন্যদিকে মড়া পোড়ানো হয়। শ্মশান। নাম করা শ্মশান; গইরিবাবার শ্মশান। সেখানে পুড়লে একেবারে স্বর্গবাস?" আমি মজার গলায় বললাম। হাসতে হাসতে।

ডালিম বলল, "শ্মশানে তোমার কী।"

"আমার লাভ বই ক্ষতি নেই, মেমসাহেব। বয়েস অনুপাতে একটু আগে আগে যাচ্ছি। কিন্তু যেতে তো হবেই।"

সামান্য চুপ করে থেকে ডালিম বলল, "ওখানে কোন্ কোলিয়ারি?"

"ওখানে ঠিক নয়, একটু তফাতে। ছোট বেলমাটি।...তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে গেলাম। দেখাটেখা ন' মাসে ছ' মাসে

যদি হয়। হেমলতাদির নেমন্তন্ন আর রাখা যাবে না।···তোমরা যখন সবাই মিলে টেবিলে বসবে, একটা বাড়তি প্লেটে আমার নামে এক আধ চামচে করে এটা ওটা উৎসর্গ করে দিও। শ্রাদ্ধে নাকি দেয়?"

"দেখা যাবে। গাড়ি আসছে পেছনে···।"

পেছনের আলো আগেই দেখেছি। গাড়ি আসছিল। পাশ দিলাম। গাড়িটা চলে গেল। ভ্যান। এই রাস্তায় এ-সময় খুব একটা গাড়ি ছোটে না। তবু এরই মধ্যে কয়েকটা গাড়ি এসেছে গিয়েছে।

মাইল পাঁচেক পথ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বাঁ দিকে রেল লাইনের সিগন্যাল চোখে পড়ছিল। সবুজ হয়ে রয়েছে। কোনো মালগাড়ি আসছে বোধহয়। এখনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এদিককার লাইনে মালগাড়িই বেশি চলে।

ডালিম বলল, "সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছি।" বলে চুপ করে থাকল।

"কী স্বপ্ন?"

"তোমাকে নিয়ে।"

"আমাকে নিয়ে।···বলো কি মেমসাহেব? আগে একবার আমাকে স্বপ্ন দেখেছিলে; তোমাদের বাড়ির কুকুর আমায় কামড়ে দিয়েছে··· ।"

"আ, এত বাজে কথা বলো!···স্বপ্ন আমি মাঝে মাঝেই দেখি। বলি না। তুমি দেখো না?"

রাস্তার সামনে গাছের ডালটা চোখে পড়ল। বেয়াড়াভাবে পড়ে আছে, আধ শুকনো বোধ হয়, পাতা রয়েছে। পাশ কাটাতেই গর্ত, কিছু একটা লাগল তলায়। আদিত্যর গাড়ি বড় নিচু। এদিককার রাস্তায় অচল।

"আমি স্বপ্ন দেখলাম, তুমি যেন একটা গুহার মধ্যে বসে আছ।

গুহা হতে পারে কিংবা ওই রকম এক বড় ফোকর। কালো কালো লাগছিল।"

"বাঃ! এ তো ভাল স্বপ্ন! সাধু সন্ন্যাসীরা গুহায় থাকে। সাধনভজন করে। ধুনি জ্বালায়। কী দেখলে, মেমসাহেব? আমায় কেমন দেখাচ্ছিল? জটা হয়েছে? দাড়ি?"

"না—" মাথা নাড়ল ডালিম। "দেখলাম, তুমি অন্ধ হয়ে বসে আছ। আমায় দেখতে পেলে না, চিনতে পারলে না। শোভা এসে তোমার হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গেল।"

আমার চোখের সামনে আলোটা যেন আরও মেটে অস্পষ্ট হয়ে গেল। হতে পারে, ডান দিকে মোড় নেবার সময় ধুলো উড়েছিল বেশি। ধুলোটা ছড়িয়ে গিয়েছিল। পেছন থেকে সামনের দিকে উড়ে এসেছে।

"শোভাকে তুমি দেখোনি মেমসাহেব। চিনলে কেমন করে?"

"তোমার বাড়িতে ছবি দেখেছি।"

গাড়ি ডানদিকে মোড় নিয়ে আধ-পাকা রাস্তা ধরেছিল। এই রাস্তাটা বল্লভপুকুর কোলিয়ারির দিকে চলে গেছে। রাস্তার দু পাশে বনতুলসির ঝোপ। মাঝে মাঝে কাঁটা গোলাপ। আর জংলা টুসি। গন্ধ উঠছিল ঝোপঝাড় থেকে। ভারী গন্ধ। অনেকটা তফাতে বুঝি ছোট ছোট ধানক্ষেত। চোখে পড়ছিল না কিছুই। ধুলোয় কুয়াশায় চাঁদের আলোয় মেশামিশি হয়ে সবই ঝাপসা-কালো।

"আমি একটা কথা ভাবি," ডালিম বলল, গলার স্বর মৃদু, খানিকটা অন্যমনস্ক। "জীবন এমন বেঁকা হয় কেন? সরাসরি চলে গেলে ক্ষতি কী ছিল!" বলে চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত। আবার বলল, "তুমি শোভার খোঁজ-খবর করলে পারতে।"

আমি কিছুক্ষণ কোনো কথা বললাম না। পরে বললাম,

"করিনি কে বলল?"

"তেমন করে করোনি নিশ্চয়। করলে একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না?"

রাস্তার মাঝখানে যেন নৌকার পিঠ উলটে রয়েছে, মাটি আর পাথরের ঢিবি, সাবধানে ঢিবি টপকালাম। আবার গাড়ির তলায় লাগল। এই রাস্তাটা না-ধরে ঘুর পথে পটারি রোড ধরলে ভাল হত। তাতে খানিকটা ঘুরতে হত ঠিকই, তবে রাস্তাটা মন্দের ভাল।

"তোমরা আসবার সময় এই রাস্তা ধরে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"ভীষণ খারাপ রাস্তা। শর্মা আমাকে পটারি রোড দিয়ে এনেছে।"

"কী জানি। আমি এদিককার রাস্তা ভাল বুঝতে পারি না।" ডালিম বলল। বলেই তার পুরনো কথায় ফিরে গেল। "শোভা যদি কোনোদিন ফিরে আসে? কী করবে?"

"আসবে না।"

"যদি আসে?"

"যে নেই সে আসে না।" আমি কথাটা থামিয়ে দিতে চাইলাম। "আর এলেও স্বপ্নে আসে, যেমন তোমার কাছে এসেছে।"

ডালিম কথা বলল না।

শোভা আমার স্ত্রী। এক সময়ের। এখন আমার বয়েস ছেচল্লিশ। বছর চৌত্রিশ বয়েসে যখন আমি তেজী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, চাকরি ধরি, ছাড়ি, বনিবনা হয় না অনেকের সঙ্গেই, মা শ্রীরামপুরের বাড়ি আগলে পড়ে থাকে, ছোট ভাই চা-বাগানে—তখন খানিকটা আচমকা শোভা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। মেয়েটিকে আমি দেখেশুনে, কিংবা আলাপ পরিচয় করে বিয়ে করিনি। মায়ের পছন্দেই হয়েছিল।

বিয়ের পর পর শোভা শ্রীরামপুরে মায়ের কাছে কিছুদিন ছিল।

তারপর আমার কাছে। আমার কাছে থাকার সময় আমি বুঝতে পারি, শোভা ঠিক স্বাভাবিক নয়। সাধারণভাবে দেখলে প্রথমটায় এ-সব নজরে পড়ে না। আমারও পড়েনি। সে সুন্দরী ছিল না। সুশ্রী ছিল। তার আচার-ব্যবহার কথাবার্তা ছিল স্বাভাবিক। শান্ত, নরম স্বভাব। সংসারের কাজে অযত্ন ছিল না শোভার। তবে অতি যত্নও নয়। শোভার চোখ দুটি আমার বড় ভাল লাগত। মনে হত, ভরা বর্ষার মেঘের মতন ঘন ও সজল তার চোখ। হাসিটিও ছিল স্নিগ্ধ। কিন্তু ক্রমশই বোঝা যাচ্ছিল এই শোভা আর ভেতরের শোভা এক নয়। ভেতরের শোভা ছিল নির্লিপ্ত উদাসীন বিষণ্ণ। একা। গভীরভাবে তাকে লক্ষ্য করতে করতে আমার মনে হল, আয়নার ওপর ভেসে ওঠা ছায়ার মতনই যেন সে। মনে হয় আছে, কিন্তু থাকে না। সে দৃশ্যগোচর, অথচ স্পর্শযোগ্য নয়। অদ্ভুত এক দূরত্ব দিয়ে ঘেরা ছিল শোভা। সে কাছে ছিল, তার সত্তা ছিল না। বিছানায় পাশাপাশি শুয়েও তাকে নিবিড় বলে মনে হত না, মনে হত না সে আমার নিজস্ব। অনেক দিন এমন হয়েছে, ঘুম ভেঙে দেখেছি শোভা পাশে নেই, অন্য কোনো ঘরে বা বারান্দায় গিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কখনো কখনো তার আলমারি খুলে শাড়িজামা বার করত, করে টাল করে বিছানায় ফেলে রাখত সারাদিন। কেন, আমি জানি না। বোধহয় সে বোঝাতে চাইত, আমাদের বিছানায় ও ওর পোশাকের মতনই পড়ে থাকে।

বছর দুই শোভা আমার কাছে ছিল। এই দু বছরে তার স্বভাব পাল্টাল না। বরং আমাদের দূরত্ব বেড়ে গেল। আমি বিরক্ত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম। এমন কি আমাদের মধ্যে অশান্তিও ঘটত। শোভার মাঝে মাঝে ফিট হতে শুরু হল। ডাক্তার বলল, হিস্টিরিয়া। দেখতে দেখতে তার মধ্যে এক ধরনের ব্যাধি এসে দেখা দিল। বোবা, নিঃসাড়, হয়ে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কাঁদত। একদিন শাড়ির আঁচল খুলে উনুনে ফেলে দিল।

দিনুর মা কাছে না থাকলে সেদিন শোভা আগুনে পুড়ে মরত।

শোভা পাগল হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাকে আমি শ্রীরামপুরে মার কাছে রেখে এলাম। ডাক্তার দেখানো এবং চিকিৎসা দরকার। কলকাতার এক ডাক্তার তাকে দেখতে লাগল।

মাস দুইও পুরো হল না, শোভা শ্রীরামপুরের বাড়ি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। মা সন্দেহ করল, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে সে। জোয়ারের জল তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কে জানে!

এসব আজ আট দশ বছর আগের কথা। শোভার কী হয়েছে আমি জানি না। সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটা খোঁজ করার দরকার আমি করেছিলুম। কোনো ফল হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, শোভা আমার কাছে অনেকদিনই মৃত। তার স্মৃতি নিয়ে মালা জপ করার কোনো কারণ আমার নেই। কদাচিৎ তাকে হয়ত মনে পড়ে। মনে পড়লেও ও-সব ভাবনা নিয়ে বসে থাকি না। যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। অতীত অতীতই। শোভার একটা ছবি, নাকি দুটো, আমার ঘরে থেকে গেছে এইটুকুই যা তার চিহ্ন। না রাখলেও চলত তবু রেখে দিয়েছি।

"গগন?" ডালিম আমার কাঁধের কাছে তার হাত ছোঁয়াল, নিঃশ্বাস-চাপা গলায় বলল, "তুমি ভাবছ, তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা করছি।"

"ভাবছি না। আর ঠাট্টাই যদি করো, অন্যায় কী করেছ?"

"সত্যি আমি ঠাট্টা করিনি। স্বপ্নটা আমি দেখেছি। ...আমি মাঝেমাঝেই তোমার স্বপ্ন দেখি।"

রাস্তার দিকেই আমার চোখ। আলো আর ফুটছে না। ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছে। কাছাকাছি কোনো এঁদো পুকুর থেকে পাঁকের গন্ধ ভেসে এল। হয়ত পুকুর নয়, জলাভূমি। দু পাশের ঝোপ গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।
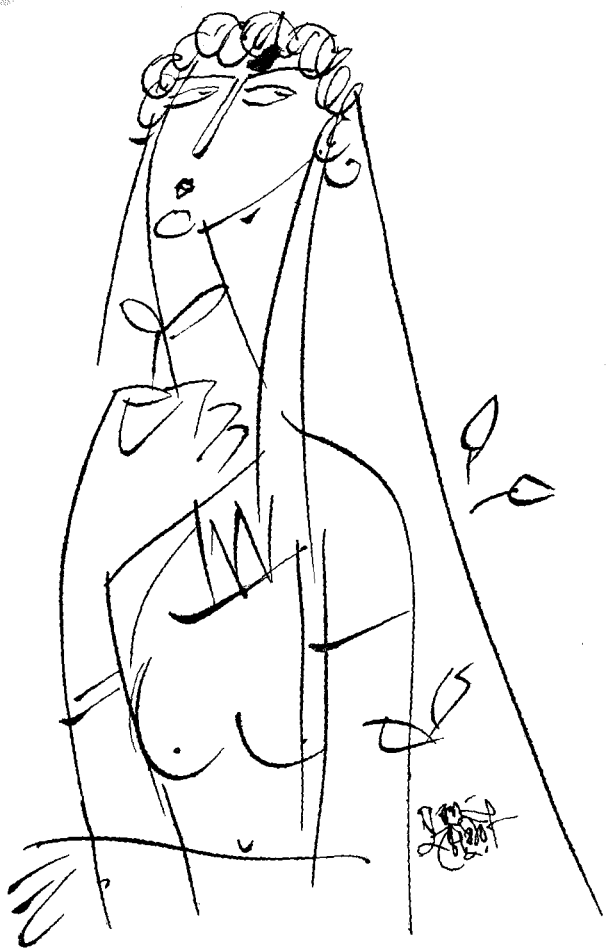
"তুমি আমায় দেখ না?" ডালিম বলল।

"এই তো দেখছি—"

"স্বপ্ন দেখো না?"

"কে না দেখে!···তবে এই বয়েসে স্বপ্নগুলো ধুলোভরা গাছের পাতার মতন। তাই না?"

"কী বলছ? ধুলোও তো ধুয়ে যায়; কখনো কখনো; বৃষ্টি এসে ধুয়ে দিয়ে যায়।"

আচমকা দেখি কী যেন হয়ে গেল। চোখে কিছু দেখতে পাই না। শুধু অন্ধকার। গাড়ির আলো নিবে গিয়েছে। ব্রেক ধরতে দু মুহূর্ত দেরি হল। গাড়ি থামল। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকার থিতিয়ে কুয়াশাজড়ানো ময়লা জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছিল।

॥ তিন ॥

আলো আর জ্বলল না। নতুন করে স্টার্টও হল না। গাড়িতে একটা টর্চও নেই। আদিত্য এমন বেখেয়ালে কে জানত। এসব দিকের রাস্তায় টর্চ না নিয়ে কেউ রাত্তিরের দিকে বেরোয় না। কোথায় কী হয় কেউ কি বলতে পারে। আদিত্যর গাড়ি হাতড়ে কিছুই পাওয়া গেল না; পুরনো একটা প্লাগ স্ক্রু ড্রাইভার, গোটা কয়েক নাট, ছেঁড়া এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই।

আমার মিস্ত্রিগিরি কোনো কাজে এল না। চার চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে একসময় ঘোরাঘুরি করলেও এখন দু'চাকাই আমার পক্ষে সুবধের হয় বলে প্রথমটা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। তবু চেষ্টা করলাম। ডালিম আমায় লাইটার জ্বালিয়ে আলো দেখাবার চেষ্টা করছিল। কিছুই হল না। আঙুল পুড়তে লাগল ডালিমের। গাড়ি কোনো সাড়াশব্দ করল না।

"এখন কি করবে?" ডালিম বলল।

করার মতন কিছুই দেখছিলাম না। আশেপাশে শুধু মাঠ, ঝোপ। কাছাকাছি গাঁ-গ্রামও চোখে পড়ছিল না আমাদের। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। এসময় এই ধরণের প্রাইভেট রোড দিয়ে গাড়ি-টাড়িও যাবার কথা নয় তেমন। কোলিয়ারির কেউ যদি গাড়ি নিয়ে এসে পড়ে অন্য কথা।

চারদিকে তাকিয়ে আমি কোনো ভরসা পাচ্ছিলাম না। আদিত্যর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। "গাড়িতে একটা টর্চ পর্যন্ত রাখবে না তোমরা—? নাও, এখন পড়ে থাকো সারা রাত। মিস্ত্রি ধরে না আনলে কিছু হবে না।"

ডালিম গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছিল। আমি তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

"এখানে মিস্ত্রি কোথায় পাবে?" ডালিম বলল।

"এ তল্লাটেই পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তাছাড়া এই রাত্তিরে করবারও কিছু নেই। একেবারে জলে পড়ে গেলাম।"

ডালিম কিছু বলল না।

সামান্যতে আমি বড় একটা অধৈর্য হই না। উদ্বেগও বোধ করি না। কিন্তু আদিত্যর গাড়ি নিয়ে আধঘণ্টা খানেক ধস্তাধস্তি করার পর আমি অধৈর্য, উদ্বিগ্ন, বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এই গাড়িটাকে আর এক পাও এগিয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। রাস্তা আটকে গাড়িটা পড়ে থাকল। অন্য কোনো গাড়ি যদি এ-রাস্তায় এসে পড়ে, তার পক্ষে এগুনো মুশকিল। রাস্তা কাঁচা ছোট, এবড়ো-খেবড়ো। তবু কোনো গাড়ি এসে পড়লে হয়ত ভাল হয়; কোনো রকম সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

ডালিম বলল, "তাহলে আর বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ কেন? ভেতরে এসে বসো।"

"তাই বসতে হবে। আদিত্য সমস্ত ব্যাপারে এত কেয়ারালেস কেন আমি বুঝতে পারি না। মোটর-গাড়ি গোরুরগাড়ি নয়; গোরু

জুতে দিলেই চলে না। তুমি বলো, নিজেই বলো, খারাপ ব্রেক, ডাউন ব্যাটারী, তাপ্পিমারা তার—এসব নিয়ে কেউ বাইরে বেরোয়? তাও আবার সঙ্গে বউ। আশ্চর্য!"

ডালিম সামান্য চুপচাপ থাকল; তারপর বলল, "আমি কী করব বলো! গাড়ির খবর আমি রাখি, না জানি?".

"না, তোমায় বলছি না!...ভাবছি কী করা যায়? কোনো উপায় দেখছি না, ডালিম।"

"উপায় না থাকলে ভেতরে এসে বসো।" ডালিম বলল, "না হয় চলো দুজনেই হাঁটতে শুরু করি।"

আমি ডালিমের দিকে তাকালাম। জানলার কাচ নামানো। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"তুমি তো দেখছি দিব্যি ঠাট্টা করতে পারছ? নার্ভাস হচ্ছ না?"

"আর নার্ভাস হয়ে কী করব! তুমি তো রয়েছ।

"বাঃ!"

ডালিম যেন হাসল। "ভেতরে এসে বসো, ঠাণ্ডা লাগিয়ে লাভ নেই। বাইরে বেশ হিম পড়ছে। দাঁড়িয়ে ছিলাম তো—মাথা ভিজে গেল। কী রকম কুয়াশা হয়েছে দেখেছ?"

মাঠের ওপর কুয়াশা ঘন হয়ে জমে আছে, এত ঘন যে ধোঁয়ার মতন চাপ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের আলো এখনও ফুটফুটে হয়ে ওঠেনি, ওঠার কারণও নেই, আলোর সঙ্গে কুয়াশা জড়ানো। ধুলো এবং কোলিয়ারির ধোঁয়াও মাঠেঘাটে প্রচুর জমে থাকে বড় সড় গাছ-গুলো মাথা ভরতি অন্ধকার নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে। কালো দেখাচ্ছিল। আকাশের একপাশে মিটমিটে তারা, চাঁদটা যেন ঘুমচোখে চেয়ে আছে।

শীত করছিল। রাস্তায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে মনে হল না। হিম পড়ছে।

"বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা খেয়ে তোমার...."

"না ; বসছি" দরজা খুলে আমি গাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। সামনের কাচ অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। হিমে ভিজে যাচ্ছে।

কাশির দমক এল। শুকনো কাশি। "ডালিম?"

"উঁ?"

"আদিত্য তো বাংলোয় ফিরে তোমায় দেখতে পাবে না।"

"যদি ফেরে।....কাজে ডেকে নিয়ে গিয়েছে যখন—চট করে ফিরতে পারবে না। ফিরতে অন্তত শেষ রাত।"

"ফিরতেও পারে তাড়াতাড়ি।"

"আশা কম। বরং বলতে পারি—কাল সকালের দিকেও বাড়ি ফিরতে পারবে না। দেখি তো।"

"তুমি কেবল ঠুকে যাচ্ছ কেন বলো তো। ..আমি ভাবছি, আদিত্য যদি তাড়াতাড়ি ফেরে, ফিরে দেখে—বউ বাড়ি ফেরেনি, অফিসের জিপ নিয়ে খোঁজ করতে বেরুতে পারে।...তুমি তাহলে বেঁচে গেলে।"

"আমি বাঁচলাম, না, তুমি বাঁচলে?"

ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে কাঁধের কাছে ব্যথা করে উঠল। মাসখানেক আগে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যথাটা তখন থেকে। নিজেকে সইয়ে নিতে নিতে সিগারেট ধরালাম। ঠাণ্ডাটা কাটিয়ে ফেলা দরকার।

ডালিম আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল।

"আমার বাঁচার চেয়েও তোমার বাঁচাটা ইমপর্টেন্ট। ...তুমি একজন মহিলা। ম্যারেড। বাড়ি ফিরে তোমায় না দেখতে পেলে আদিত্য মাথার চুল ছিঁড়বে।"

"কেন? বউ পালিয়েছে ভাববে?"

"গাড়ি উলটে গেছে ভাবতেও পারে," আমি তামাশার গলায় বললাম। "আনাড়ির হাতে গাড়ি ছাড়লে লোকে তাই ভাবে।"

"তুমি আদিত্যকে যতটা চেনো আমি তার চেয়ে বেশি চিনি," ডালিম থেমে থেমে বলল, "এমন তো হতে পারে গাড়িটা তোমায় দিয়ে গেছে ওল্টাবার জন্যেই।"

কথাটা কানে লাগলেও আমি গা করলাম না। বরং ডালিমের কথায় যেন মজা পেয়েছি, হেসে বললাম, "কী যে বলছো! এমন জলজ্যান্ত বউ! একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে বউ হাত-পা খোঁড়া হয়ে থাকুক, এটা কেউ চায় নাকি?"

ডালিম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, সামান্য পরে বলল, "কে কী চায়—সে নিজেই হয়ত সবসময় জানে না।...যাকগে, তুমি বড় দোটানায় পড়েছ! ভাবছ, পরের বউকে নিয়ে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ির মধ্যে বসে রাত কাটালে তোমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।...মুখের বড় ভয় তোমার, তাই না?"

"আমার মুখ—?" আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। "আমার মুখ একেবারে ভোঁতা দেখাবার মতন নয় এমনিতেই। কিন্তু মেমসাহেব তোমার মুখ! ওর যে অনেক দাম।"

ডালিম ঘাড় ফেরালো না। তার কানের পাশে চুলগুলো আরও অগোছালো হয়ে গিয়েছিল। ডালিম বলল, "আমার মুখের দাম আমি জানি। ও নিয়ে তোমায় আর ভাবতে হবে না।...তুমি নিজের কথা ভাবো।"

"তুমি বড় সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ, মেমসাহেব। ...কী অবস্থায় পড়ে গিয়েছি—,তোমার কোনো ভয়ডর নেই যেন! দুশ্চিন্তাই হচ্ছে না?"

"তোমার মতন ভয় আমার নেই। আমায় কেউ খুন করতে আসছে না এখানে। ডাকাতি করতে এলেও বড় একটা লাভ হবে না। সোনাদানা না থাকার মতন। যা দেখছ এর বারো আনা নকল।"

"আসল নকল বোঝা যায় না।"

"বুঝতে দিই না, তাই—। তা বলে তুমি যে আমার নকলটা বুঝতে

তুমি পার না—তা নয় গগন। সবই বোঝ···।" ডালিম চুপ করে থেকে পরে কী মনে করে একটু হাসল। বলল, "অনেকগুলো বছর এমন করেই কাটিয়ে এলাম। নকল হয়ে। আর ভাল লাগে না। বয়েসটা কত হল জান? বুড়ি হয়ে গিয়েছি।"

"তোমায় দেখে কি সেটা কেউ বুঝবে?" মজা করেই বললাম।

"বুঝবে না? ঝুমু-র বয়েস কত জান?"

"সতেরো-আঠারো।"

"আমার ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েসে ঝুমু হয়েছিল। যার মেয়ের বয়েস সতেরো আঠারো তাকে বুড়ি বলবে না?" ডালিম যেন আমাকে সহজ এক অংক শিখিয়ে কাঁধের কাছে আলগাভাবে খোঁচা মারল।

আগে চোখে পড়লেও নজর করিনি তেমন করে। রাস্তার পাশে ঝোপের গায়ে জোনাকি উড়ছে একরাশ। ঝিঁঝিঁর ডাক কানে আসছিল। মাঠের গন্ধটা কেমন শুকনো খসের মতন লাগছিল। হেমন্তর রাত যেন সারা মাঠ জুড়ে কিসের সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে। মৃদু অথচ গাঢ়। "ঝুমু কেমন আছে? ক্রিসমাসের ছুটিতে আসছে?"

ডালিম প্রথমে চুপ করে থাকল। পরে বলল, "না, আসছে না। আমি আনছি না। নিজেই আমি কলকাতায় যাব।" ডালিমের গলার স্বর অন্য রকম শোনাল। অন্যমনস্ক, গম্ভীর যেন।

আমি কিছু বুঝলাম না। হেমলতাদির বাড়ি থেকে আসার সময় ডালিম ঝুমুকে নিয়েই কথা বলছিল ওঁর সঙ্গে। যদিও আমরা কাছাকাছি ছিলাম না—তবু ডালিমকে ডাকতে গিয়ে আমি ঝুমুর নাম শুনেছি।

"তুমি নিজেই এবার বড়দিনে কলকাতা যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। ডিসেম্বরেই যাব।"

"হঠাৎ?"

"ঝুমুর একটা কিছু করতে হবে।···মা অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা

বলে এক ডাক্তার ঠিক করেছে। ভদ্রলোক বাইরে ছিলেন। বছর দুই হল কলকাতায় এসেছেন। নিউরোলজিস্ট। ঝুমুকে তাঁর ট্রিটমেণ্টে রেখে দেখব, কী হয়?"

ঝুমুকে আমি আজ ক'বছরই দেখছি। মাঝে মাঝে। ছুটি ছাটায় মা-বাবার কাছে এলে তাকে দেখি। দেখতে রোগারোগা, খুবই রোগা, গায়ের রঙ তার মায়ের চেয়েও ফরসা। মেয়েটার গায়ের চামড়া এতই পাতলা যে শিরা উপশিরাগুলো পর্যন্ত দেখা যায় যেন। টলটলে চোখ, ফিনফিন করেছে ঠোঁট দুটো। মাথায় বেশি চুল নেই, ছেলেদের মতন দেখায় অনেকটা। শান্ত, চুপচাপ মেয়ে, দেখলে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আমরা জানি ঝুমুর অদ্ভুত অসুখ আছে। তার বাঁ পা কিংবা হাতের সামান্য গোলমাল—যাকে ডিফর-মিটি বলা উচিত কিনা আমি জানি না—চট্ করে নজরে পড়ে না। শুনেছি, ঝুমুর ওটা জন্মগত ত্রুটি। অসুখটা কিন্তু অন্যরকম। অদ্ভুত অসুখ। শোনা যায় না। আমি অন্তত শুনিনি। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায় ঝুমুর। একেবারে বোবা হয়ে থাকে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না; শুধু একটা শব্দ থাকে গোঙানির! বার-তেরো বছর বয়েস পর্যন্ত এ অসুখ ছিল না। জিবের সামান্য আড়ষ্টতা ছিল। ওই বয়েসের পর হঠাৎ অসুখটা দেখা দেয়। কিছুই বোঝা যায়নি প্রথমে। ডাক্তারও বুঝতে পারেনি। অসুখটা হয়েছিল হঠাৎ, সেরেও গেল নিজের থেকে। তারপর দু-চার মাস অন্তর এই রকম হতে লাগল। আচমকা হয়, সেরেও যায়। দু একদিন ওই বোবা অবস্থায় থাকে, আবার কথা ফিরে আসে। সপ্তাহখানেকের বেশি কখনো বোবা হয়ে থাকেনি ঝুমু। এটা কেন হয়, কী জন্যে, সারবে কি সারবে না—কেউ বলতে পারেনি। ডাক্তার-বদ্যি অনেক হয়েছে, লাভ কিছু হল না। আসলে, ঝুমুকে কলকাতায় নিজের মায়ের কাছে ডালিম রেখে দিয়েছে মেয়ের জন্যেই। মা ওকে সামলাতে পারে, আগলাতে পারে, ডাক্তার ওষুধ করতে পারে।

“তুমি তাহলে কলকাতায় বেশ কিছুদিন থাকবে ?”

“তাই ইচ্ছে। মেয়ে বড় হয়েছে। তুমি বুঝতেই পার—এই বয়েসটা কী রকম। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। ঝুমুকে মা যেভাবে আগলে রাখে, আমি পারতাম না। একটু বড় ইমোশন্যাল, কিছু হলেই ঝুমুর ওই রকম হয়ে যাবার ভয় থাকে। এখানে থাকলে প্রায় ওর ওই রকম হয়। আমি তো ওকে বাঁচাতে পারি না। মা পারে। মা ওকে কত দিক থেকে বাঁচিয়ে রাখে—তুমি জান না।”

“এখন কেমন আছে ?”

“ভাল। মা লিখেছে, পরীক্ষার পড়াশোনা করছে মন দিয়ে। সেতার ধরেছে। তাতে বাঁ হাতটার উপকারই হচ্ছে।”

“আদিত্য কী যাচ্ছে তোমার সঙ্গে ?”

“না,” ডালিম মাথা নাড়ল। “ও যাবে না। গিয়ে কোনো লাভ নেই।” বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, “বাবাকে ঝুমু পছন্দ করে না। বাবাও মেয়েকে দেখলে খুশি হয় না।”

ডালিমকে দেখলাম। তার গায়ের রেশমী কাপড়টায় গলা পিঠ জড়ানো। হালকা রঙ কালচে দেখাচ্ছিল। মেয়েকে নিয়ে আদিত্য আর ডালিমের মধ্যে যে অশান্তি রয়েছে এটা আমরা কমবেশি সকলেই জানি। খোলাখুলি কোনো আলোচনা করি না। ডালিম হয়ত করে, হেমলতাদির সঙ্গে করতে পারে, আমি জানি না।

“তুমি বড় বেশি বেশি বলছ,” আমি যেন আদিত্যর হয়ে বললাম, “নিজের মেয়ে তাকে কেন পছন্দ করবে না আদিত্য! সে তো বরাবরই চেয়েছে ঝুমু তোমাদের কাছে থাক।”

ঘাড় ফেরাল ডালিম। রূঢ়ভাবেই বলল, “কাছে রাখতে চাইলেই বুঝি সব হয়ে যায়। মেয়ে কি কুকুর বেড়াল বাড়িতে রেখে দিলেই দায় ফুরিয়ে গেল। তোমাদের আদিত্য মুখে যা বলে কাজেও সেটা চায় না। নিজের মান মর্যাদা বাঁচাতে চাইলে মুখে ওটা বলতে হয়। মেয়ের ওপর তার মায়া-মমতা কত আমি জানি।”

ডালিমদের পারিবারিক কথা এভাবে শোনার ইচ্ছে আমার হচ্ছিল না। সামনে তাকিয়ে থাকলাম। হঠাৎ মনে হল, দূরে যেন আলো দেখা যাচ্ছে।

ডালিম বলল, "মেয়েকে ও ঘেন্না করে। বলে, কোথা থেকে এক হুলো গোঙা বোবা মেয়ের জন্ম দিয়েছ! ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকার মতন একটা মেয়েও পেটে ধরতে পারলাম না!" বলে ক' মুহূর্ত চুপ করে আবার বলল, "পেট আমার যে, দোষও আমার!"

কথাটা শুনেও না-শোনার ভান করে বললাম, "একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। সামনে। দেখো তো, এদিকে আসছে কিনা।"

ডালিম কোনো কথা বলল না।

হিমে ভেজা কাচের আড়ালে ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। খানিকটা অপেক্ষা করে গাড়ির দরজা খুলে নিচে নামলাম। তাকিয়ে থাকলাম সামনে। একটা আলো ঠিকই, তবে মিটমিটে। গাড়ির আলো বলে মনে হল না। মোটর বাইকের আলো হলে আরও জোর হওয়া উচিত ছিল।

আলোটা সামান্য লাফাচ্ছে। এদিকেই এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। রাস্তা ধরেই আসছে বোধহয়।

"ডালিম, আলোটা এদিকেই আসছে।"

॥ চার ॥

অনেকটা সময় গেল। আমার শীত ধরে গিয়েছিল। গাড়ির মধ্যে এসে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলোটা ততক্ষণে গাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছে।

সাইকেল থেকে একটা লোক নেমে দাঁড়াল। ছোট মতন একটা লণ্ঠন তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মাঝামাঝি জায়গায় বাঁধা রয়েছে। লোকটার মুখ প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। মাথা কান কপাল জড়িয়ে

গামছা আর মাফলার বাঁধা। বোধহয় একটাতে কুলোয়নি বলে আগে গামছা পরে মাফলার জড়িয়েছে। মুখে খানিক দাড়ি। গায়ে জামার ওপর চাদর জড়ানো। ভুটকম্বলও হতে পারে।

আমি এগিয়ে ওর সামনে যেতেই লোকটা তার সাইকেল গায়ের কাছে টেনে নিয়ে শক্ত হাতে ধরল।

"এই যে ভাই—শোনো, আমরা বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে রাস্তায়।"

লোকটা আমায় দেখছিল। "কুথা থেকে আসছেন বটেক?"

"ফুলকুঠিয়া।"

"যাবেন কুথায়?"

"অনেক দূর গো। জামবাটি।"

"জামবাটি।...সে তো পাঁচ-ছ ক্রোশ দূর, সাহেব!"

"অনেক দূর। কাছাকাছি কোথাও থাকার জায়গা পাব হে? সকালে না-হয় মিস্ত্রি যোগাড় করা যাবে।"

"গাড়িতে কে আছেন।"

"মেমসাহেব। আমরা ফুলকুঠিয়া থেকে ফিরছিলাম।"

লোকটা যেন কিছু ভাবল। তারপর বলল, "উই যে উধারে—তফাতে ঝোপ দেখছেন—পলাশ ঝোপ। ঝোপের পাড়ে মণ্ডলবাবার বাসা। উখানে যান ক্যানে—। রাতটুকু নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।"

"মণ্ডলবাবা কে?"

"খোঁড়া পাদরী। মণ্ডলবাবার বাসায় গায়ে কুঠোঃপাড়া।"

লোকটা যেন আর দাঁড়াতে চাইছিল না। সাইকেলে ঝুলোনো লণ্ঠনটার আলো বাড়াবার চেষ্টা করল।

"তোমার নাম কী?"

"লিশিথ।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি আজ্ঞা—" বলে লোকটা একটু হাসল, যেন কী বলবে

ভাবল, তারপর বলল, "আজ্ঞা, আমি নুনিয়া পারে যাচ্ছি। মাইলটাক পথ। রাতের বেলায় যাওয়া কঠিন গো। পরিবারের বাপকে সাপে কামড়েছে।"

"সাপ? এসময়?"

"শেষ বেলার সাপ বিষহরিকেও ডরায় না। নিদ্রা যাবার আগে ফণী বিষে জরজর থাকে। ধরণীর ভিতরে বিষ রাখা যায় না গো, উপরে ফেলে দিয়ে যেতে হয়—শাস্ত্রে বলেছে।...আমি যাই, সাহেব।"

"তুমি কি ওঝা?"

"না আজ্ঞা। আমি ছুঁচ দিই।"...বলে লোকটা পকেট দেখাল। আর দাঁড়াবে না সে।

সাইকেল নিয়ে চলে যাবার সময় একটু দাঁড়িয়ে গাড়ির মধ্যে উঁকি মারল নিশীথ। দেখল ডালিমকে।

সাইকেল দু পা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নিশীথ বলল, "মাঠে থাকবেন না সাহেব, ই সময় দু'চারটে শয়তানের বাচ্চা ঘোরাফেরা করে। গাড়িতে থাকুন। হেমন্তের সাপ বড় ভয়ংকর...।"

লোকটা চলে গেল সাইকেলে চেপে।

আমার যেন কেমন এক ভয় এল। পায়ের তলায় সাপ রয়েছে নাকি? গাড়িতে এসে বসলাম।

ডালিম চুপ করে বসেছিল গাড়িতে।

"লোকটা কী বলল—ভাল বুঝলাম না। বলল, সাপের ইনজেকশান দেয় ও। বোধহয় কোনো কোলিয়ারি হাসপাতালের কিছু হবে। ওর শ্বশুরকে ইনজেকশান দিতে যাচ্ছে। সাপে কামড়েছে শ্বশুরকে।"

"সাপ?"

"এসময় সাপ বেরুবার কথা নয়। তবু এসব জংলা, ফাটাফুটো মাঠে এখনও বেরোয়। নিশীথ বলল, এখনকার সাপ বড় বিষাক্ত। হেমন্তর সাপ।"

"নিশীথ?"

"লোকটার নাম।···নামও নিশীথ, ঘুরে বেড়ায়ও নিশিকালে।" আমি যেন একটু হালকা গলায় বললাম।

ডালিম কোনো জবাব দিল না। জানলার দিকে মুখ করে বসে থাকল। ওর দিকের কাচ তোলা ছিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমি বললাম, "নিশীথ বলল, ওই দিকে একটা পলাশ ঝোপ আছে। ঝোপের ওপারে এক খোঁড়া পাদরি থাকে। মণ্ডলবাবা। তার বাড়ির গায়ে কুঠো পাড়া। মানে দু'চার ঘর কুষ্ঠ রোগী থাকে বোধহয়। কুষ্ঠ হাসপাতালও হতে পারে। ছোট হাসপাতাল। কী জানি।"

ডালিম গায়ের চাদরে গলা ঢেকে নিল। "তুমি বুঝি ভাবছ— ওখানে গেলে রাতটা নির্ভয়ে কেটে যাবে?"

"কী জানি! হয়ত যেত!···কিন্তু কেমন করে যাব? কতটা রাস্তা জানি না। মাঠ ভেঙে যাওয়া কী সহজ? কোথায় সাপ আছে কে জানে। চোখে তো কিছুই ভাল করে দেখা যায় না।"

ডালিম কোনো কথা বলল না। আমিও চুপ করে থাকলাম। ঝোপের গা থেকে জোনাকির দল যেন ফোয়ারার মতন ছিটকে উঠে মাঠের বাতাসে উড়তে লাগল। নাচতে নাচতে আমাদের গাড়ির সামনের কাচে এল, ডালিমের জানলার গায়ে পাক খেতে লাগল।

আমার দিকের জানলার কাচটা আমি ধীরে ধীরে তুলে দিচ্ছিলাম। দিতে দিতে দেখছিলাম, "জ্যাৎস্নার সব আলো কুয়াশার গায়ে মাখা-মাখি হয়ে আছে। যেন নরম নিঃশব্দ বৃষ্টির মতন কুয়াশা সমস্ত কিছুকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঠের পর মাঠ ফাঁকা নিঃসাড়। সেই অদ্ভুত গন্ধ, মাঠের, গাছলার, কুয়াশার।

হঠাৎ ডালিম বলল, "তুমি কী ভাবছ?···"

"কই! কিছু নয়।"

"তুমি ভাবছ, পাদরিবাবার কাছে গেলে বাঁচা যেত।"

"হয়ত।"

"তাহলে চলো ?"

"না। সাপ আছে।"

"কোথায় ?"

"মাঠে।...সাপে আমার ভীষণ ভয়।"

"লোকটা তোমায় ভয় দেখিয়ে গেল।"

"ভয়...না, ভয় ধরায়নি। সাবধান করে দিল।...বোধহয়, ঠিকই বলেছে ও। মাটির তলায় যাবার আগে সব বিষ ওরা বাইরে ফেলে যায়।..."

"ও কিছু জানে না। ডালিম আমার হাত ধরল নরম করে, ধরে থাকল, ধরে থাকল, তারপর কখন হাতটা টেনে তার মুখের কাছে নিয়ে গেল, চেপে ধরল আঙুলগুলো। ডালিমের মুখের মাংসগুলো কাঁপছিল। ওর গাল যেন ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে।

"গগন ?"

"বলো ?"

"ভয় পাচ্ছ ?"

"তুমি পাচ্ছ না ?"

"তোমায় ভয় পেতে হবে না। আমি মানুষ, সাপ নই।"

ডালিমের হাত আরও শক্ত হল। তারপর আলগা হতে লাগল। হাত ছেড়ে দিল ও।

আমি কতক্ষণ যেন চুপ করে বসে থাকলাম। খেয়াল হল আচমকা।

ডালিমের হাত আমার কোলের ওপর পড়েছিল। আস্তে করে উঠিয়ে নিলাম। গাড়ির কাচে একরাশ জোনাকি।

"ডালিম ? লোকটার নাম নিশীথ। দিবা হলেও হতে পারত। এইদিন, এই রাত্রি, এই যে ষড় ঋতু—এদের কাছ থেকে তুমি আমি আমরা যে কিছুই লুকোতে পারি না।"

ডালিমের হাতখানা কখন আমার কপাল ছুঁয়েছে বুঝতে পারিনি। পরে অনুভব করলাম, তার হাত ক্রমশই উষ্ণ হয়ে উঠছে।

সিঁড়ি দিয়ে যেন একটা লাল রঙের ঝড় বয়ে গেল। কী তাড়াতাড়ি নামে মেয়েটা। সিল্কের শাড়ি পরেছে, যদি একবার পায়ে আটকে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়, সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। এক একজনের স্বভাবেই থাকে এরকম চঞ্চলা গতি। নিষেধ করে কোন লাভ নেই। দোতলার ঘরের দরজা থেকে সরে এসে নীতীশ দাঁড়ালেন রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়েই শিখা এত জোর হাঁটতে লাগলো, যেন দৌড়োচ্ছে। ঘড়ি দেখলো দু'বার। ঠিক যেন ট্রেন ধরার তাড়া। অথচ সে রকম তো কোনো কথা নেই।

কোথায় যাচ্ছে শিখা। কখন ফিরবে? নীতীশ আশা করেছিলেন, বেরিয়ে যাবার আগে শিখা তাঁকে কিছু বলে যাবে। অবশ্য, সেরকম বাধ্যবাধকতা কিছু নেই।

নিস্তব্ধতায় ঝিমঝিম করছে বাড়িটা। এ বাড়ি সকাল দশটার আগে এক রকম, বিকেল ছটার পরে আরেক রকম, মাঝখানের সময়টা এক-একদিন নীতীশের অসহ্য লাগে। সময় জিনিসটা কখনো কখনো দারুণ ভারী হয়ে মাথার ওপর চেপে যায়। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করতে চাইলেও গায়ে আঠার মতন লেগে থাকে। আয়ুর প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান, তবু ঘুমিয়ে কাটাবার মতন, বেশ কিছু মুহূর্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে কোনো কোনো দুপুরে।

শিখা অমন ভাবে বেরিয়ে গেল, সে কি কিছু বুঝতে পেরেছে?

প্রীতীশ আর যমুনা দু'জনেই চাকরি করে, ওরা আলাদা আলাদা যায়, যমুনার জন্য অফিসের গাড়ি আসে, প্রীতীশ তার স্কুটারে মুম্মুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়। তারপর থেকেই বাড়িটায় আর প্রাণ থাকে

না। দীনবন্ধু রান্নাঘরে খুটখাট করে বটে কিন্তু সে কথা বলে খুব কম। তার কোনো সুখ দুঃখের গল্প নেই। এক এক সময় মনে হয় দীনবন্ধু মানুষ নয়, একটা যন্ত্র।

শোওয়ার ঘরে নিভার বাঁধানো ছবির দিকে তাকালেন একবার নীতীশ। যদিও আটত্রিশ বছরের জীবনসঙ্গিনী ছিল নিভা, তবু এই ফটোগ্রাফটা দেখলে নীতীশের মনে কোনো আবেগ জাগে না। কোনো শিল্পীকে দিয়ে নিভার একটা পোট্রেট করাবার কথা নীতীশের আগে মনে আসেনি। ক'টা বাঙালী পরিবারেই বা বউদের পোট্রেট আঁকানো হয়? তা ছাড়া স্বামীর চেয়ে স্ত্রীরা বেশীদিন বাঁচবে এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

এই ফটোগ্রাফ থেকে এখনো পোট্রেট আঁকানো যায়, কিন্তু সেটা খানিকটা আদিখ্যেতার মতন দেখাবে না? মৃত মানুষদের ছবি কিংবা ফটোগ্রাফ ঝুলিয়ে রাখাটাই নীতীশের পছন্দ নয়। একটা ছোট নেগেটিভ থেকে এনলার্জ প্রিন্ট করে প্রীতীশই বাঁধিয়ে এনেছে। নিজের মাতৃস্মৃতিতে, না বাবার সেণ্টিমেণ্টের কথা ভেবে, তা কে জানে!

নিভা সম্পর্কে বেশ একটা রাগ রাগ ভাবই আছে নীতীশের মনে। এমন হঠাৎ তার মরে যাওয়াটা অন্যায় নয়? স্বার্থপরতা। বিবাহিত জীবনের একটা সময়ে, মাঝখানের প্রায় দশটা বছর, স্ত্রীকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না নীতীশের, শারীরিক ভাবেও নয়, মানসিক সাহচর্যের জন্যও নয়, নিভা তখন ছিল নিছক তাঁর সন্তানের জননী, ব্যস্ত গৃহিণী, আর নীতীশ মত্ত ছিলেন চাকরির উন্নতিতে, আরও বেশী টাকা পয়সা রোজগারের নেশায়। এখন, এই বিশ্রামের সময়, দীর্ঘ অবসরেই নিভার উপস্থিতির সার্থকতা ছিল, নিভাকে তিনি আলাদা ভাবে ভোগ-বাসনা-তৃপ্তির স্বাদ দিতে পারতেন, এই সুযোগটাই নিভা দিল না। ইডিয়েট! নিতান্ত ইডিয়েট না হলে অত হাই ব্লাড-শুগারের কথা জেনেও কেউ গোপন করে যায়?

পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে নীতীশ বেরুবার জন্য তৈরি হলেন। হাজরা মোড়ের দোকানটা থেকে চুরুট কিনবেন। দীনবন্ধুকে পাঠানো যেত, কিন্তু নীতীশের বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না। অরুণের বাড়িতেও যাওয়া যেতে পারে। সাড়ে তিনটের সময় মুম্মু স্কুল থেকে ফিরবে, তার আগে তো বাড়িতে কথা বলার কেউ নেই। মুম্মু স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম প্রথম কয়েকদিন নীতীশ তাকে ছুটির সময় নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি অনুভব করলেন, এক গাদা বাচ্চার সামনে দাদু সেজে থাকতে তাঁর ভালো লাগে না। এমন কিছু বুড়ো তিনি নন। নাতিকে নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকার মানসিকতা তাঁর নেই। এখন দীনবন্ধুই মুম্মুকে আনতে যায়।

শিখা যদি দুপুরে ফিরে আসে হঠাৎ? সে তো খেয়ে যায়নি, বাড়িতে এসে খাবে কি না তাও বলেনি। নীতীশকে বলেনি, হয়তো দীনবন্ধুকে কিছু জানিয়ে গেছে। তবু যদি দুপুরে শিখা বাড়িতে আসে, সে সময়ে তিনি বাইরে থাকতে চান না। অরুণের বাড়ি গেলেন না, চুরুট কিনেই ফিরে এলেন ব্যস্ত ভাবে।

শিখা! একটি প্রাণ-চাঞ্চল্য, একটি ঝলমলে যৌবন, একটি জীবন্ত সুন্দর, রক্ত-মাংসের মাধুর্য। শিখাকে নিয়ে বেশ বিপদে পড়ে গেছেন নীতীশ।

রিটায়ারমেণ্টের পর তিনটে ফার্ম থেকে ডাক এসেছিল তাঁর। পার্ট-টাইম কনসালটেন্সি, বেশ ভদ্রগোছের টাকা, একটা ফার্ম থেকে গাড়িও দেবে বলেছিল। আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই বুঝিয়েছিল, একটা নিয়ে নাও নীতীশ, শুধু টাকার জন্য নয়, কোনো একটা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা, কিছু দায়িত্ববোধ, নইলে শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকলে সময় কাটবে না, রিটায়ার করার পর বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকলেই লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নীতীশ তবু রাজি হননি। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবেন কেন? অনেক বই পড়া বাকি আছে, ট্রেনে ট্রেনে কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ঘোরার শখ অনেক দিনের,

বোম্বাই মাদ্রাজ-দিল্লীর ক্রিকেট টেস্টগুলো দেখতে যাবেন, আরও কত কী পরিকল্পনা আছে।

ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই নিজেরা পছন্দ মতন বিয়ে করেছে, নীতীশের টাকা পয়সা বিশেষ খরচ হয়নি। মেয়ে জামাই আছে কানপুরে, বেশ ভালোই আছে। নীতীশের নিজস্ব টাকাপয়সা রয়েছে যথেষ্ট, কোনদিনই তাঁকে ছেলের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। ছেলে তাঁর বাড়িতে থাকে, তিনি ছেলের কাছে থাকেন না। হ্যাঁ, নীতীশ এইভাবেই দেখেন ব্যাপারটা। ছেলেমেয়ে সম্পর্কেও তাঁর মায়ার বন্ধন কিছুটা আলগা। এরা যতটা নিভার ছেলেমেয়ে, ততটা যেন তাঁর নয়!

মাসে মাসে বেড়াতে যান তিনি, বই পড়েও আনন্দ পান। বইয়ের মধ্যে বেশীর ভাগই দেশ বিদেশের নানা ধরনের মানুষের আত্মজীবনী, তার জানতে ইচ্ছে করে মানুষ জীবন নিয়ে কতরকম পরীক্ষা করছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নিয়তি, এই দোলাচলের মধ্যে কোন্ দিকে বেশি ঝুঁকেছে মানুষ। কাকে বলে সুখ আর কাকে বলে সার্থকতা। যাঁরা দেশ ও দশের উন্নতির জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন, তাঁরা কতখানি আদর্শবাদী আর কতটা ক্ষমতালিপ্সু। নতুন একটা শখ হয়েছে, লোকাল ট্রেনে চেপে চলে যান কোনো অখ্যাত স্টেশনে। ছোটোখাটো চায়ের দোকানে বসে অচেনা লোকদের আলোচনা শোনা, কোনো গ্রামের হাটে গিয়ে টাটকা শাক-সব্জি কেনা, প্রায় অকারণেই, তবু ভালো লাগে। মল্লিকপুরে একটা অনাথ আশ্রমের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন কিছুটা, তবে বেশ সাবধান, বেশি দায়িত্ব নিতে চান না তিনি, কেউ যেন তাঁর ওপর নির্ভর না করে, কিছুটা টাকা সাহায্য করেন বটে, তাও হিসেব করে, টিপে টিপে। এবং একথা তিনি অন্য কারুকে জানাননি!

সময় বেশ ভালোই কাটছিল, এমন সময় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল শিখার জন্য। এখন শিখা কতক্ষণ বাড়িতে থাকবে আর থাকবে না,

এইভাবে তার সময়টা ভাগ করা। শিখা না থাকলে তাঁর সব কিছুই অর্থহীন লাগে।

অফিসের কাজে একবার এলাহাবাদ গিয়েছিল প্রীতীশ, ফিরে এসে বললো, বাবা, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি। বুড়োটে বাবাদের মতন কোনো রকম আপত্তি তোলেননি নীতীশ, মেয়ের বংশপরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাননি, স্ট্যাটিসটিক্স পড়া তাঁর ছেলে নিজে যখন পছন্দ করেছে, সেই-তো যথেষ্ট। বিবাহিত জীবনটা তো তার নিজস্ব, বাবা-মায়ের সেখানে নাক গলাবার দরকার কী? নিভা তখনও বেঁচে, সে একবার এলাহাবাদে গিয়ে খোঁজখবর নিতে চেয়েছিল, নীতীশ এক ধমক দিয়েছেন।

যমুনা মেয়েটি বেশ ভালোই। এ বাড়িতে এসে সে চট করে মানিয়ে নিয়েছে। নিভা যতদিন বেঁচে ছিল, পুত্রবধূ ছিল তার চোখের মণি। নীতীশ অবশ্য ভেবে রেখেছিলেন, এই ভাব বেশিদিন থাকবে না, শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়াটা কেমন হয় সেটা তিনি উপভোগ করবেন। কিন্তু সে সুযোগও পাওয়া গেল না।

যমুনার একটি মাত্র ব্যাপার ঘোরতর অপছন্দ করেন নীতীশ। যমুনা সন্তোষী মায়ের ব্রত করে। শুক্কুরবারদিন সে নিরামিষ খায়, দুপুরবেলা শুধু ছোলা-গুড় ফল-টল খেয়ে অফিস যায়, কোনোরকম টক জিনিস সেদিন সে খাবে না, এমনকি টক দিয়ে ছানা কাটানো হয় বলে সে কোনো রকম ছানার মিষ্টিও খায় না। কবে যেন গরুর পায়ে কী সব উৎসর্গ-টুৎসর্গ করতে হয়। সব ব্যাপারটাই নীতীশের অদ্ভুত লাগে।

যমুনা কেমিস্ট্রিতে এম এস-সি, বিয়ের দু বছর পরেই সে একটা ওষুধ কোম্পানিতে ভালো চাকরি পেয়েছে। ব্যবহারে, পোশাকে সে বেশ আধুনিক। নীতীশ জানেন, তাঁর ছেলে এবং ছেলের বউ, দুজনেই মদ খায়। আজকালকার এটাই রীতি। বাইরের পার্টি থেকে ওরা তো মদ খেয়ে আসেই, বাড়িতেও বন্ধুবান্ধবদের ডেকে

সন্ধের পর মাঝে মাঝেই ওরা মদের বোতল খোলে। তখন ঘরে দরজা ভেজিয়ে দেয়। সামান্য চক্ষুলজ্জার আড়াল। মদের গন্ধ যে লুকোনো যায় না, তা কি ওরা জানে না? বাবা যে ঠিকই টের পেয়ে যাবেন, তাও ওরা জানে, তবু দরজাটা ভেজিয়ে বাবাকে একটু সম্মান দেখানো।

ওদের মদ খাওয়ার ব্যাপারে নীতীশের কোনো আপত্তি নেই। খাচ্ছে খাক, তার পর যা হয় ওরা বুঝবে। ওদের জীবন। ছেলের বয়েস পঁয়তিরিশ বছর, তাকে শাসন করতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যমুনাও বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওরা নিজেদের ভালো-মন্দ যদি নিজেরাই না বোঝে, তা হলে অন্য কেউ কি বোঝাতে পারবে!

চাকরি জীবনে নীতীশ বেশ কয়েকবার মদ্যপান করেছেন। এখনও বাল্যবন্ধু অরুণের বাড়িতে গেলে দু এক পাত্র চলে মাঝে মাঝে। তাঁর নেশা নেই, আবার শুচিবাইও নেই।

যমুনাকে সিগারেটও খেতে দেখেছেন তিনি দু একদিন। স্বামীর হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে সে দু এক টান দেয়। একদিন দশ-বারোজন বন্ধু-বান্ধবী এসেছিল ওদের। বেশ খানিকটা পানীয় শেষ করার পর সবাই মিলে নাচতে শুরু করেছিল, দরজাটা খুলে গিয়েছিল হঠাৎ, নীতীশ তখন বাথরুমে যাচ্ছিলেন, এক পলক দেখলেন, তাঁর পুত্রবধূর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট তার চক্ষু ঢুলু ঢুলু। সে নাচছে তার স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে।

মেয়েরা সিগারেট খাবে না কেন? ছেলেরা খেতে পারে, মেয়েদের বেলায় আপত্তি কিসের! আজকাল শোনা যাচ্ছে সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ, তা সে ছেলেদের পক্ষেও খারাপ, মেয়েদের পক্ষেও খারাপ। সে ওরা বুঝবে! নীতীশ এতটাই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী যে, যমুনার সিগারেট টানা বিষয়ে তাঁর মনে কোনো বিরাগ ভাব পোষণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নিজে এখন

সিগারেট ছেড়ে চুরুট ধরেছেন। কিন্তু তাঁর বিয়ের পর প্রথম প্রথম তিনি নিভাকে দু তিনবার জোর করে সিগারেট খাইয়েছিলেন। নিভা সিগারেট টানতেই পারতো না, কাসতো খুব।

নীতীশ এটাই মেলাতে পারেন না যে, যে মেয়ে মদ খায়, সিগারেট টানে, নাচে, অফিসে মন দিয়ে কাজ করে, সে কী করে আবার সন্তোষী মা নামে এক অদ্ভুত ঠাকুরকে ভক্তি করে। এই সন্তোষী মা-টা যে কে, তা-ও ভালো করে জানেন না নীতীশ। ইনি আনন্দময়ী মায়ের মতন কোনো রক্তমাংসের গুরু-ঠাকুরানী নন, তা তিনি শুনেছেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ তিনি যতটা পড়েছেন, তাতে কোথাও তিনি এই নাম পাননি। তিনি তাঁর প্রাণের বন্ধু অরুণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অরুণও ভালো জানেন না, তিনি বলেছিলেন, ও তো একটা সিনেমার ঠাকুর হে! ঐ এক কাল্পনিক দেবীর নামে একটা সিনেমা খুব হিট করেছিল, তারপর থেকেই অনেকে ওঁর পুজো করে, একটা কিছু হিট করাবার জন্য!

কথাটা নীতীশের বিশ্বাস হয়নি। তবে একজন ঠাকুরের নামে টক খাওয়া বারণ? লেবু দিয়ে ছানা কাটা হয় বলে রসগোল্লা খাওয়া চলবে না, এরকম কোনো ঠাকুরের নির্দেশ থাকতে পারে? লেবুর ওপরে রাগ? এম এস-সি পড়া মেয়ে ভিটামিন সি-র গুণ জানে না?

যমুনার বাবা ক্যানসারে ভুগছেন অনেকদিন। তাঁর আরোগ্য মানত করেই নাকি যমুনা এই সন্তোষী মায়ের ব্রত করে। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলেই নীতীশ পুত্রবধুকে নিষেধ করতেন না, তার ওপর বাবার অসুখের মতন সেণ্টিমেণ্টাল ব্যাপার জড়িত বলে টু শব্দও করেন না। ক্যানসার রোগ যে কোনো ক্যালেণ্ডার বা সিনেমার ঠাকুর দেবতার প্রভাবে সারা সম্ভব নয়, তা যমুনা বোঝে না? এই যুক্তিহীন বশ্যতাই নীতীশের অসহ্য লাগে।

যমুনার বাবা অতি শান্ত, ধীরস্থির মানুষ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এসব জানেনও না, মানেনও না। নীতীশের গোপনে গোপনে রাগ হয় তাঁর নিজের ছেলের ওপর। হতভাগা স্ট্যাটিসটিক্স পড়েছিস, শিখেছিস, নিজের বউকে এই সামান্য ব্যাপারটা বোঝাতে পারিস না ?

যমুনা গত সপ্তাহে একদিন এসে বলেছিল, বাবা, বেনারসে আমার এক মাসতুতো বোন থাকে, আমার থেকে বয়েসে তিন-চার বছরের ছোট, ইংলিশে পি এইচ ডি করছে, সে ক'দিন কলকাতায় আমাদের এখানে এসে থাকবে বলেছে। তাকে আসতে লিখবো ? আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো ?

নীতীশ মনে মনে হেসেছিলেন। প্রীতীশ আর যমুনা দুজনেই জানে যে তিনি চোখ বুজলেই এ বাড়ি তাদের হয়ে যাবে। এ বাড়িতে সাতখানা ঘর, তার মধ্যে দুটো গেস্ট-রুম, যমুনার কোনো বোন এখানে এসে থাকতে চাইলে অসুবিধে হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু যমুনা অনুমতি চাইতে এসেছে তাঁকে খুশি করার জন্য। এ ধরনের দেখানেপনা নীতীশের ঠিক পছন্দ নয়। কেমন যেন পুরনো পুরনো গন্ধ। যেন ভক্তিময়ী শ্বশুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, লাল পাড় শাড়ি পরে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে কোনো কিছু প্রার্থনা করছে ! কিন্তু যে মেয়ে মদ খায়, সিগারেট খায়, কোনোদিন মাথায় ঘোমটা দেয় না, তার আবার এসব ন্যাকামি কেন ? কিংবা এই সবগুলোই ঐ সন্তোষী মায়ের প্রভাব।

যমুনার সঙ্গে তার বেনারসের মাসতুতো বোন শিখা যেদিন নীতীশকে প্রণাম করতে এলো, তিনি চমকে উঠলেন, ছিপছিপে লম্বা শরীর, ধারালো মুখ, চোখ দুটিতে সরল বিস্ময়ের ভাব, চিবুকের ডৌলে যেন লাবণ্য ঝরে পড়ছে। শুধু সুন্দরী নয়, শিখার চেহারায় যেন আরও রহস্যময় কিছু আছে, অনেক অদৃশ্য কোণ, যা যখন তখন উদ্ভাসিত হয়ে পড়বে। যেন তার শরীরে অনেকগুলি গোপন চুম্বক। নীতীশ মন্ত্রমুগ্ধের মতন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন শিখার দিকে।

কেমন আছেন মেসোমশাই, বলে প্রণাম করেছিল শিখা।

এই ডাকটা নীতীশের একেবারেই পছন্দ হয়নি। মাসীই নেই, তা হলে তিনি মেসোমশাই কী করে হন! নীতীশদা বলাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল; তিনি খুশি হতেন। কিন্তু কোনো মেয়ে তার দিদির শ্বশুরকে নাম ধরে দাদা বলে ডাকছে, এরকম রেওয়াজ নেই। রেওয়াজ নেই তো কী হয়েছে! একালের ছেলেমেয়েরা এত আধুনিক, শুরু করে দিলেই পারে!

প্রথম তিনদিন শিখা প্রায় সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকতো। যমুনা আর প্রীতীশকে তো অফিসে যেতে হবেই, কলকাতার রাস্তাঘাট ভালো চেনে না বলে শিখা একা বেরুতে চাইতো না দুপুরে। নীতীশ আর শিখা একটু বেলা করে খেতে বসতো, খাওয়ার টেবিলে গল্প হতো অনেকক্ষণ। এঁটো হাত শুকিয়ে খরখরে। বেনারসেই পড়াশুনো করেছে শিখা কিন্তু তার বাংলা উচ্চারণে কোনো টান নেই। শিখাদের আগেকার বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরে, বেশ বনেদী বংশ। কথা বলার সময় শিখার চোখে ও ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে থাকে কিন্তু খুব একটা হালকা কথা সে বলে না। কোনো একজন লোকের প্রসঙ্গ উঠলেই সে দু-একটা আঁচড়ে এমনভাবে তার বর্ণনা দেয় যে বোঝা যায়, সে মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে খুঁটিয়ে।

শিখা নিজের রূপ সম্পর্কে যেন একেবারে উদাসীন। কেউ সামনাসামনি তার প্রশংসা করলে সে কথাটা এমনভাবে উড়িয়ে দেয় যেন চেহারা-টেহারার ব্যাপার একেবারে আলোচনার যোগ্যই নয়!

খাওয়ার পরে শিখা চলে যেত নিজের ঘরে। তিনতলার দক্ষিণ খোলা ঘরটি দেওয়া হয়েছে তাকে। শিখা কিন্তু দুপুরে ঘুমোয় না, তার ঘরে রেডিও বাজে, কখনো তার গুন গুন গান শোনা যায়, কখনো তার চপল পায়ের ছন্দ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে নামে।

নীতীশেরও দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই। একখানা বই খুলে বসলেও অন্যমনস্ক হয়ে যান। এই বাড়িতে একটি সুন্দর প্রাণ ঘুরে-

ফিরে বেড়াচ্ছে, এই অনুভবের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। এই বাড়ির দেওয়ালগুলিতেও যেন ঝঙ্কৃত হচ্ছে খুশির তরঙ্গ।

শিখা যখন জেগেই থাকে, তখন নীতীশের আলাদা একটা ঘরে বসে থাকার কী মানে হয়? শিখার ঘরে গিয়ে গল্প করলেই তো সময়টা সুন্দর কাটে। কিন্তু নীতীশের বাধো বাধো লাগতো। অল্প বয়েসী মেয়ে, কত বয়েস হবে শিখার, চব্বিশ-পঁচিশ! নীতীশের এখন চৌষট্টি, সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যবধান। ওঃ, এত! দিদির শ্বশুরের সঙ্গে সর্বক্ষণ গল্প করতে শিখার ভালো লাগবে কেন?

প্রথমদিন নীতীশ শিখার ঘরে গিয়েছিলেন একটা মিথ্যে ছুতো করে। নিজেরই বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে চোরের মতন পা টিপে টিপে উঠে এসেছিলেন ওপরে, শিখার ঘরের দরজা খোলা, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিখা, বেশ লম্বা সে কিন্তু ঢ্যাঙা মনে হয় না, পাতলা গড়ণ অথচ হাড়ের অস্তিত্ব বোঝা যায় না, লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা, গালের একটা দিকে রোদ পড়েছে।

দরজার বাইরে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে নীতীশ বলেছিলেন, শিখা, একটু আসবো? এই ঘরে আমার এলাচের কৌটোটা রয়েছে, একটু নেবো।

শিখার ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। সে বলেছিল, হ্যাঁ মেসোমশাই, আসুন না!

সত্যিই একটা এলাচের কৌটো রাখা ছিল আলমারিতে। নীতীশের এলাচ খাওয়ার বাতিক, ছোট এলাচ নয়, শুধু বড় এলাচ। তাঁর জামাই তাঁকে লণ্ডন থেকে দু পাউণ্ড খাঁটি এলাচ এনে দিয়েছে। নীতীশের পাঞ্জাবির পকেটেই দু-চারটে ছিল। কৌটোটা নেবার পর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি একটা খাবে নাকি?

শিখা বলেছিল, দিন। এইরকম বড় এলাচ অনেকদিন খাইনি।

এরপর নীতীশের চলে আসাই স্বাভাবিক ছিল, তিনি পেছন

ফিরেছিলেনও, শিখাই কথা বাড়ালো, সে জিজ্ঞাসা করলো, মেসো-মশাই, এ ঘরে একটা টি, এস, এলিয়টের কবিতার বই দেখছি, এ বই কে পড়ে ?

প্রীতীশ বা যমুনা কেউই কবিতা পড়ে না, এ বইটা কিনেছিল নীতীশের মেয়ে পূবালি। বইটা সে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যায়নি। এখন প্রচুর অবসরে এবং বই পড়ার নেশায় নীতীশ ঐ কবিতার বইটাই দু-একবার নেড়েচেড়ে দেখেছেন।

পেশায় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন বটে, কিন্তু নীতীশ সাহিত্য-টাহিত্যের ব্যাপারে একেবারে অশিক্ষিত নন। বাংলা ও ইংরেজি উপন্যাস পড়েছেন অনেক। রেল স্টেশনে কেনা বই আর প্রকৃত ভালো বইয়ের তফাত তিনি জানেন। তবে, শিখা এডগার অ্যালান পো নামের লেখককে নিয়ে পি এইচ ডি করছে শুনে তিনি বেশ অবাক হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, এডগার অ্যালান পো কিছু গা ছমছমে গল্প লিখেছেন শুধু, তিনি যে প্রচুর কবিতাও লিখেছেন, সে সম্পর্কে নীতীশের কোনো ধারণাই ছিল না। এমনকি এই আমেরিকান কবির কবিতা নাকি ফরাসী সাহিত্যের আধুনিক কবিতার আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল।

শিখার প্রশ্ন শুনে নীতীশ বলেছিলেন, আমিই পড়ি মাঝে মাঝে। কবিতা তেমন ভালো বুঝি না অবশ্য।

শিখা বলেছিল, টি এস এলিয়টের কবিতার সঙ্গেও অ্যালান পো-র কবিতার কিছু কিছু মিল আছে। এই যে, দা লাভ সং অফ জে আলফ্রেড প্রুফক নামে কবিতার দুটো স্ট্যাঞ্জার সঙ্গে অ্যালান পো-র একটা কবিতার কী রকম মিল শুনবেন ?

গড়গড় করে শিখা একটা ইংরিজি কবিতা মুখস্থ বলে গেল।

নীতীশ জীবনে কখনো কোনো মেয়ের মুখ থেকে কবিতা শোনেননি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, এক অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে কত নতুন নতুন চমক যে কোথায় কখন অপেক্ষা করে থাকে, তা কিছুই

বলা যায় না। কবিতা পড়ার সময় শিখার মুখটা বদলে গিয়েছিল, ঠোঁটের ভঙ্গি অন্য রকম, সাধারণ কথা বলার চেয়ে একেবারে আলাদা, এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল সেই সময় শিখাকে।

দোতলায় মিনিট পনেরো বাদে ফোন বাজতেই নীতীশকে নেমে আসতে হয়েছিল। তারপর আবার ফিরে যাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দিন নীতীশ আর কোনো ছুতো খুঁজে পাননি। এমনি এমনি একটা যুবতী মেয়ের ঘরে দুপুরবেলা যাওয়াটা বিসদৃশ দেখায়। বয়েসের সুযোগ নিয়ে গায়ে-পড়া ভাব দেখাতে নীতীশ কিছুতেই পারবেন না। যেতে ইচ্ছে করছিল খুবই। একবার ওপরে উঠে শিখার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন শুধু। যদি শিখা নিজে থেকে ডাকে। নীতীশ ঢুকে পড়লে শিখা হয়তো কিছুই মনে করতো না, কিন্তু নিজের থেকেও ডাকলো না। না ডাকটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়, দিদির শ্বশুরের সঙ্গে কোন যুবতী মেয়ে ডেকে ডেকে গল্প করে?

সব বুঝেও একটা সাঙ্ঘাতিক টান অনুভব করেন নীতীশ। শিখার সামনে গিয়ে বসা, তার সঙ্গে কথা বলা, তার হাসির সময় মাথার দুলুনিটা দেখা, পৃথিবীতে এরচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় যেন আর কিছুই হতে পারে না। শিখা তিনতলায়, তিনি দোতলায়, এক ছুটে ওপরে উঠে যেতে লোভ হয়। হ্যাঁ লোভ, কিংবা দুর্দান্ত এক ক্ষুধা।

কেন এই যুক্তিহীন টান? এও কি যমুনার সন্তোষী মায়ের প্রতি যুক্তিহীন ভক্তির মতন? মানুষ যতই র‍্যাশনাল অ্যানিম্যাল বলে বড়াই করুক, তবু মানুষের মনের একটা অংশ যুক্তিহীন। যেমন যুক্তিহীন ভালোবাসা, কিংবা কবিতা?

নিজের মনকে চোখ ঠারতে চান না নীতীশ। তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছেন এই লোভ বা ক্ষুধার আসল স্বরূপ। এই লোভ, এই ক্ষুধা সম্পূর্ণ শারীরিক। শিখার রূপ, শিখার মাধুর্যকে তিনি তাঁর দু হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে পেতে চান।

মানুষের ক্ষুধাও বড় আশ্চর্যের। নীতীশের যখন পঁচিশ বছর বয়েস ছিল, তখন শরীরে নানা রকম আগুন জ্বলতো, তখন মনে হতো, যাদের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হয়ে গেছে তারা সব বাতিলের দলে। বাবা-জ্যাঠা শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আগুন কোথায়? তাদের পেটে নানা রকম খাবার সহ্য হয় না, শরীর নিয়ে দাপাদাপির খেলাও তাদের সহ্য হয় না! তারপর এক সময় নিজে চল্লিশ-বিয়াল্লিশে পৌঁছে নীতীশ দেখলেন, ওরে বাবা, আগুন তো নেবে না, আরও বেশি দাউ দাউ করে জ্বলে, অনেক কিছু জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

রিটায়ার করার তিন চার বছর আগে নীতীশকে বড় বেশি খাটতে হয়েছিল। কাজের নেশায় এত পাগল হয়েছিলেন যে অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় ছিল না। সেই সময়টায় নিভাও কেমন যেন হঠাৎ শরীর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিল, তার কোনো দাবী ছিল না, আগ্রহ ছিল না, ছেলেমেয়ের বিয়ে, তাদের আত্মীয়স্বজন, বাড়ি সাজানো, বাজার করা এইসব নিয়েই মত্ত হয়ে থাকতো। মাসের পর মাস এক বিছানায় শুয়েও প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। নীতীশ ভেবেছিলেন, তা হলে ঐ ব্যাপারটা এবারে চিরবিদায় নিল!

সেই সময়ে নীতীশের আলসারের মতন হয়েছিল, খিদে কম হতো, বাড়িতে ভাজাভুজি ও ঝাল খাওয়া এবং বাইরে চপ-কাটলেট খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্লাড সুগার না থাকলেও মিষ্টি খেতেন না, খেতে ইচ্ছেও করতো না।

হঠাৎ এই দু বছর আগে শরীরটা আবার সুস্থ হয়ে গেল। আলসার-ফালসার কিছু নেই, যে সব খাবার জীবন থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো খাওয়ার লোভ আবার ফিরে এলো। এই তো কিছুদিন আগে তিনি কালীঘাট পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে ঝাল আলু-কাবলি খেয়ে ফেললেন। লুকিয়ে। এখন জিবে ঝাল স্বাদটা বেশ ভালো লাগে। অনেকদিন রাবড়ি খাননি ভেবে একদিন একা একা খেয়ে ফেললেন আড়াইশো রাবড়ি। এক গ্রীষ্মের দুপুরে পার্ক স্ট্রীটে

গিয়ে দু বোতল বীয়ার খেলেন এবং তাতে যে আনন্দ পেলেন, প্রীতীশ ও যমুনাকে জানিয়ে বাড়িতে বীয়ার আনিয়ে খেলে সে তৃপ্তি হতো না।

মাঝে মাঝে দশটা ফণাওয়ালা এক সাপের মতন সম্ভোগ বাসনা শরীর থেকে লক লক করে বেরিয়ে আসতে চায়। রাস্তাঘাটে স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের দিকে তাকালে, আঠার মতন আটকে যায় চোখ। তা হলে ও ব্যাপারটা মরেনি? ঘুমন্ত ছিল, আবার জেগে উঠেছে! লিবিডো শুধু জাগেনি, এক এক সময় বুকের মধ্যে ঝড় তোলে। নীতীশের খুব ইচ্ছে করে, আবার কোনো নারীর সঙ্গে শুয়ে শরীরের খেলাটা খেলে দেখতে!

শিখা সম্পর্কে তিনি এই তীব্র বাসনা নিয়েই কল্পনার দাবি তৈরি করছিলেন, কিন্তু এরকম কথা শিখাকে ঘুণাক্ষরেও জানানো যাবে না। একটা সীমানা টানা আছে, সম্ভ্রমের একটা কঠিন বন্ধন আছে, তার বাইরে যাওয়া যাবে না কিছুতেই। ভাবনাটা কেউ আটকাতে পারে না, কিন্তু নিতান্ত দুশ্চরিত্র লম্পট ছাড়া কেউ কি তার পুত্রবধূর ছোটবোনের সঙ্গে আদিরসের সম্পর্ক পাতাতে পারে? শিখাই বা রাজি হবে কেন, সামান্য একটু ইঙ্গিত পেলেই সে এক মুহূর্তে নীতীশের মুখোশটা টেনে খুলে দেবে অন্যদের সামনে। তারপর তিনি আর যমুনার সামনে, তাঁর ছেলেমেয়ের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবেন?

শিখার কাঁধে হাত দেওয়া তাকে কোন অছিলায় জড়িয়ে ধরা কিংবা গোপন অঙ্গ ছুঁয়ে দেবার সামান্যতম চেষ্টাও করেননি নীতীশ। বরং শিখার শরীরের থেকে তিনি দূরে থেকেছেন। সংযমের নামই তো সভ্যতা। যার সঙ্গে যাকে মানায়। কোনো ভদ্র, রূপবান তরুণ যুবার সঙ্গে শিখার প্রণয় হতে দেখলে নীতীশ খুশিই হবেন।

সেই একদিন শিখার হাতে এলাচ দেবার সময় একটুখানি স্পর্শ লেগেছিল মাত্র, সেইটুকুই যেন নীতীশের পক্ষে যথেষ্ট।

নির্জন দুপুরে, ছেলে, ছেলের বউ, নাতিও বাড়িতে থাকে না,

রান্নার ঠাকুরটা তো একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র, তাকে যে-কোনো একটা কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। সে বাড়িতে থাকলেও কক্ষনো তিনতলায় উঠবে না। নীতীশের সারা শরীরে উত্তাপ, নিজের নাকে যেন সহস্র নাকের নিশ্বাস, তবু নীতীশ শিখার ঘরে ঢুকে সত্যি সত্যি তাকে ধরতে যাননি একবারও। ওসব কল্পনাতেই ভালো। দিদির শ্বশুরের ভূমিকা তাঁকে নির্ভুলভাবে পালন করতেই হবে।

শিখার সঙ্গে কথা বলার আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত হবার অবশ্য কোনো মানে হয় না। এটুকু তিনি বুঝেছেন, শিখা তাঁকে অপছন্দ করে না। খাওয়ার টেবিলে বা অন্যান্য সময়ে সে নিজের থেকেই অনেক কথা বলে। ক্রমশঃ সে নিজেকে খুলে দিচ্ছে, নিজের ছেলে-বেলার কথা, বাড়ির লোকজনদের কথা বলে বেশি করে। সে কথা শুধু শোনেন না নীতীশ, মদিরার মতন পান করেন।

চোখের একটা ভাষা আছে, নীতীশের চোখ দেখে কি শিখা কিছু সন্দেহ করেছে? মেয়েরা নাকি ঠিক টের পেয়ে যায়। একদিন দুপুরে শিখা তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল কেন? এখন শিখা একলা একলা বেরোয়, আজ বেলা এগারোটায় সে নীতীশকে কিছু না বলে অমন দ্রুত চলে গেল কি নীতীশকে এড়াবার জন্য?

সন্ধের পরেও শিখা ফিরলো না।

নীতীশ ছটফট করছেন, কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। প্রীতীশ আর যমুনার ঘরে দুজন বন্ধু এসেছে, ওরা তো জানে যে শিখা বাড়িতেই নেই, ওদের যদি উদ্বেগ না হয় নীতীশ ব্যস্ত হবেন কেন? নীতীশ কিছু বলতে গেলে ওরা ভাববে, বাবা বুড়ো হয়েছেন, বুড়ো মানুষদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি। নীতীশের ব্যাকুলতা যে অন্য কারণে, তা ওরা বুঝবে না, নীতীশ বোঝাতেও চান না।

টিভি খুলতে ইচ্ছে করলো না, বই পড়তে ইচ্ছে করলো না। নীতীশ সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন চুপ করে।

এক সময় সেবাপরায়ণা পুত্রবধুর ভূমিকা পালন করবার জন্য

যমুনা ওপরে এসে বললো, বাবা, আসুন আপনার খাবারটা দিয়ে দিই। আমাদের খেতে একটু দেরি হবে।

নীতীশ আপত্তি করলেন না। আবার খাবার টেবিলে বসার পর খুবই নিরাসক্ত ভঙ্গিতে, মাটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শিখার গলার আওয়াজ পাচ্ছি না, সে ফেরেনি ?

যমুনা বললো, ও শিখা আপনাকে বলে যায়নি বুঝি ? ও তো আজ ফিরবে না !

নীতীশ চমকে উঠে বললেন, ফিরবে না ? কোথায় থাকবে ?

যমুনা বললো, শিখা আমাকে অফিসে টেলিফোন করে জানিয়েছে। বিরজানন্দ মহারাজ আজ পৌঁছে গেছেন। ম্যাড্রাস থেকে ওঁর সোজা কলকাতায় আসার কথা ছিল, কিন্তু উনি ভুবনেশ্বরে কয়েকদিন থেকে এলেন, তাই এখানে আসতে দেরি হলো।

নীতীশ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি হতভম্বের মতন বললেন, বিরজানন্দ মহারাজ ? তিনি কে ?

যমুনা বললো, আপনি নাম শোনেননি ? বেনারসের খুব নাম করা যোগী। ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ওঁর সাতখানা আশ্রম। এখানে ফার্ন রোডে ওঁর এক ভক্তের মস্ত বড় বাড়ি। কলকাতায় এলে উনি এখানেই ওঠেন। আরও অনেক ভক্ত থাকবে, শিখাও আজ রাত্তিরে ওখানে থেকে যাবে।

নীতীশ একজন অবোধ মানুষের মতন চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, সেখানে রাত্তিরে থেকে যাবে ? কেন ?

যমুনা বলল, শিখা যে সেই ছোট্টবেলা থেকেই বিরজানন্দ মহারাজের শিষ্যা। দীক্ষা নিয়েছে। মহারাজ যেখানে যান, অনেক সময়ই শিখা সঙ্গে যায়। শিখাদের বাড়ির সবাই বিরজানন্দ মহারাজের ভক্ত। বিশেষ করে শিখা তো মহারাজকে ভগবানের মতন মনে করে। মহারাজও অনেক করেছেন শিখার জন্য।

যমুনা এমনভাবে কথা বলছে, যেন ইংরিজিতে এম এ পাশ,

এডগার অ্যালান পো-র মতন লেখককে নিয়ে গবেষণা করছে যে মেয়ে, তার পক্ষে কোনো এক বিরজানন্দ মহারাজের শিষ্যা হওয়া, সেই লোকটিকে ভগবান মনে করা, অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

শ্বশুরের হতচকিত বিহ্বল অবস্থা দেখে যমুনা খুব মধুরভাবে হেসে বললো, আমি শিখাকে বলে দিয়েছিলুম, আমার শ্বশুর ধর্ম-টর্ম কিছু মানেন না, তুই যেন ওঁর কাছে এসব কথা কিছু বলতে যাসনি, তা হলে বকুনি খাবি। সেইজন্যই শিখা আপনাকে আজ বলে যেতে ভয় পেয়েছে।

সমস্ত আহার্য বিস্বাদ হয়ে গেল নীতীশের কাছে। ফেলে ছড়িয়ে তিনি উঠে পড়লেন। শিখার সঙ্গে এই কটা দিন কথা বলে তিনি বিন্দুমাত্র তার চরিত্রের এই দিকটা বুঝতে পারেননি। এলাহাবাদ-বেনারসের শিক্ষিত মেয়েগুলো এরকম পাগল হয় বুঝি? সন্তোষী মা, বিরজানন্দ মহারাজ, এইসব এলেবেলে ব্যাপার নিয়ে এরা মেতে থাকে?

নিজের ঘরে আসার পর নীতীশের মনে পড়লো, এই বিরজানন্দ মহারাজের ছবি তিনি খবরের কাগজে দেখেছেন। বেশ একখানা রমণীমোহন চেহারা। কাঁধ পর্যন্ত লোটানো চুল, চিবুকে সামান্য দাড়ি, গায়ে সিল্কের জামা, দু হাতের আঙুলে সাত-আটটা আংটি। গাদা-গুচ্ছের আংটি পরা পুরুষ মানুষদের নীতীশের ক্লাউন বলে মনে হয়। এই বিরজানন্দ লোকটা আগে ছিল একজন সরকারি চাকুরে, হঠাৎ কী সব স্বপ্নটপ্ন দেখে সাধু হয়েছে। সরকারি চাকুরির মাইনেতে যে অবস্থায় ছিল, তার থেকে এখন অনেক বেশি বহাল তবিয়তে আছে নিশ্চয়ই।

নীতীশ মনে মনে গজরাতে লাগলেন। যদি তিনি শুনতেন যে কলকাতা শহরে শিখার একজন গোপন প্রেমিক আছে, শিখা তার সঙ্গে রাত কাটাতে গেছে, তা হলে তিনি দুঃখিত হতেন না। কিন্তু বিরজানন্দ স্বামী। ব্যাটা নিশ্চয়ই বুড়ো, নীতীশের চেয়ে

বয়সের কিছুতেই কম হবে না, অনেকদিন ধরে নাম শোনা যাচ্ছে।

সাঁইবাবা, মহেশ যোগী, রজনীশ, এইসব যত রাজ্যের ফ্রডের উৎপাত শুরু হয়েছে আজকাল। নামে সাধু, অথচ বিলাসিতার বহর কী! এইসব মহারাজ বা গুরু নামেই ঘুষের কারবারি! যারা লোক ঠকিয়ে বেড়ায়, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে না কেন? ঘুষ দেওয়া কিংবা নেওয়া আইনের চোখে অপরাধ। এইসব গুরুগুলো তো নিরীহ মানুষদের পুণ্যের ঘুষ দিয়ে নানা রকম টাকাপয়সা কিংবা সেবা আদায় করছে। সরকার এদের শাস্তি দিতে পারে না?

সাঁইবাবা নাকি হাওয়ার মধ্য থেকে ফট্ করে আংটি কিংবা মাদুলী নিয়ে আসতে পারে হাতের মুঠোয়। যাদু সম্রাট পি সি সরকারের ছেলে জুনিয়ার পি সি সরকার তো হাওয়া থেকে পায়রা অথবা খরগোশ পর্যন্ত তৈরি করে দিতে পারে। কৈ সে তো কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করে না। নীতীশ সাদা দেওয়ালে একটা থাপ্পড় মেরে বসলেন, নিছক শস্তার ম্যাজিককে যারা অলৌকিক ক্ষমতা কিংবা বিভূতি বলে চালায়, সেই বদমাসগুলোকে জেলে ভরে না কেন গভর্নমেণ্ট?

শুধু গভর্নমেণ্ট কেন, কমুনিস্টদের সম্পর্কেও অভিযোগ আছে নীতীশের। তিনি মনে মনে কমুনিস্টদের সমর্থন করেন। মাড়োয়ারি কম্পানিতে বড় চাকরি করার সময়েও তিনি কমুনিস্টদেরই প্রত্যেকবার ভোট দিয়েছেন। শুধু একটা ব্যাপারে তাঁর রাগ আছে। এমনকি কমুনিস্টরাও কেন প্রকাশ্যে, প্রবলভাবে এইসব ধর্মীয় বুজরুকির নিন্দে করে না? এইসবের বিরুদ্ধে কেন প্রচার চালায় না?

নীতীশের শ্যালক এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণ একদিন খানিকটা ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, রিটায়ার করেছো, বুড়ো হচ্ছো, নীতীশ, এখন একটু ধর্মকর্মে মন দাও। সারাজীবন তো কিছুই করলে না, জীবনের

সারমর্মও বুঝলে না। ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করলে দেখবে সময়টাও সুন্দরভাবে কাটবে।

একথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন নীতীশ। সবাই জানে, নীতীশ বদরাগী মানুষ, অরুণকে যে একখানা থাপ্পড় কষাননি, এই তার ভাগ্য! তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, আমি বুড়ো হয়েছি? কত বুড়ো? আমি তো একজন একশো সাতষটি বছরের বুড়োকে জানি যিনি ধর্ম-টর্ম কিংবা ভগবান-টগবান নিয়ে মাথা ঘামাননি!

অরুণ অবাক হয়ে বলেছিলেন, একশো সাতষট্টি বছরের বুড়ো! কোন দেশের?

নীতীশ অরুণের থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই দেশেরই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আঠারোশো কুড়ি সালে জন্মাননি? এটুকুও জানিস না তোরা? তিনি তো ধর্ম কিংবা ভগবান নিয়ে সময় নষ্ট করেননি, তা বলে কি তাঁর জীবনটা ব্যর্থ কেটেছে? বল শালা, বল!

অরুণ মিনমিন করে বলেছিলেন, সবাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে পারে না!

নীতীশ বলেছিলেন, ঠিক কথা, সবাই ওর মতন হতে পারে না। তা বলে ওঁকে অনুসরণ করতেও ভয় লাগে? দুর্বলচন্দ্র অবিদ্যার সাগর হবো? অ্যাঁ?

ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে নীতীশ প্রায় জোরে জোরেই বলে উঠলেন, ফার্ন রোড! বিরজানন্দ! শালা তোর কাছে আমি জবাবদিহি চাইবো। আমাকে পোস্ট কার্ড পাঠানো, এত সাহস!

নীতীশের কাছে প্রায়ই ইংরাজিতে টাইপ করা পোস্ট কার্ড আসে। সাঁইবাবা, মহেশ যোগী, একবার বিরজানন্দের নামেও এসেছিল। সব চিঠির বয়ান একই রকম। এই চিঠি পাবার পর

তুমি তোমার চেনা লোকের নামে গুরুজী মহারাজের দৈবশক্তির কথা জানিয়ে কুড়িখানা পোস্টকার্ড পাঠাবে। গুরুজীর নাম করে একজন কর্নেল প্রমোশন পেয়েছেন জেনারেল পদে, একজন ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছেন ফরেন সেক্রেটারি, একজন খোঁড়া লোক এখন দু পায়ে দৌড়োয়। একজন ব্যবসায়ী ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে দু কোটি টাকা লাভ করেছে। আর তুমি যদি কুড়িখানা পোস্টকার্ড না পাঠাও, চেইন ভেঙে দাও, তাহলে দু সপ্তাহের মধ্যে তোমার কুষ্ঠরোগ হবে, তোমার ছেলে দুর্ঘটনায় মারা যাবে, তোমার বউ অন্যের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হবে···

প্রথম প্রথম এই সব পোস্টকার্ড পেয়ে নীতীশ ঠোঁট বেঁকিয়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতেন। হঠাৎ তাঁর একদিন খেয়াল হলো, সরকারি চাকরির প্রমোশনের লোভ দেখানো কিংবা ভীতি প্রদর্শন দুটোই তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যারা এই সব চিঠি পাঠায়, তারা এতই কাপুরুষ যে নিজের নাম দেয় না। তারাও নিশ্চয়ই জানে যে, এরকম চিঠি পাঠানো অন্যায়। তবু গুরুর নামে অন্যায় করে যাচ্ছে। নীতীশ একখানা পোস্ট কার্ড তাঁর এক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বন্ধুকে দেখালেন। বন্ধুটি পাত্তাই দিলেন না। তিনি বললেন, আরে ছাড়ো ভাই, এরা পোস্ট কার্ড খরচ করে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের আয় বাড়াচ্ছে, এতে আমাদের আপত্তি করার কী আছে! আমাদের কি আর খেয়েদেয়ে কোন কাজ নেই যে এই ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেব!

নীতীশ ঠিক করলেন, কালই তিনি বিরজানন্দের সঙ্গে দেখা করে ঐ চিঠির জন্য কৈফিয়ৎ দাবি করবেন।

বেশি রাগ হয়ে গেলে নীতীশ উল্টো কিছু ভাবার চেষ্টা করেন। একটু মাথা ঠাণ্ডা করার পর তিনি বুঝলেন, বিরজানন্দের ওপর তাঁর এই যে এত রাগ, তা আসলে ঈর্ষার জ্বালা। শিখা কেন ঐ লোকটার সঙ্গে রাত্রে এক বাড়িতে থাকবে? যমুনা সন্তোষী মা-র ব্রত করে,

সেটা নীতীশের পছন্দ নয় একেবারেই, তবু রাগ তো হয় না। শিখাও যদি বিরজানন্দের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসতো, তিনি কৌতুক বোধ করতেন বড় জোর, এমন গা জ্বলতো না। এখন রাত এগারোটা, ফার্ন রোডের ঐ বাড়িতে শিখা এখন কী করছে? নীতীশের বুক খালি করে একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

শিখা পরদিন সকালেও ফিরলো না। দুপুরেও না। নীতীশের কেন যেন দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল, দুপুরবেলা শিখা হঠাৎ এ বাড়িতে এসে নীতীশের বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদবে! কেন সে কাঁদছে তা বলবে না। নীতীশও কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। তিনি শুধু শিখার গুচ্ছ গুচ্ছ চুলে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবেন। তারপর বলবেন, শিখা, সেই ইংরিজি কবিতাটা আবার বলো তো, তা হলেই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।

দুপুরেও এলো না শিখা। সন্ধেবেলা নীতীশ রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে হাঁটলেন, পার্কের রেলিং-এ ভর দিয়ে রইলেন, তারপর একসময় অবধারিতভাবে একটি বালিগঞ্জ স্টেশন অভিমুখী ট্রামে চেপে বসলেন।

ফার্ন রোডে বিরজানন্দের ভক্তের বাড়ি খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধে হল না। ছোট রাস্তায় শ'খানেক গাড়ি পার্ক করা। মাইকে কীর্তন গান হচ্ছে। গাড়ি থেকে যারা নামছে, সকলেরই হাতে ফুলের গুচ্ছ। গড়িয়াহাট বাজারে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব ফুল শেষ। ফুলের কী অপচয়! একটা ফুলের চেয়ে এক হাজারটা ফুল কি বেশি মূল্যবান? যে প্রেমিক, সে একটা ফুলও পায় না, আর কোনো নামডাকওয়ালা ব্যক্তির শবে হাজার হাজার ফুল পড়ে? যে ফুল পেল সেও কিছু বুঝলো না, আর ফুলও জানলো না কিসের জন্য সে খরচ হচ্ছে।

গেটের বাইরেই এত ভিড় যে, ভেতরে ঢোকাই মুশকিল। কয়েকজন ভলানটিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলাদা কোনো পথে

অন্দরমহলে নিয়ে যাচ্ছে। টাকা, প্রতিপত্তি কিংবা নামডাক থাকলে সব জায়গাতেই শর্ট-কাট আছে।

এরকম জনতার ঘেঁষাঘেঁষি কোনোদিনই পছন্দ করেন না নীতীশ, তবু তিনি ঠেলেঠুলে একটা হলঘরের মাঝামাঝি চলে এলেন। বিরজানন্দকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, সিংহাসনের মতন একটা উঁচু চেয়ারে তিনি বসে আছেন স্থির হয়ে। শুধু সাদা স্থলপদ্ম দিয়ে সাজানো ফুলের সিংহাসন। তার দু পাশে থাক থাক করে বসে আছে অন্তত পনেরো-কুড়িটি মহিলা। ধূপের ধোঁয়ায় পুরো হলঘরটি আচ্ছন্ন। মাইক্রোফোনে খুব জোরে বাজছে কীর্তন গান। ভক্তরা গোছা গোছা রজনীগন্ধা আর গোলাপ ছুঁড়ে দিচ্ছে গুরুজীর পায়ের দিকে। সেগুলি গুরুর পা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না, একজন জাঁদরেল গোছের শিষ্য সেগুলি ধরে নিয়ে অবহেলার সঙ্গে সরিয়ে রাখছে একপাশে। একসঙ্গে এত ফুলের ঘায়ে গুরুজী মূর্ছা যেতে পারেন। ফুলগুলো কি এরকম ভাবে অপমানিত হবার জন্য ফুটেছিল!

ভক্তরা সন্দেশের বাক্সও দিচ্ছে। সেগুলো রাখা হচ্ছে অন্য পাশে। তা, পঁচিশ-তিরিশ কিলো সন্দেশ জমে গেছে এর মধ্যেই।

নীতীশ শিখাকে দেখতে পেলেন না। তিনি ব্যাকুলভাবে মুখ ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখতে লাগলেন। শিখা ভিড়ের মধ্যে থাকবে না, গুরুজীর কাছাকাছি ঐসব অনুগৃহিতা মহিলাদের মধ্যেই তার থাকার কথা।

হল ভর্তি নারী পুরুষদের দেখে নীতীশ আরও একটি কারণে বিমর্ষ বোধ করলেন। শুধু বুড়ো বুড়িরাই তো আসেনি, তরুণ-তরুণীদের সংখ্যাও প্রায় অর্ধেক হবে। বিরজানন্দের দু পাশে যে মহিলারা বসে আছে, তাদের মধ্যে বেশী বয়স্কা একজনও নেই, যুবতী থেকে মধ্যবয়স্কা, সবাই স্বাস্থ্যবতী, দেখলেই বোঝা যায় সচ্ছল পরিবারের। মলিন বসনা বা বৃদ্ধাদের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না বোঝা যাচ্ছে।

নীতীশ ভেবেই পেলেন না, তরুণ-তরুণীরাও কেন এখানে আসে?

কিসের আশায়, কী পাবার জন্য ? নিজের জীবনটা নিজেই গড়ে তোলার মতন তেজটুকুও এদের নেই ? এতই হীনমন্যতা এসে গেছে তরুণ সমাজে ? বুড়ো বয়সে অনেকের মন দুর্বল হয়ে যায়, তখন অপরাধবোধ বা পাপবোধ থেকে, পরকালে শাস্তি পাবার ভয়ে, তারা পুণ্যের টিকিট চায়, এটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু যুবসমাজ, যাদের কর্মকাণ্ড সব বাকি পড়ে আছে, তারাও কি আগে থেকেই মুক্তির পথ খুঁজছে ?

হলঘরটায় অন্তত পাঁচ-ছশো লোক তো হবেই। প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত, বেশ কিছু অবাঙালীও রয়েছে, গরিব চেহারার একজনও নেই। ফার্ন রোডে বস্তির অভাব নেই, সেখান থেকে একজনও আসেনি, কিংবা এলেও তাদের ঢুকতে দেওয়া হতো না। এত বড় বাড়িটার যে মালিক, সে বিরজানন্দের জন্য যে এই এলাহী ব্যবস্থা করেছে, তার পেছনে কি কোনো মতলব নেই ?

দেশের পঞ্চাশ-ষাট ভাগ মানুষ এখনও খেতে পায় না, তাদের কাছে এই সব গুরুজীরা যায় না। তাদের জন্য ভগবান কিংবা তাঁর এই চ্যালাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এইসব গুরুদের যদি কোনো আধ্যাত্মিক চেতনা হয়েও থাকে তা শুধু এই পয়সাওয়ালা লোকদের মধ্যে মিষ্টি মিষ্টি বাণী ছড়াবার জন্য আর বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য ?

হঠাৎ শিখাকে দেখতে পেলেন নীতীশ। ভেতর থেকে সে বেরিয়ে এলো, হাতে একটি রুপোর থালায় কয়েকটি সন্দেশ। আজও লাল রঙের শাড়ি পরেছে শিখা। মাথার চুল খোলা, চোখ-মুখে যেন শুভ্র জ্যোতি। থালা থেকে একটা সন্দেশ তুলে সে খাওয়াতে গেল বিরজানন্দকে, বিরজানন্দ মাথা নাড়লেন।

এত দূর থেকে ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না, তাছাড়া কীর্তনের আওয়াজ, নীতীশের মনে হলো একটা মৌন নাটক দেখছেন। শিখা জোর করে বিরজানন্দকে একটা সন্দেশ খাওয়াবেই, বিরজানন্দ

খেতে চাইছেন না, দুপুরে নিশ্চয়ই বিরাট খ্যাঁট হয়েছে, এখন পেট ভর্তি, শিখা সামনের দিকে মুখ তুলে কী যেন দেখাচ্ছে। খুব সম্ভবত কোনো খুব বড় প্রভাবশালী ভক্ত পাঠিয়েছে ঐ সন্দেশ, তার চোখের সামনেই গুরুজী অন্তত একটা সন্দেশ মুখে দিচ্ছেন, তা দেখে সে ধন্য হতে চায়। শেষ পর্যন্ত শিখার কাছে হার মেনে গুরুজী হাঁ করলেন, শিখা তাঁর মুখে ভরে দিল একটা সন্দেশ, গুরুজী একটা হাতে বেষ্টন করলেন শিখার কোমর।

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলো নীতীশের অন্তরাত্মা। প্রবল বাসনা সত্ত্বেও নীতীশ শিখাকে একবারও স্পর্শ করেননি। আর এই লোকটা অবলীলাক্রমে শিখার কোমর জড়িয়ে ধরলো! সন্দেশ খাওয়ার সঙ্গে কোমরে হাত রাখার কী সম্পর্ক আছে? বিরজানন্দের বয়েস নীতীশেরই সমান হবে। 'আহা, শিখা তো আমার মেয়ের মতন', বিরজানন্দ মুখে এরকম একটা ভাব ফুটিয়ে রাখলেও নীতীশ জানেন, ঐ হাতের স্পর্শে আছে কাম। বিশুদ্ধ ঈর্ষায় নীতীশের সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগলো।

চকিতে একটা ঘটনা মনে পড়লো নীতীশের। চাকরিজীবনে তিনি শুনেছিলেন, কলকাতায় চাড্ডা নামে একজন বড় ব্যবসায়ী আছে, তার বাতিক হলো মেয়েদের উরু ও নিতম্বে হাত বুলোনো। এতে প্রতিদিন নিত্যনতুন মেয়েকে ভাড়া করে আনে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি। লোকটা সম্ভবত ধ্বজভঙ্গ, মেয়েদের সঙ্গে অন্য কিছু করার ক্ষমতা তার নেই, বিছানায় কক্ষনো শুতে চায় না, কিংবা ভয় পায়, শুধু মাঝে মাঝে কোনো মেয়ের উরু এবং নিতম্বে হাত বুলিয়েই তার আনন্দ। অন্যদের সামনে, বড় বড় বিজনেস ডিল করার সময়েও সে পাশে দাঁড়নো একটি মেয়ের শরীরে হাত রাখে। মেয়েটি যদি কখনো একটু দূরে সরে যায় কিংবা বাথরুমে যায়, গুরুতর ব্যবসার কথার সময়েও হাত বাড়িয়ে চাড্ডা একটি নরম নিতম্ব না পেলে, কথা থামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে! আরে উয়ো কাঁহা? উয়ো কাঁহা?

পয়সা ছড়ালে কলকাতায় এরকম মেয়ে পাওয়া যায় অজস্র। ভারতের অনেক হাটেবাজারে এখনও মেয়ে বিক্রি হয়। চাড্ডাকে তবু পয়সা খরচ করতে হয়। বিরজানন্দ শুধু বাণী দিয়েই কোমরে হাত রাখার মতন মেয়ে পাচ্ছে।

নীতীশের কাছে যদি একটা রিভলবার থাকতো, তা হলে তিনি এই মুহূর্তে বিরজানন্দকে গুলি করতেন। যদি ভিড় ঠেলে সামনে যাওয়া সম্ভব হতো, তিনি ছুটে গিয়ে চেপে ধরতেন বিরজানন্দের টুঁটি। তিনি তার বদলে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলতে চাইলেন, শালা, ভণ্ড, এক্ষুনি তোর হাত সরা। নইলে দেখবি আমি তোকে···

নীতীশের গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরুলো না, তিনি দেখলেন ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকছে তার ছেলে প্রীতীশ আর পুত্রবধূ যমুনা। গরদের শাড়ি পরে এসেছে যমুনা, প্রীতীশও পরেছে ধুতি-পাঞ্জাবি। ছেলেকে এই পোশাকে অনেকদিন দেখেননি নীতীশ, সে-ও সঙ্গে ফুলের গুচ্ছ এনেছে। তাঁর নিজের ছেলেও ভিড়েছে এই দলে? যমুনাই নিশ্চয় নিয়ে এসেছে ওকে, যমুনার সন্তোষী মা-র পূজোতে সে প্রতিবাদ করতে পারে না, তাঁর ছেলে জরু কা গোলাম।

আর এক নিমেষও এখানে থাকা চলে না নীতীশের। বাবাকে এখানে দেখে ফেললে কী ভাববে প্রীতীশ আর যমুনা! বাবা কেন এসেছে? ওরা যে কারণটাই ভেবে নিক, সেটাই হবে নীতীশের পক্ষে লজ্জা ও অপমানের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেছন ফিরলেন।

বাড়িটার বাইরে এসে রাস্তায় পা দিয়ে নীতীশ ভাবলেন, শিখাকে এইভাবে বিরজানন্দের খপ্পরে বিনা বাধায় ছেড়ে যেতে হবে? অমন সুন্দর একটা মেয়ে···এর কোনো প্রতিকার নেই? থানায় গিয়ে এক্ষুনি বলা উচিত, মশাই, ফার্ন রোডের একটা বাড়িতে এক ব্যাটা ভণ্ড জোচ্চোর লাম্পট্য চালাচ্ছে, আপনারা কিছু করবেন না? নীতীশ জানেন, থানায় গিয়ে তিনি এই কথা বললে পুলিশরা হেসে উঠবে

তাঁর মুখের ওপর। তাঁকে পাগল ভাববে। ধর্মীয় ব্যাপার স্থাপারে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না কিছুতেই। সেকুলার স্টেট!

কাছেই জ্যোতি বসুর বাড়ি। সে বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে বললে হয় না, আসুন, আসুন, শিগগির আসুন আমার সঙ্গে, আপনার ক্যাডারদের ডাকুন, এই পাড়ার মধ্যেই অপসংস্কৃতি চলছে, একগাদা নিরীহ লোককে এক ধাপ্পাবাজ জোর করে আফিং গেলাচ্ছে, তা বন্ধ করবেন না?

নীতীশ সেসব কিছুই করলেন না, পরাজিত মানুষের মতন মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। আপন মনে বিড় বিড় করে যাচ্ছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছেন, খবরের কাগজে একটা কড়া করে চিঠি লিখবেন, তাও ছদ্মনামে, ছেলে-ছেলের বউ যেন বুঝতে না পারে।

তিন দিনের মধ্যেও সে চিঠি লিখলেন না নীতীশ। মনে হলো, লিখে কোনো লাভ নেই। খবরের কাগজগুলোও ইদানীং এই সব গুরু-মহারাজদের নিয়ে খুব মাতামাতি করে। এই তো আজকের কাগজেও শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত বিরজানন্দের তিন কলম ছবি বেরিয়েছে। তলায় লিখেছে যে, কয়েকদিন কলকাতায় ধর্মসভা করার পর তিনি এবার বিমানে বোম্বাই জয় করতে যাবেন।

সেদিনই শিখা তার জিনিসপত্র নিতে এলো। বিদায় নেবার সময় সে নীতীশকে প্রণাম করে ছেলেমানুষীর সুরে বললো, আসি মেসো-মশাই। আবার কলকাতায় এলে এই বাড়িতেই উঠবো কিন্তু।

শিখার মাথার চুলের থেকে আধ ইঞ্চি ওপরে নীতীশ তাঁর ডান করতল আশীর্বাদের ভঙ্গিতে এনে, প্রশান্ত হাস্যে বললেন, এসো মা। নিশ্চয়ই আবার আসবে। যখন খুশি হয় চলে আসবে। তোমার রিসার্চ পেপারটা কমপ্লিট হলে আমাকে একটা কপি পাঠিও, আমি পড়ে দেখবো।

মনে মনে তিনি বললেন, শুধু শুধু বিরজানন্দের দোষ দিচ্ছিলেন

কেন তিনি? বিরজানন্দ তো ভণ্ড নয়! সে যা চায়, তা সে যেমন ভাবেই হোক আয়ত্ত করে। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর যদি ভোগ বিলাসের বাসনা হয়, ভালো খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি ও প্লেনে যাতায়াত, ফুলের মালা এই সব যদি তার পেতে ইচ্ছে হয়, যদি যুবতী পরস্ত্রীদের সেবা চায় সে, যদি শিখার মতন কোনো সুন্দরী কুমারীর কোমর জড়িয়ে সুখী হয়, তা সে বাকচাতুরিতেই হোক, দৈব মহিমার ভড়ং করেই হোক, ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে তো ভণ্ডামির কিছু নেই।

আসল ভণ্ড তো নীতীশ নিজে। তাঁর চিন্তা ও কাজের কোনো মিল নেই। তিনি মনে মনে যা তীব্রভাবে চান, মুখে তা বলতে পারেন না। এই বয়েসে তাঁর ভোগ বাসনা জাগলেও তা প্রকাশ করতে চরম দ্বিধা ও লজ্জা! কোনো অন্যায় দেখলেও প্রতিবাদ করতে পারেন না তিনি। এই মাত্র তিনি শিখার সামনে যে ব্যবহার করলেন, তা ভণ্ডামি ছাড়া আর কী? মাথার ওপর হাত রেখে আশীর্বাদ করার বদলে একবার দু'হাতে শিখাকে বুকে টেনে নিয়ে তার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের স্পর্শ নেবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু সে সাহস তাঁর নেই, তিনি যে ভদ্রলোক!

—

বুদ্ধিরাম শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। লেবেলে ছাপা অক্ষর সবই খুব তেজালো। "ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ, অম্ল পিত্ত ও অজীর্ণতা রোগের নিবারণ অবশ্যম্ভাবী। অতিশয় বল-কারক টনিক বিশেষ। স্নায়বিক দুর্বলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও অনিদ্রা রোগের পরম ঔষধ। বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজেরা ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন···।" ছাপা অক্ষরের প্রতি বুদ্ধিরামের খুব দুর্বলতা। ছাপা অক্ষরে যা বেরোয় তার সবটাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আহুরি অবশ্য অন্য ধাতের। বুদ্ধিরামের সঙ্গে তার মেলে না। বুদ্ধিরাম যা ভাবে, বুদ্ধিরামের যা ইচ্ছে যায় আহুরির ঠিক তার উল্টো হয়। বুদ্ধিরাম যদি নরম সরম মানুষ, তো আহুরি হল রণচণ্ডী। বুদ্ধিরাম যদি নাস্তিক, তো আহুরি হল ঘোর আস্তিক। বুদ্ধিরামকে যদি কালো বলতে হয়, তো আহুরিকে ফর্সা হতেই হবে। বিধাতা (যদি কেউ থেকে থাকে) দুজনকে এমন আলাদা মালমশলা দিয়ে গড়েছেন যে আর কহতব্য নয়।

আর সে জন্যই এ জন্মে দুজনের আর মিল হল না। বলা ভাল, হতে হতেও হল না। এখন যদি বুদ্ধিরামের বত্রিশ-তেত্রিশ তো আহুরির সাতাশ-আঠাশ চলছে; দুজনের কথাবার্তা নেই, দেখাশোনাও এক রকম কালেভদ্রে, মুখোমুখি যদি বা হয় চোখাচোখি হওয়ার জো নেই। আহুরি আজকাল বুদ্ধিরামের দিকে তাকায়ও না।

কিন্তু বুদ্ধিরাম লোক ভাল। লোকে জানে, সে নিজেও জানে। বুদ্ধিরাম আগাপাশতলা নিজেকে নিরিখ করে দেখেছে। হ্যাঁ, সে লোক খারাপ নয়। মাঝে মাঝে বুদ্ধির দোষে দু-একটা উল্টো-

পাল্টা করে ফেললেও তাকে খারাপ লোক মোটেই বলা যাবে না।

খারাপই যদি হবে তবে সাত মাইল পথ সাইকেল ঠেঙিয়ে চক-বেড়ের হাটে কখনো আসে মন্মথ সেনশর্মার পিওর আয়ুর্বেদিক টনিক 'হারবল' কিনতে? মাত্র মাস চারেক আগে প্লুরিসিতে ভুগে উঠল বুদ্ধিরাম। এখনো শরীর তেমন জুতের নয়। কাকের মুখে শোনা গিয়েছিল, আতুরির নাকি আজকাল খুব অম্বল হয়। তা এ রকম কত মেয়েরই হয়। কার তাতে মাথাব্যথা? বুদ্ধিরাম মানুষ ভাল বলেই না খোঁজখবর করতে লাগল।

তেজেনের কাছে শুনল, হারবল খেয়ে তার পিসির অম্বলের ব্যথা সেরে গেছে। কথাটা মানিক মণ্ডলের কাছেও শোনা, হ্যাঁ, হারবল জব্বর ওষুধ বটে, তিন শিশি খেতে না খেতে তার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর একদিন পরিতোষও কথায় কথায় বলেছিল, হারবল একেবারে অম্বলের যম। তবে পাওয়া শক্ত। মন্মথ করিরাজ সেই শিবপুরের লোক, আশির ওপর বয়স। বেশী পারেও না তৈরি। করতে কয়েক বোতল করে ছাড়ে। দারুণ চাহিদা। চকবেড়ের হাটে একজন লোক নিয়ে আসে বেচতে।

খবর পেয়েই আজ মঙ্গলবারে স্কুলের শেষ দুটো ক্লাশ অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে সাইকেল মেরে ছুটে এসেছে এত দূর। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আধবুড়ো খিটখিটে চেহারার একটা লোক। ময়লা চাদর পেতে কয়েকটা বিবর্ণ ধুলোটে শিশি সাজিয়ে বসেছিল। ভারী বিরস মুখ।

বুদ্ধিরাম জিজ্ঞেস করল, হারবল আছে?

লোকটা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, আছে। সতেরো টাকা।

সতেরো টাকা শুনে বুদ্ধিরাম একটু বিচলিত হয়েছিল। দু-শিশি কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কুড়িয়ে বাড়িয়েও পকেট থেকে আঠাশ টাকার বেশি বেরলো না।

আচ্ছা, দু শিশি নিলে কনসেশন হয় না?

লোকটা এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাল যেন মরা ইঁদুর দেখছে। মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, পাচ্ছেন যে সেই ঢের। মন্মথ কবরেজের আয়ু ফুরলো বলে। তারপর হারবলও হাওয়া। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

একটা শিশি কিনে বুদ্ধিরাম বলল, সামনের মঙ্গলবার আবার যদি আসি পাবো তো।

বলা যাচ্ছে না।

কথাটা যা-ই হোক সেটা বলার একটা রংঢং আছে তো। লোকটা এমনভাবে 'বলা যাচ্ছে না' বলল যা আঁতে লাগে। মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটাই যেন বাহাদুরি। বেচিস তো বাপু কবরেজি ওষুধ, তাও গাছতলায় বসে, অত দেমাক কিসের!

শিশিটা নিয়ে বুদ্ধিরাম হাটে একটু ঘুরে বেড়াল। চকবেড়ের হাট বেশ বড়। বেশ গিগগিজ ভিড়ও হয়েছে। চেনা মুখ নজরে পড়বেই। আশেপাশের পাঁচ সাত গাঁয়ের লোকই তো আসে। বুদ্ধিরামের এখন চেনা কোনো লোকের সঙ্গে জুটতে ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে তার একটু একাবোকা থাকতে বড় ভাল লাগে।

জিলিপি ভাজার মিঠে মাতাল গন্ধ আসছে। ভজার দোকানের জিলিপি বিখ্যাত। শুধু জিলিপি বেচেই ভজা সাতপুকুরে ত্রিশ বিঘে ধানজমি, পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। কিনেছে তিনটে পানজাবী গাই। ডিজেল পাম্প সেট আর ট্র্যাক্টরও। ছেঁড়া গেঞ্জী আর হেঁটো ধুতি পরে এমন ভাবখানা করে থাকে যেন তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজও ভজার সেই বেশ। নারকেলের মালার ফুটো দিয়ে পাকা হাতে খামি ফেলছে ফুটন্ত তেলে। চারটে ছোকরা রসের গামলা থেকে টাটকা জিলিপি শালপাতার ঠোঙায় বেচতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ মাছির মত ভনভন করছে দোকানের সামনে।

বুদ্ধিরাম কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে। ডান হাতে বাঁ হাতে

পয়সা আসছে জোর। ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করার সময় নেই। আর তার ভিতরে টাকাপয়সা এমন গিজগিজ করছে যে, চোখ কচকচ করে। টাকাপয়সার ভাবনা বুদ্ধিরাম বিশেষ ভাবে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখলে বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করে।

বুদ্ধিরাম বেঞ্চে একটু জায়গা খুঁজল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। সকলেই জিলিপিতে মজে আছে। এমন খাচ্ছে যেন এই শেষ খাওয়া। ভোমা ভোমা নীল মাছি ওড়াউড়ি করছে বিস্তর। ভিতরবাগে তিনখানা বেঞ্চের একটা থেকে দুজন উঠে যেতেই বুদ্ধিরাম গিয়ে বসে পড়ল। এখনো আশ্বিনের শেষে তেমন শীতভাব নেই। দুপুরবেলাটায় গরম হয়। উনুনের তাপ আর কাঠের ধোঁয়ায় চালা-ঘরের ভিতরটা রীতিমতো তেতে আছে। বুদ্ধিরাম বসেই ঘামতে লাগল।

পাশের লোকটা এখনো জিলিপি পায়নি। বৃথা হাঁকডাক করছে, বলি ও ভজাদা, আধঘণ্টা হয়ে গেল হাঁ করে বসে আছি—দেবে তো।

দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি। দশখানা তো হাত নয়।

আর আমাদেরই বুঝি মেলা ফালতু সময় আছে হাতে?

এই চড়াটা হলেই দিচ্ছি গো।

লোকটা ফস্ করে বুদ্ধিরামের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তারপর মানব্বরের মতো বলল, হারবল? মন্মথ কবরেজের ওষুধ! দুর দুর, কোনো কাজের নয়! তিন শিশি খেয়েছি।

বুদ্ধিরাম তার হাত থেকে বোতলটা ফের নিয়ে বলল, তা বেশ। কাজ হয় না তো হয় না।

লোকটা ভারী কড়া চোখে বুদ্ধিরামকে একটু চেয়ে দেখল। জিলিপি এসে পড়ায় আর কিছু বলতে পারল না। মুখ তো মাত্র একটা, একসঙ্গে দু কাজ তো করা যায় না। তার ওপর ভজার জিলিপি মুখকে ভারী রসস্থ করে দেয়। কথা বলাই যায় না।

বুদ্ধিরামকে লোকে বলে ভাবের লোক। কথাটা মিথ্যেও নয়।

বুদ্ধিরাম বড় ভাবতে ভালবাসে। ভাবতে ভাবতে তার মাথা যে তাকে কাঁহা কাঁহা মুলুক নিয়ে যায়, কত আজগুবি জিনিস দেখায় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

বুদ্ধিরাম ভজার জিলিপির দোকানে বসে বসে ভাবতে লাগল, এই যে ভজা বাঁ হাতে ডান হাতে হরির লুটের মতো পয়সা কামাচ্ছে, এতে হচ্ছেটা কী ?

এত জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এসব ছেড়ে একদিন ফুটুস করে চোখ ওল্টাতে হবে ! তখন ভজার ছেলেরা কেউ জিলিপির প্যাঁচ কষতে আসবে না। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি করে ভাগ ভিন্ন হবে। ভজা কি আর তা জানে না। তবু খেয়ে না খেয়ে মেলায় মেলায় রোদ জল মাথায় করে গিয়ে চালা বেঁধে কেবল জিলিপি খেলিয়ে যাচ্ছে। টাকার নেশায় পেয়েছে লোকটাকে।

বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধিরামের পালা এসে গেল অবশেষে। ঠোঙায় আটখানা রসে মাখামাখি গরম জিলিপি। আহা, এইরকম এক ঠোঙা যদি আহ্লরির হাতেও গরমগরম পৌঁছে দেওয়া যেত !

প্রথম জিলিপিটা দাঁতে কাটতে গিয়েই টপ টপ করে অসাবধানে দু ফোঁটা রস পড়ে গেল টেরিকটনের পাঞ্জাবিতে। বড় সাধের পাঞ্জাবি। ঘী রঙের, গলায় আর পুটে চিকনের কাজ করা। বুদ্ধিরাম রুমালে মুছে নিল রসটা। মনটা তার খুঁত খুঁত করতে লাগল। একেবারে নতুন পাঞ্জাবি। কাঁচি ধুতির ওপর এটা পরে আহ্লরির বাড়ির সামনে খুব কয়েকটা চক্কর দিয়েছিল সাইকেলে। আহ্লরি অবশ্য বেরোয়নি। কিন্তু বুদ্ধিরামের ধারণা যে, আহ্লরি তাকে আড়াল থেকে ঠিকই দেখে।

জিলিপির দাম দিয়ে বুদ্ধিরাম উঠে পড়ল। সামনেই পানের দোকান। সে পান-সিগারেট খায় না। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তেড়াবেঁকা আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। না, বুদ্ধিরাম দেখতে খারাপ নয়। রংটা যা একটু ময়লা। কিন্তু মুখচোখ বেশ

কাটা কাটা। নিজেকে দেখে সে একটু খুশিই হল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল।

একটা দোকানে পঞ্চাশ পয়সার কড়ারে সাইকেল জমা রেখেছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে উধাও মাঠ-ঘাট, ধানক্ষেত। আকাশটা কী বিশাল! বাঁশবনের পেছনে সূর্য একটু ঢলে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া।

বুদ্ধিরাম ধানক্ষেতে নেমে পড়ল। চওড়া আল। খানিকদূর গিয়ে রাস্তা।

ধানক্ষেতের ভিতরে নেমে বুদ্ধিরামের মনটা আবার কেমন যেন হয়ে গেল। আহুরি কি ওষুধটা খাবে? এমনিতেই মেয়েরা ওষুধ খেতে চায় না, তার ওপর বুদ্ধিরামের পাঠানো ওষুধ। আহুরি বোধহয় ছোঁবেও না। এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে। তা যাক। বুদ্ধিরামের কাজ বুদ্ধিরাম করেই যাবে।

পূজোয় একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরামের বোন রসকলি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে নেয়ওনি। বিরস মুখে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, কে পাঠিয়েছে রে?

রসকলি বোকা গোছের মেয়ে। ভয়ে ভয়ে শেখানো কথা বলেছিল, মা পাঠাল।

তোর মা আমাকে শাড়ি পাঠাবে কেন?

তা জানিনা। এটা পরে অষ্টমী পূজোয় অঞ্জলি দিও।

শাড়িটা ভালই। কালু তাঁতির ঘর থেকে কেনা। লাল জমির ওপর ঢাকাই বুটি।

শাড়িটার দিকে তাকায়ওনি আহুরি। শুধু দয়া করে বলেছিল, ওখানে কোথাও রেখে যা।

সেই শাড়ি আজ অবধি পরেনি আহুরি। নজর রেখে দেখেছে বুদ্ধিরাম। খোঁজ খবরও নিয়েছে। শাড়িটা পরেনি। তবে নিয়েছে ফিরিয়ে দেয়নি, এটাই যা লাভ হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তারপর

একদিন হঠাৎই নজরে পড়ল, সেই শাড়িটা পরে রসকলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাড়িটা কোথায় পেলি?

ভয়ে ভয়ে রসকলি বলল, আহুরিদিদি দিল।

দিল বলেই নিলি?

তা কী করব?

বুদ্ধিরাম আর কিছু বলেনি। রাগটা গিলে ফেলেছিল। মনটা বড্ড উচাটন ছিল কয়েকদিন অপমানে।

দোষত্রুটি মানুষের কি হয় না?

তখন বুদ্ধিরাম তো আর এই বুদ্ধিরাম ছিল না। আজকের এক গেঁয়ো স্কুলের মাস্টার বুদ্ধিরামকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, ইস্কুলে সে ছিল ফার্স্ট বয়। পাশটাও করেছিল জব্বর, দু দুটো লেটার নিয়ে। বিয়ের কথাটা তখনই ওঠে। বুদ্ধিরাম তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ি ঠাকুমা তখন এতটা বুড়ো হয়নি। একদিন আহুরিকে একেবারে কনে-সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল, দেখ তো ভাই, পছন্দ হয়? হলে দেখে রাখি। পাশ-টাশ করে থিতু হলে মালা-বদল করিয়ে দেবো।

আহুরি অপছন্দের মেয়ে নয়। ফর্সা তো বটেই মুখচোখ রীতিমতো ভাল।

কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে, নিত্যি দেখাশোনা হয়। যাকে বলে ঘর কা মুর্গী, তাই বুদ্ধিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, ফুঃ, এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

কেন রে, মেয়েটা কি খারাপ? দেখ তো কেমন মুখচোখ! কেমন ফর্সা।

সাতজন্ম বিয়ে না করে থাকলেও ও মেয়ে আমার চলবে না। যাও তো ঠাকুমা, সঙ বন্ধ করো।

একেবারে মুখের ওপর থাবড়া মারা যাকে বলে। আহ্লাদির খুব অপমান হয়েছিল। তার তখন বছর বারো বয়স। এক ছুটে পালিয়ে গেল। আর কোনোদিন এল না। খুব নাকি গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। দিন তিনেক ভাল করে খায় দায়নি।

বুদ্ধিরামের তখন এসব দিকে মাথা দেওয়ার সময় নেই। চৌদ্দ মাইল দূরের মহকুমা শহরে কলেজে যেতে হয়। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন রকমের জীবন। সেখানে কে একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ভাববার মতো মেজাজটাই তার নেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধিরামের সঙ্গে মেলা মেয়েও পড়ত। তাদের একজন ছিল হেনা। দেখতে শুনতে ভাল তো বটেই, তার কথাবার্তা চাউনি-টাউনিও ছিল ভারী ভাল। কথাবার্তা বলত টকাস টকাস।

বুদ্ধিরাম ছাত্র ভাল। সুতরাং হেনা তার দিকে একটু ঢলল। বছর দেড়েক হেনার সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তবে সেটাকে ভাব-ভালবাসা বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বুদ্ধিরামের আজও সংশয় আছে।

তবে হেনা আর যা-ই করুক না করুক বুদ্ধিরামের লেখাপড়ার বারোটা বাজাল। কলেজের প্রথম ধাপটা ডিঙোতেই দম বেরিয়ে গেল বুদ্ধিরামের। ডিঙোলো খোঁড়া ঘোড়ার মতো। কিন্তু হেনা দিব্যি ভাল পাশ-টাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল।

বুদ্ধিরামের পতনের সেই শুরু। বি এস সি পাশ করল অনার্স ছাড়া। বাবা ডেকে বলল, পড়াশুনোর তো দেখছি তেমন উন্নতি হল না। তা গেঁয়ো ছেলের আর এর বেশি কীই বা হওয়ার কথা!

বুদ্ধিরাম সে-ই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হল না। পাশের গাঁ বিষ্টুপুরের মস্ত ইস্কুলে তখন সায়েন্সের মাস্টার খোঁজা হচ্ছে। বুদ্ধিরামকে তারা লুফে নিল।

বুদ্ধিরামের মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। রাগে দুঃখে দিনরাত

সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে আর পোড়ে। লেখাপড়ায় একটা মারকাটারি কিছু করে বিজয়গর্বে গাঁয়ে ফিরে আসবে, এই না সে জানত। আর সে জায়গায় টিকিয়ে টিকিয়ে মোটে বি এস সি! বুদ্ধিরাম কিছুদিন আপনমনে বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াত পাগলের মতো, দাড়ি রাখত, পোশাক-আশাকের ঠিক ছিল না। আত্মহত্যা করতে রেল রাস্তায় গিয়েছিল তিনবার। ঠিক শেষ সময়টায় কেমন যেন সাহসে কুলোয়নি।

তারপরই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমনি দেখতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু তার মধ্যেই বুদ্ধিরামের জীবনটা একটা মোড় ঘুরল। আম বাগানের ভিতর দিয়ে বিশু আর বুদ্ধি জিতেন পাড়ুইয়ের বাড়ি যাচ্ছিল মিটিং করতে। জিতেন সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে নেমেছে। জিতেনকে জেতানোর খুব তোড়জোর চলছে। বুদ্ধিরাম তখন যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকার জন্য ব্যস্ত। জীবনের হাহাকার আর ব্যর্থতা ভুলতে মাথাটাকে কোনো একটা ভূতের জিম্মায় না দিলেই নয়। নইলে জিতেনের ইলেকশন নিয়ে কেনই বা বুদ্ধিরামের মাথাব্যথা হবে!

আমবাগানে শরৎকালের একটা সোনালী রূপালী রোদের চিকরিকাটা আলো-ছায়া। সকালবেলাটায় ভারী পরিষ্কার বাতাস ছিল সেদিন। ঘাসের শিশির সবটা তখনো শুকোয়নি।

উল্টোদিক থেকে একটা ছিপছিপে মেয়ে হেঁটে আসছিল। একা, নতমুখী। তার চুল কিছু অগোছালো এলো খোপায় বাঁধা। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীর ঢেকেছে। দেখে কেমন যেন মনটা ভিজে গেল বুদ্ধিরামের।

কে রে মেয়েটা?

দূর শালা! চিনিস না? ও তো আহুরি।

আহুরি! বুদ্ধিরাম এত অবাক হল যে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল হাঁ হয়ে। এক গাঁয়ে বাস হলেও আহুরির সঙ্গে তার দীর্ঘকাল

দেখা হয়নি। কারো দিকে তাকায়ও না বুদ্ধিরাম। সেই আহ্লরি কি এই আহ্লরি ?

আহ্লরি মাথা নিচু করে রেখেই তাদের পেরিয়ে চলে গেল। ভ্রুক্ষেপও করল না।

আর সেই ঘটনাটা সারাদিন বুদ্ধিরামের মগজে নতুন একটা ভূত হয়ে ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে ঠাকুমাকে ধরল, শোনো ঠাকুমা, একটা কথা আছে।

কী কথা ?

সে-ই যে আহ্লরি—মনে আছে ?

আহ্লরিকে মনে থাকবে না কেন ?

ওকেই বিয়ে করব। বলে দাও।

ঠাকুমা তার মাথায় পিঠে হাত-টাত বুলিয়ে বলল, বড্ড দেরী করে ফেললি ভাই, আহ্লরির তো শুনছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। হরিপুরের চন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে পরেশের সঙ্গে।

বুদ্ধিরাম এমন তাজ্জব কথা যেন জীবনে শোনেনি। আহ্লরির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তাহলে তো খুব মুশকিল হবে বুদ্ধি-রামের।

সেই দিনই সে গোপনে তার ছু-একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে বসে গেল।

কেষ্ট বলল, বিয়েটা না ভাঙতে পারলে তোর আশা নেই। ভাঙতে হলে সবচেয়ে ভাল উপায় হল চন্দ্রনাথ মল্লিককে একখানা বেনামা চিঠি লেখা।

তো তাই হল। কেষ্ট নানা ছাঁদে লিখতে পারে। তার সাইন-বোর্ডের দোকান আছে। চিঠিটা সেই লিখে দিল।

দিন সাতেক বাদে শোনা গেল, বিয়ে ভেঙে গেছে।

বুদ্ধিরাম ভেবেছিল, এবার জলের মতো কাজটা হয়ে যাবে। সে

গিয়ে ফের ঠাকুমাকে ধরল, শুনছি আহুরির বিয়েটা ভেঙে গেছে। তা আমি রাজি আছি বিয়ে করতে।

ঠাকুমা গেল প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিরাম নিশ্চিন্তে ছিল। এরকম প্রস্তাব তো মেয়ের বাড়ির পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে ঠাকুমা বিরস মুখে বলল, মেয়েটার মাথায় ভূত আছে।

কেন গো ঠাকুমা?

মুখের ওপর বলল, ও ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

বুদ্ধিরাম একথায় এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে বলার নয়। বলল? এত বুকের পাটা? সেই রাতে বুদ্ধিরাম ঘুমোতে পারল না। কেবল ঘর-বার করল, দশবার জল খেল, ঘন ঘন পেচ্ছাব করল। মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে রইল। রাগে ক্ষোভে অপমানে তার মাথাটাই গেল ঘুলিয়ে।

ভোরের দিকে সে একটু ঝিমোলো। ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবল, বহোৎ আচ্ছা। এইরকম তেজী মেয়েই তো চাই। গেঁয়ো মেয়েগুলো যেন ভেজানো ন্যাতা। কারো ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আহুরির আছে, এটা তো খুব ভাল খবর।

সকালবেলায় সে একখানা পেল্লায় সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখে ফেলল আহুরিকে। মেলা ভাল ভাল শব্দ লিখল তার মধ্যে। অন্তত গোটা পাঁচেক কোটেশন ছিল। সবশেষে লিখল—"তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।"

রসকলির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আজ অবধি সে কোনো মেয়েকে প্রেমপত্র লেখেনি। এই প্রথম।

রসকলি ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে বলল, ও দাদা, চিঠিটা যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলল গো।

চুপ! চেঁচাস না! কিছু বলল না?

কি বলবে? শুধু জিজ্ঞেস করল চিঠিটা কে দিয়েছে। তোমার কথা বলতেই খামসুদ্ধু চিঠিটা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বোনের কাছে ভারী অপদস্থ হয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। তবে রসকলি হাবাগোবা বলে রক্ষে।

বুদ্ধিরাম বলল, কাউকে কিছু বলিস না। ভাল একটা জামা কিনে দেবোখন।

তখন অপমানে লাঞ্ছনায় বুদ্ধিরামের পায়ের তলায় মাটি নেই। সারা দিনটা তার কাটল এক ঘোরের মধ্যে। কিন্তু দুদিন বাদে সে বুঝতে পারল, আহ্লুরি যত কঠিনই হোক তাকে জয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তবে বুদ্ধিরাম আর বোকার মতো চিঠি-চাপাটি চালা-চালিতে গেল না। আহ্লুরির ধাতটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

গাঁয়ের মেয়ে। সুতরাং তাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আজন্ম চেনাজানা বুদ্ধিরামের। তবে সে দেমাকবশে কারো বাড়িতেই তেমন যেত-টেত না। ঘটনার পর দিন কয়েক আহ্লুরিদের বাড়িতে হানা দিতে লাগল সে। আহ্লুরির কাকা জ্যাঠা মিলে মস্ত সংসার। বড় গেরস্ত তারা। সারা দিন ক্যাচ ম্যাচ লেগেই আছে। বুদ্ধিরাম গিয়ে যে খুব সুবিধে করতে পারল তা নয়। বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে হয়তো আহ্লুরির কেশো দাদুর সঙ্গে খানিক কথা কয়ে এল। না হয় তো কোনোদিন আহ্লুরির জ্যাঠা হারুবাবুর কিছু উপদেশ শুনে আসতে হল।

চা-বিস্কুটও যে জোটেনি তা নয়। সে গাঁয়ের ভাল ছেলে। খাতির একটু লোকে করেই। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে যাওয়া সেদিকে কিছুই এগোলো না।

কিছুদিন পর সে বুঝল, এভাবে আহ্লুরির কাছে এগোনো যাবে না। মহিলা মহলে ঢুকতে হবে। তা তাতেও বাধা ছিল না। আহ্লুরিদের

অন্দরমহলেও ঢুকতে সে পারে। আহুরির এক বউদি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, হ্যাঁ গো বুদ্ধি-ঠাকুরপো, কোনোকালে তো তোমাকে যাতায়াত করতে দেখিনি। তোমার মতলবখানা কী খুলে বলো তো বাপু, তোমার মুখচোখ ভাল ঠেকছে না।

এ কথায় আর এক দফা অপমান বোধ করল বুদ্ধিরাম। সে পুরুষ মানুষ, কোন লজ্জায় মা-মাসী-বউদি শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে ?

সুতরাং বুদ্ধিরামকে জাল গোটাতে হল।

তারপরই আবার বিপদ। আহুরির ফের সম্বন্ধ এল। চেহারাখানা ভাল, কিছু লেখাপড়াও জানে, সুতরাং আহুরিকে যে দেখে সে-ই পছন্দ করে যায়।

দ্বিতীয় পাত্রপক্ষকেও বেনামা চিঠি দিতে হল। ভেঙেও গেল বিয়ে। কিন্তু তাতে বুদ্ধিরামের যে কাজ খুব এগলো তাও নয়। বরং উল্টে একটা বিপদ দেখা দিল। কেউ যে বেনামা চিঠি দিয়ে আহুরির বিয়ে ভাঙছে এটা বেশ চাউর হয়ে গেল। লোকটা কে তার খোঁজা-খুঁজিও শুরু হল। তৃতীয়বার যখন আহুরিকে পছন্দ করে গেল আর এক পাত্রপক্ষ তখন আহুরির বাপ জ্যাঠা পাত্রপক্ষকে বলেই দিল, বেনামা চিঠি পাবে, আমল দেবেন না। কোনো বদমাশ লোক করছে এই কাজ।

খুব ভয়ে ভয়ে রইল বুদ্ধিরাম। কেষ্ট ভরসা দিয়ে বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? এমন কলঙ্কের কথা লিখে দেবো যে, পাত্রপক্ষ আঁতকে উঠবে।

কিন্তু এই তৃতীয়বার বুদ্ধিরাম ধরা পড়ে গেল। আহুরির সাত সাতটা গুণ্ডা ভাই একদিন বাদামতলায় চড়াও হল তার ওপর। সতীশটা মহা ষণ্ডা। সে-ই সাইকেল থেকে টেনে নামাল বুদ্ধি-রামকে।

বলি, তোর ব্যাপারটা কী ?

কিসের ব্যাপার ?

ন্যাকা! আহুরির বিয়ে ভাঙতে চিঠি দেয় কে ?

আমি না।

তুই ছাড়া আর কে দেবে!

আমার কী স্বার্থ ?

মেজো বউদি বলছিল তুই নাকি আমাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করতিস।

বুদ্ধিরাম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল। সত্য গোপন করার অভ্যাস তার নেই। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা তার আসেও না। সে আমতা আমতা করতে লাগল।

সতীশ অবশ্য মারধর করল না। বলল, যদি আহুরিকে বিয়ে করতে চাস তো সে কথা বললেই হয়। গাঁয়ে তোর মতো ছেলে ক'টা? আর যদি নিতান্তই বদমাইশির জন্য করে থাকিস তাহলে····

বুদ্ধিরাম কেঁদে ফেলেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, বিয়ে করতে চাই।

সাবাশ! বলে খুব পিঠ চাপড়ে দিল সতীশ। বলল, একথাটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো হল। আগে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যবস্থা হল না। পরদিনই সতীশ এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মুশকিল কি হয়েছে জানিস ? তোর ওপর আহুরি মহা খাপ্পা! কী করেছিলি বল তো!

সব শুনেটুনে সতীশ বলল, আচ্ছা, চুপচাপ থাক। দেখি কী করা যায়!

বলা পর্যন্তই। সতীশ কিছু করতে পারেনি। চিড়ে ভেজেনি।

কিন্তু এরপর থেকে আহুরির আর সম্বন্ধ আসত না। এলেও আহুরি বেঁকে বসত।

এ সবই সাত আট বছর আগেকার কথা। এই সাত আট বছর

ধরে বুদ্ধিরাম আড়াল থেকে আহুরির উদ্দেশ্যে তার অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে। প্রতিবার পূজোয় শাড়ি পাঠায়, টুকটাক উপহার পাঠায়, কোনোটাই আহুরি নেয় না। নিলেও ফেলে টেলে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে।

কিন্তু বয়স তো বসে নেই। আহুরির বিয়ের বয়স পার হতে চলল। বুদ্ধিরামও ত্রিশ পেরিয়েছে, কোনো দিকেই কিছু এগোলো না। আহুরির কপাট বজ্র আঁটুনিতে বন্ধই রইল।

ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে এসব কথাই ভাবছিল বুদ্ধিরাম।

বড় রাস্তায় উঠে সে সাইকেলে চাপল। পাঞ্জাবির পকেটে ভারী শিশিটা ঝুল খাচ্ছে। কষ্ট করাই সার হল। কোনো মানে হয়না এর।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাস রাস্তায় কয়েকটি দোকান। আঁধার হয়ে এসেছে। টেমি জ্বলছে দোকানে দোকানে। মহীনের চায়ের দোকানে দু-চারজন বসে আছে। ষষ্ঠী হাঁক মারল, কে রে! বুদ্ধি নাকি?

বুদ্ধি নেমে পড়ল। সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে বসে গেল। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। এক ভাঁড় চা হলে হয়।

ষষ্ঠী একটু বেশি কথা কয়। নানা কথা বকবক করে যাচ্ছিল। সে একটু তেলানো মানুষ। যাকে দেখে তাকেই একটু একটু তেল দেওয়া তার স্বভাব। পুরনো কথার সূত্র ধরে বলল, তোর কত বড় হওয়ার কথা ছিল বল তো! গাঁয়ে আজ অবধি তোর মতো বেশি নম্বর পেয়ে কেউ পাশ করেছে? বসন্ত স্যার তো বলতই, বুদ্ধিরামের মতো ছেলে হয় না। যদি লেগে থাকে তো জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু হয়ে ছাড়বে।

এসবই পুরোনো ব্যর্থতার কথা। বুদ্ধিরাম তা খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ধীরে ধীরে তার আঁচ নিবে গেছে। সে গাঁয়ের মাস্টার হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মাপে ছোটো করে ফেলেছে। সয়েও গেছে

সব। কিন্তু কেউ খুঁচিয়ে তুললে আজও বুকটা বড় উথাল-পাথাল করে।

ষষ্ঠী, চুপ কর। ওসব কথা বলে আর কী হবে!

আমরা যে তোর কথা সব সময়েই বলাবলি করি। চোখের সামনে দেখেছি কিনা। কী জিনিস ছিল তোর ভিতরে।

বুদ্ধিরাম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠল। বলল, যাই। ছাত্ররা সব এসে বসে থাকবে।

যা।

বুদ্ধিরাম সাইকেলে চেপে বড় রাস্তা থেকে গাঁয়ের পথে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাস্তায় হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। তাদের মিটমিটে আলোয় কিছুই প্রতিভাত হয়না। অথচ জ্বলে। লাখো লাখো জ্বলে। তাহলে কী লাভ জ্বলে?

মোট দশ জন ছাত্র তার বাড়িতে এসে পড়ে। মাথা পিছু কুড়ি টাকা করে মাস গেলে দুশো টাকা তার আসার কথা। কিন্তু নগদ টাকা বের করতে গাঁয়ের লোকের গায়ে জ্বর আসে। বাকি বকেয়া পড়ে যায় অনেক। তবু বুদ্ধিরাম সবাইকে পড়ায়। বেশির ভাগই গবেট। দু একজন একটু আধটু বোঝে সোঝে।

পড়াতে বসবার আগে পাতুকে ডেকে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ও বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। তার হাতে দিস।

রসকলির বিয়ে হয়ে গেছে। একটু বয়সকালেই হল। এখন রসকলির জায়গা নিয়েছে বুদ্ধিরামের ভাইঝি পাতু। আতুরি আর বুদ্ধিরামের ব্যাপারটা দু'বাড়ির কারো আর অজানা নেই। সুতরাং না-হক লজ্জা পাওয়ারও কোনো মানে হয় না।

হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে গেল বুদ্ধিরাম। কিছুক্ষণ আর অন্যদিকে মনটা ছোটাছুটি করল না। ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

এই ভুলে থাকাটাই এখন বুদ্ধিরামের কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

যত ভুলে থাকা যায় ততই ভাল। জীবনটা আর কতই বা লম্বা। একদিন আয়ু ফুরোবেই। তখন শান্তি। তখন ভারী শান্তি।

পড়িয়ে যখন উঠল বুদ্ধিরাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ছাত্ররা যে যার লণ্ঠন হাতে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এরপর তার একা লাগবে। খুব একা।

পাতু ফিরে এসেছে। বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কোলের ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

হাতে দিয়েছিস তো!

হ্যাঁ গো।

কিছু বলল ?

না। শিশিটার গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। তারপর তাকে রেখে দিল।

ভাতের গন্ধ আসছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ। কে যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে ছপাৎ ছপাৎ করে। দুটো কুকুরে ঝগড়া লেগেছে খুব। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরাম বাইরের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নার দিকে আনমনে চেয়ে রইল।

না, বেঁচে থাকাটার কোনো মানেই খুঁজে পায় না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরখানা তার। ঘরে একখানা চৌকি, একটা টেবিল আর একখানা বইয়ের আলমারি।

বুদ্ধিরাম চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় একখানা বইয়ের পাতা খানিকক্ষণ ওল্টাল। বইটা কী, কোন বিষয়ের তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বইটা রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নারও কোনো অর্থ হয় না। ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। অথচ বেঁচে থাকতে হবে। এ কী জ্বালা রে বাপ ?

বউদি এসে খেতে ডাকল বলে বেঁচে গেল বুদ্ধিরাম। খাওয়ারও

কোনো অর্থ হয় না। তবু সেটা একটা কাজ। কিছুক্ষণ সময় কাটে। কথাবার্তা হয়, হাসিঠাট্টা হয়। সময়টা কেটে যায়। বুদ্ধিরাম গিয়ে সাগ্রহে খেতে বসল।

খেয়ে এসে বুদ্ধিরাম ফের কিছুক্ষণ বসে রইল চেয়ারে। চেয়ারে বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল, কে জানে।

পাতু এসে জাগাল, ওঠো সেজকা, বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়েছি। শোওগে।

হাই তুলে উঠতে যাচ্ছিল বুদ্ধিরাম, পাতু ফের বলল, আজ ও বাড়ির সকলের মন খারাপ। নিবারণদাদুর অবস্থা ভাল নয়। আহ্লাদি পিসির চোখ লাল। খুব কাঁদছিল।

নিবারণ মানে হল আহ্লাদির বাবা। বুদ্ধিরাম খবরটা শুনল মাত্র। মনে আর কোনো বুজকুরি কাটল না। কলঘর ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। বাপ যদি মরে তো আহ্লাদির মাথা থেকে ছাদ উড়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমলো বুদ্ধিরাম। আজকাল নির্বোধের মতোই সে ঘুমোতে পারে। মাথাটা আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাচ্ছে তো। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। আজকাল তাই গাঢ় ঘুম হয়।

মাঝরাতে আচমকা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাঙল। ভাঙতেই সোজা হয়ে বসল বুদ্ধিরাম। চেঁচামেচিটা অনেক দূর থেকে আসছে। আহ্লাদির বাপের কি তবে হয়ে গেল?

উঠবে কি উঠবে না তা ভাবছিল বুদ্ধিরাম। ও বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী-ই বা আর? না গেলেও হয়। রাতে একটু শীত পড়েছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কাঁথা। সেটা গায়ে টেনে নিতেই ভারী একটা ওম আর আরাম হল। বুদ্ধিরাম চোখ বুজল।

ঘুমিয়েই পড়ছিল প্রায় এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেজদা বলল, বুদ্ধি, ওঠ। নিবারণজ্যাঠার হয়ে গেল। একবার যেতে হয়। ও বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বুদ্ধিরাম উঠল। যারা বেশি রাতে মরে তাদের আক্কেল বিবেচনার বড় অভাব! বলল, যাচ্ছি।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। গাঁসুদ্ধু জেগে গেছে। আজকাল গাঁয়ে লোকও বেড়েছে খুব। রাস্তায় নামলেই বেশ লোকজন দেখা যায়। এই মাঝরাতেও ঘুম ভেঙে অন্তত জন ত্রিশ চল্লিশ লোক নেমে পড়েছে রাস্তায়, আহুরিদের বাড়ি যাবে বলে।

একটা হাই তুলল বুদ্ধিরাম। শরীরটা এখনো ঘুমজলে অর্ধেক ডুবে আছে। শরীরের যেটুকু জেগে আছে সেটাকেও চালানো যাচ্ছে না।

বাইরের উঠোনেই নিবারণজ্যাঠাকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে। চেঁচিয়ে এ ওর গলাকে ছাপিয়ে কান্নার কম্পিটিশন চলেছে। কোনো মানে হয় না। জন্মালেই তো মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গেল! এভাবেই যেতে হবে। সবাই যায়।

গোটা দশেক লণ্ঠন আর দু'দুটো হ্যাজাক বাতির আলোতেও এই ভীড়ের মধ্যে আহুরিকে দেখতে পেল না বুদ্ধি। আহুরি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। চেঁচিয়ে কাঁদবে না, জানে বুদ্ধিরাম। আর সে আসায় হয়তো ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মুখ দেখতেও বুঝি ঘেন্না হয় আজকাল।

মাস চারেক আগে প্লুরুসি থেকে উঠেছে বুদ্ধিরাম। বুক থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে জল টেনে বের করতে হয়েছিল গামলা গামলা। তার ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। কিন্তু সে কথা বুদ্ধিরাম ছাড়া আর কে-ই বা মনে রেখেছে।

শ্মশানে গেলে স্নান করে আসতে হবে। শেষ রাতের শীতে হিম বাতাস লাগবে শরীরে। ডাক্তার ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছিল।

বুদ্ধিরাম একটু হাসল। সে রেল রাস্তায় গলা দিতে গিয়েছিল। মরণকে তার ভয়টয় নেই। একভাবে না একভাবে তো যেতেই হবে।

কান্নাকাটির মধ্যেই কিছু লোক বাঁশ টাশ কাটতে লেগেছে। দড়িদড়া এসে গেছে। বুদ্ধিরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য।

মোড়লদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হচ্ছে। সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠাও আছে। অন্য দলে গাঁয়ের অল্পবয়সী ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি।

আচমকাই—একেবারে অপ্রত্যাশিত, আহ্লরিকে দেখতে পেল বুদ্ধিরাম। উত্তরের ঘরের দাওয়ায় তিন চারজন মহিলা দাঁড়িয়েছিল, সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠামশাইও। আহ্লরি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা বুদ্ধির দিকে তাকাল। গত দশ বছরে বোধহয় প্রথম।

বুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। না, ভুল দেখছে না। হ্যাজাকের আলোয় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাপের মড়া উঠোনে শোওয়ানো। তবু আহ্লরি সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে। একেবারে নিষ্পলক।

আজ বুদ্ধিরামই চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আড়ে আড়ে চাইতে লাগল। মেয়েটার হল কী?

আহ্লরি তার জ্যাঠাইমার কানে কানে কী যেন বলল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে দাঁড়াল। তাতে যেন ভারী ফুটে উঠল আহ্লরি। কী যে দেখাচ্ছে!

জ্যাঠাইমা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

বুদ্ধিরাম অগত্যা এগিয়ে গিয়ে বলল, কী গো জ্যাঠাইমা?

মড়া ছুঁয়েছিস নাকি?

না। তবে এবার তো ছুঁতে হবেই।

কাজ নেই বাবা। বাড়ি যা। গায়ে গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা ছিটিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। তোকে শ্মশানে যেতে হবে না।”

কেন?

কেন আবার! ক'দিন আগে কী অসুখটা থেকেই না উঠলি। ঠাণ্ডা লাগলে আর বাঁচবি নাকি?

আমার কিছু হবে না জ্যাঠাইমা, ভেবো না।

কেন, তোরই বা যেতে হবে কেন? শ্মশানে যাওয়ার কি লোকের অভাব? কত লোক জুটে গেছে। আহুরি মনে করিয়ে দিল, তাই। যা বাবা, ঘরে যা।

আর একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বলল, কে মনে করিয়ে দিল বললে?

আহুরি অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছে। নড়ল না।

জ্যাঠাইমাও আর তাকে আমল না দিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

বুদ্ধিরাম ধীর পায়ে ছেলে-ছোকরাদের দঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধিদা, যাবে তো!

যাবো না মানে?

তা গেল বুদ্ধিরাম। মড়া কাঁধে নেচে নেচে গেল। বহুকাল পরে তার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল আজ। না, প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ নয়। প্রতিশোধের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আজ তার আনন্দ হচ্ছিল একটা অন্য কারণে। ঠিক কেন তা সে বলতে পারবে না।

মড়া পুড়ল। বুদ্ধিরাম কষে স্নান করল নদীর পাথুরে ঠাণ্ডা জলে। দুনিয়ার একজনও অন্তত তার অসুখটার কথা মনে রেখেছে, এখন আর মরতে বাধা কী!

ভেজা গায়ে যখন উঠে এল বুদ্ধিরাম তখন শেষ রাতের হিম বাতাসে সে থরথর করে কাঁপছিল। সবাই কাঁপছে। কিন্তু তার কাঁপুনিটা আলাদা। লোকে বুঝতে পারল না। শুধু বুদ্ধিরামের নিজের ভিতরে যে নানা ভাঙচুর হচ্ছিল তা নিজেই টের পেল সে।

হোঁৎকা সতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী

খেয়াল হতে বুদ্ধিরামের দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁরে বুদ্ধি, তুই যে বড় স্নান করলি ?

করব না তো কী ?

সতীশ মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলল, তোর নাকি একটা অসুখ হয়েছিল ক'দিন আগে।

কে বলল তোকে ?

সতীশ গামছাটা ফটাস ফটাস করে ঝেড়ে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, বেরোবার মুখে আতুরি এসে ধরেছিল আমায়। বলল, বটে, রাঙাদা, বুদ্ধিরামের কিন্তু শরীর ভাল নয়। হিমজলে স্নান করলে মরবে। ওকে দেখো।

বুদ্ধিরাম কোনো কথা বলল না। গলার কাছে একটা দলা আটকে আছে। চোখে জল আসছিল।

সতীশ গা মুছতে মুছতে বলল, তোর আক্কেল নেই ? কোন বুদ্ধিতে এই সকালে স্নান করলি ?

দূর শালা ! আজই তো স্নানের দিন। আজ স্নান করব না তো কবে করব ?

—

চার-পা-অলা টেবিল, তক্তার ওপর আধ ইঞ্চি পুরু তেলচিটে ময়লা, সাইডবাটামে ব্লেড খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অজস্র দাগকাটা হিজিবিজি— 'অমিয়-বেহুলা'—তার ওপর একজোড়া পা। থ্যাবড়া থ্যাবড়া আঙুল, ধুলোয়-মুলোয় খসখসে পা-পাতা, অধিক হন্টনে পদরেখা নিশ্চিহ্ন, শুধুমুধু বুড়ো আঙুলের গালসিতে ধ্যাবড়া দাগ দুটো টিকটিকির মত পড়ে আছে নিথর—দুই বুড়ো আঙুল অনবরত নড়ে, আরেক জোড়া পা।

মুখ দেখা যায় না, টেবিলের তলায় চোখ গেলে আরেকটা চার-পা-অলা চেয়ার, সেই চেয়ারে ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের থার্ডটীচার সদাশিববাবু, মানে আমার বড়দা, এম-ই, বসে বসে আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরায়।

হুটপাট আচমকা বলে, 'এ্যাই এ্যা-ই, ও কি কচ্ছ হে? গপ্প না করে বানান কর'ত—আষাঢ়?' 'আ মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়।'

টেবিলের ওপর দু'বুড়োর নড়াচড়া থামল, মুখ থেকে বইয়ের আড়ালটুকুও সরল, এবার ঠোঁট দুটো ফাঁক—'কী বল্লি?'

বললাম, 'আ মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়।' ঠিক বলেছি, অত ভয় বা কি,—মুখচোখের ভাব এইরকম।

ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাটুকু-ই কেটে কেটে আরেকবার শুনিয়ে দিল বড়দা, যাতে আমার কানেও ঢুকে যায় ঠিকমত। —'আ, মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়?' 'হুঁ-উ।'

আমাদের স্কুলের উত্তরে মাঠ, মাঠ থেকে নামুতে হেঁটে গেলে বিল, তা বাদে নদী, জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশ অব্দি দেখা যায়।

দেখলাম, মাঠ ভেঙে আমার বাবা রুদ্রনাথ, তার ডানহাতের মুঠোয় ধান-শীষে গাঁথা গুটিকতক চ্যাঙমাছ, চান সেরে খড়িওঠা আদুল গায়ে বাড়ি ফিরছে, এই দুপুর দুপুর। একপলক দেখেই ঘাড় ঘুরালাম, ততক্ষণে বড়দা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিধে চোখ রেখে এগিয়ে আসছে, হাতে ঝুনঝুনি বেত—

যাকে বলে চাকুন্দাগাছ, সেই গাছের ছড়ি, মাথাটা ছ্যারকানো, ছাত্রদের মেরে মেরে নয় টেবিলে ঠুকেই মুণ্ডটা ছ্যারকে গেছে!

ক্রমশ পিছু হটছি, চৌকাট পেরুলে দে-দৌড়, বড়দাও দৌড়াচ্ছে, দু' হাত একহাত আধহাত, আর-আরেকটু—

'কী-কী হল? ওকে যে ঠ্যাঙাচ্ছিস বড়?' রাস্তা আগলে দাঁড়াল বাবা। জায়গাটা কাঠের পুলের কাছাকাছি, পুল আর কোথায়, মরাহাজা খালের ওপর মহুলগাছের গুঁড়ি, তার এদিকে বাবা ওদিকে বড়দা, নিরাপদ দূরত্বে আমি।

আচমকা বাবাকে দেখে ভ্যাবাচকা বড়দা তো-তো করে বলে, 'বানান ভুল করেছে!'

'কী বানান?'

'আষাঢ় করেছে—আ মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়।'

'অঃ।' বলেই বাবার দুমদাড়াক্কা কোশ্চেন বড়দাকে, 'আর তুই, তুই বানান করত—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।'

বড়দা কী আর পারে, অপরাগ বড়দা হেঁটমুণ্ডে রাগে গরগর কত্তে কত্তে ফিরে চলেছে স্কুলে, আর—

বাবার আগে আগে ছাগলছানার তুল্য তিড়িঙ-বিড়িঙ লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরছি আমি।

—এই করেই ত প্রাইমারীটা হয়ে গেল।

MERCURY বানান হল—M-E-R-C-U-R-Y, খটোমটো না, খুব সহজ বানান, যে কেউ করতে পারে, আমি কিন্তু পারলাম না।
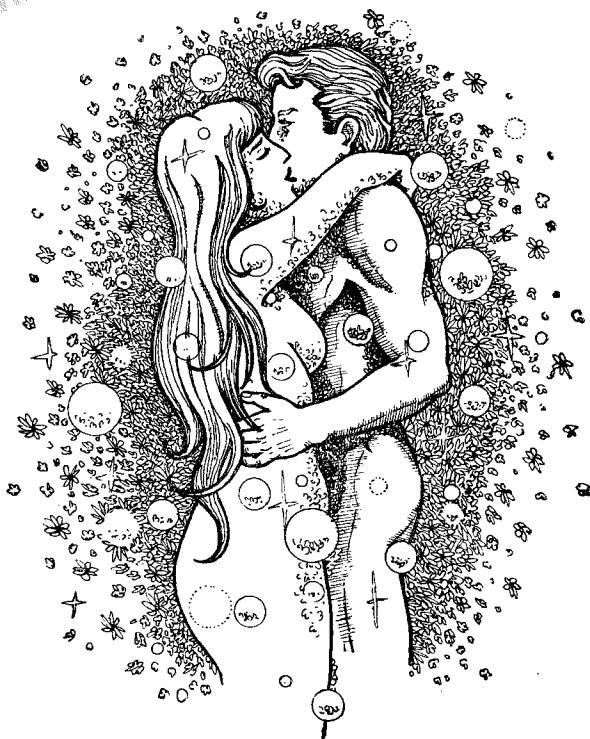
শিল্পী– অঞ্জন ঘোষ

ডাস্টার ছুঁড়ে কেমিস্ট্রির রাগী মাস্টার বিজয় মহাপাত্র মহাক্রোধে ফেটে পড়ে বলে, 'ইডিয়েট!'

খানিক চুপ থেকে তর্জনী তুলে গর্জন করল, 'হ-ত-ভা-গা, রসায়নে তুই পাবি শূন্য, ডাব্‌ল্‌ জিরো-ও।

লম্বা-চওড়ায় ছোটখাটো, হাড় জিরজিরে, কিন্তু দাপটে দোর্দ্দণ্ড, বিজয়বাবু খুব গুণী লোক ছিল।

ফাংশান-টাংশান হলে ছাত্রছাত্রীদের গানের তালিম দিত, আমার মত গেঁয়োভূতকেও একদা হাতমুখ খামচে ধরে বসিয়ে দিল হারমোনিয়ামের সামনে,' নে ধর—

'এখন আর দেরী নয়, ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো।' —সেই বিজয়বাবু, রোগা-পটকা গুণী লোকটার ক্লাস, বোর্ডে প্লাস-মাইনাস কী সব কত্তে কত্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চাঁদু, বানান কর ত'—MERCURY ?

কথায় কথায় একে-তাকে 'চাঁদু' বলা তার বদ-অভ্যেস, প্রথম চাঁদটা-ই সুধন্য।

কাঁপতে কাঁপতে সুধন্য বানান বলল, ভুল।

ভুল ভুল, ভুল!

আমি তখন আপনার মনে আওড়াচ্ছি, খুব পারব, ও ত ভারী সোজা! একে একে হিমাংশু, শশধর, শিখা, সমরেশেরও হয়ে গেল, কে যে ভুল বলল কে যে ঠিক—ততক্ষণে গুলিয়ে ফেলেছি।

ডাস্টার ঠোকাঠুকির আওয়াজ, দ্রুত থেকে দ্রুত হচ্ছে, লাস্টঅব্দি আমাকে, 'অ্যাই, তুই বল ত!'

বললাম, 'M-E-R-C-U-RR-Y'।

সেই আমি, হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে ইস্কুল টপকে এলাম।

কলেজে এসেও ছাড়-ছাড়ান নেই, লে বাবা, 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে প্রথম সর্গ দ্বিতীয় সর্গ, ইত্যাদি—সেই 'সর্গের' বানান কি বল-অ?

॥ দুই ॥

'বলতে লজ্জা কচ্ছ, আ-রে বলই না।'

'কী বলব মনঞ্জনদা?'

'এই তোমাদের ভাবভালবাসার পসঙ্গ।'

'একদম বাজে কথা।'

ডানহাতের এক আঙুলে দাঁতে গুড়াখু ঘষে আর বলে, 'হুঁ', কথা ত বাজে, মাত্তর ক'মাস, এই কদিন কলেজ করেই যা কিত্তি দেখালে!'

চার ফুট, কি বড়জোর সাড়ে চার—এই একটুকু হাইটের মনোরঞ্জন, থার্ডইয়ার, পাঞ্জাবি-পাজামা পরে যায় আর কলেজ করে, তার বেশি চিত্র-বৈচিত্র নেই কোনও।

এর-তার প্রেমের প্রসঙ্গ শুনলে আহ্লাদে গুড়াখু মাজে, দাঁতে-আঙুলে আওয়াজ হয়—চিকচিক। রোগ আর কি।

'এই করেই আঙুলগুলো যাবে, দাঁতেরও বারোটা।'

'হুঁ।'

'কী হুঁ?'

'যাও ত যাও, আজ তোমার টিউশুনি—নেই?'

'থাকবে না কেন!' মনোরঞ্জনদাকে রাগিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ি, এই আমার রুম-মেট, মানুষটা বড় ভাল।

'রূপছায়া' সিনেমা হলের ডানদিকে জগুবাবুর খাটাল, গরু-মোষের কাজকারবার, বড়ামারা-ঝাড়গাঁ লাইনে বাবুদের বাস চলে। এই খাটালের পশ্চাতে অমুক পার্টি অফিস, ছোটমত ঘর, তার গর্ভে আমাদের বসবাস।

বাবু হয়ে বসে বসে মনোরঞ্জন কামিল্লা যখন ফেস্টুন লেখে—

'চলছে চলবে'—তখন খুব ইচ্ছে করে আর দুটো 'না' বসিয়ে লিখে রাখি. 'চলছে না চলবে না'।

দ্যাখো মনঞ্জনদা, ঠিক একদিন লিখে ফেলব, তুমি ঘুমোও! এই ভাবতে ভাবতে 'ছবিঘর' এখানে মাত্র পাঁচ টাকায় কোট-টাই আর চশমার ফ্রেম পরে ছবি তুলেছি, সে ফটো আছে।

এবার চুলগুলো উল্টে আঁচড়াব, সাইকেলের পিঠে বসে থেকেই ডানহাতের চেটোয় আচমকা উল্টে চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি করলাম।

এর পরেই ত বড় রাস্তা, উত্তর থেকে দক্ষিণে পাতা আছে, দক্ষিণে যাও ঝাড়েকগ্রাম রাজকলেজ, আর উত্তরে—

আট দশ মিনিট সাইকেল চালালে সাঁইবনী ঝোপ আর বামদা ফরেস্ট কলোনী, কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়াতেই লীলাবতীর মা বলল, 'এসে গেছ বাবা!'

'হুঁ এলাম।'

বলে আচমকা চোখ গেলে ঝাঁকড়া সীমগাছটার নীচে, ঐখানেই একটা সাপ—সারা দেহে বুটিবুটি, হাতদেড়েক লম্বা—খুব বেরিয়েছিল এক বৈকালে, হাওয়া খেতে।—'সাপ! সাপ!' চিৎকারে ঘাড় তুলে দেখি, মহারাজ। 'দাঁড়াও'—মারবার ফন্দি খুঁজছি, লীলাবতী বলল, 'ঠিক পারবেন ত?' 'না পারার কী আছে!' ঘরে আর কেউ পুরুষ-মানুষ ছিল না, লীলার মা বলেছিল, 'দ্যাখো বাবা, মাল্লে মারো আঘাত দিয়ে ছেড়ো না।' 'মাসিমা এক আঘাতেই থেঁতলে যাবে দেখুন না!' উঁহুঁ, হাতের লাঠি লটকে থাকল হাতে, মহারাজ বুকে হেঁটে নির্ভয়ে গেলেন।

হাত মস্কে ফিরে এলাম টেবিলে, লীলা খুব হেসেছিল।

ঐ সেই সীমাবৃক্ষ তার নিচে পুরুষত্ব আমার দেড়াসুদে বন্ধক রয়েছে, হুঁ কবিতা!

লীলার মা বলল, 'ও যে একটু যাবে।'

'কোথায় ? কে মাসিমা ?'

'লীলা আজ একটু বেরুবে, মার্কেটিং-এ।'

'বেশ ত যাক, না হয় পরে আসব।'

মাসিমার চটপটে জবাব, যেন তৈরি ছিল, 'তুমিও যাও না বাবা সঙ্গে, কী আছে, দাদার মত।'

হাঁ-না চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, সেজেগুজে লীলাবতী ছুটে এল মায়ের কাছে, বুকে আলতো কিল মারল, মা-মেয়েতে কী সব কথাবার্তা, মেয়ের থুতনি নেড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে মা বলল, 'ঢঙ, তুই যা ত।'

শালার সাপটাকে একবার পেলে হয় এখন। দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে করব ছুটুকরো, কাঁচামাংস খাব। সেদিন খুব ফক্কি দিয়ে মাজা দুলিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে হে দন্তবিষো।

এই প্রথম, লীলাবতী আমার সঙ্গে রাস্তায় এই প্রথম, তার বড় লজ্জা, ছরকে-ফরকে হাঁটে।

এক বুড়ো ফরেস্টার সাইকেল চালিয়ে অফিস থেকে ফিরল, কলোনীর গেটমুখে দেখা, তার ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠে থাকল কপালে, বিদ্রূপ হাসছে। যাও ত যাও, কাজ করো গে', গিয়ে ত খাকী হাফ-পেন্টুল চড়িয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মাঠময় দৌড়ুবে।

ফিতে আঁটা জুতোর তলায় বছর ষোলর ফটাফট আওয়াজ, কালো বেণী হিসহিসিয়ে পিঠের ওপর আছড়ে ফেলে হাঁটে, লীলা খুব সেজেছে। সাজো গো সাজোবালা!

বাটিক প্রিন্টের শাড়ি তার ওপর ম্যাচিং ব্লাউজ, ম্যাচ করা টিপ, হাতে দার্জিলিঙের বটুয়া।

'আজ কোন্ দোকানে, লীলা ?'

'রকমারি।'

জুবিলী মার্কেটের অলি-গলি রাস্তা, সার সার দোকানপাট, লোক-জনের ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা।

চেনা মানুষ চোখে এলে চোখে-মুখে গর্বের হাসি, বলতেও ইচ্ছে করে আগবাড়িয়ে, ছাখো ছাখো, কার সঙ্গে আজ বেরিয়েছি।

কেউ কেউ বলল, 'কী হে? কীরকম আছ?'

'একপ্রকার আছি।' বলেই চোখ তুলে লীলাবতীকে দেখাই, বাটিকপ্রিণ্ট ছলর-বলর হেঁটে চলেছে।

দাবনায় আলতো ঘুষি মেরে বন্ধুমানুষ সরে পড়ল, আরেকটু এগিয়ে বাঁদিক ঘুরলেই 'রেডী-মেড' কাপড়ের দোকান, তার মধ্যে 'রকমারি'।

সামনে পুজো, 'রকমারির' বাহার খুব, রঙচঙে আলোর রোশনাই, এই বৈকালেও এক-কে আর লাগছে।

ঢ্যাঙা সিড়িঙ্গে কর্মচারী লোকটা গাল চুলকে বলল, 'কত? চৌত্রিশ?'

'হুঁ-উ।'

'তাই ছাখা।' সুন্দর করে ছাঁটা পাকা গোঁফ নিয়ে বুড়ো কত্তা বসে আছে, কাঠের মই বেয়ে আরেকজন ফুড়ুক-ফুড়ুক দোতলায় উঠল।

উঠুক।

কাউণ্টারে অল্প-স্বল্প ভিড়, বেঞ্চি ত খালিই, বসলে হয়। সেই দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ব্লাউজের বাণ্ডিল ঘেঁটে চলেছে লীলা।

ঘাঁটুক।

খুব ফাণ্টা দেখিয়ে বসে পড়লাম বাবু হয়ে, আর বসতেই বাজখাঁই আওয়াজ—'সরে ভস্।'

নাকে নথ, হাতে মকর মুখী বলা, কানে কানপাশা, মোটা খোম্বা মাঝবয়েসী একটা বউ হাত-পা ঝেড়ে চিল্লোচ্ছে, 'লাজ-লজ্জা নাই?'

'তার মানে?'

পায়ের চটি খুলে পড়ল, চাকর টাইপের আরেকটা লোক কাঁধের গামছা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ফের চটি পরিয়ে দিল পায়ে, ততক্ষণে নাকের নোলক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে, রাগে।

নথ নেড়ে বলে, 'আ-রে পুরুষ, ঘাড়ের ওপর ভসে পড়লি!'

কম করেও আধ হাত ফারাক, তা সত্ত্বেও বউটা এসব বলে কী! এই প্রথম, লীলাবতী আমার সঙ্গে রাস্তায় এই প্রথম, আর আজকেই—রাগে দুঃখে চোখ ফেটে জল এল, বুড়ো কত্তা দেখছে, লীলাবতী দেখছে, দু'চারজন বাইরের খদ্দেরও জড়ো হচ্ছে,—ওঠ, জ্বলে ওঠ পুরুষত্ব আমার! জামার আস্তিন গুটিয়ে আচমকা মাকড়ার মত তড়পে উঠি, 'হ্যাঁ, এ কী কথা! ইয়ে-ইয়ার্কি পেয়েছেন? যা খুশি বললে হল, কী ভেবেছেন?'

'খুঃ' বলেই মোটা থোম্বা বউটা তার নথ সুদ্ধু নাক বাঁ থেকে ডানে সপাটে ঘুরিয়ে নিল, আর দেখি কি—পুরুষত্ব আমার মুড়মুড় করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বউটার গা ভর্তি গয়না, 'রকমারির' বুড়ো কত্তা তার পক্ষ নিয়ে খুব তোয়াজ করল, আমার মত ফেকলুর হয়ে কথা বলতে তার দায় পড়েছে!

এদিন রাস্তায় লীলাবতী আর একটি কথাও বলল না।

॥ তিন ॥

না বলুক, মহালয়ার দুদিন আগে একটা ভাঙাচোরা ট্রানজিস্টার রেডিও টেবিলের ওপর ধপ্ করে বসিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'যাবার সময় নিয়ে যাবেন।'

'কোথায়?'

'জানি না।'

এটা-ওটা দেখছি নেড়েচেড়ে, হতভম্ব; লীলাবতীর মা এসে মুখ করল, 'মেয়ের কথার কি ছিরি! না গো বাবা, আর কাকে বলব। তুমি বলে বলছি, রেডিওটা সারিয়ে এন্নো ত।'

'এ আর এমন কী কাজ, মাসিমা।'

'তা হলেও, খারাপ হয়ে পড়ে আছে, একে-তাকে বলি—'

'আর বলতে হবে না, কালকের মধ্যে—

'হুঁ-উ, তা না হলে ত মহালয়াটাই—বীরেন ভদ্দের 'যা দেবী সব্বভূতেষু' কী ভাল যে লাগে বাবা।'

বগলে রেডিও, আরেক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল, দ্রুতপদে 'তার-বেতারে' এলাম, ভুঁড়িঅলা দোকানদারকে বলি, 'আজকের মধ্যে হবে না?'

চ্যাপ্টা, ডিম্বাকার, লম্বাটে, মিনি-ধুমসো, কম করেও পঞ্চাশটা, সব নাড়িভুঁড়ি বের করা—দুজন ছোকরা মত কাজের লোক তার জুড়ছে।

'কি, হবে না?'

'অন্য দোকান দেখুন, আর ভাই পারছি না।'

'পাত্তে হবে, আরেকটা ত দাদা।'

'বেশ পরশু আসুন।' গাদার ভেতর বড় অবহেলায় দোকানদার লীলাকে আছড়ে ফেলল।

'পরশু?' কত যেন হিসেব করে বলি, 'থাকছি না, কাল হবে ত বলুন।'

'চার্জ বেশি পড়বে।'

'কত?'

গাদা থেকে ফের লীলাবতীকে তুলে এনে খুলে খালে দেখল ভুঁড়িঅলা, বলল, 'নেই কিছু, কমসে কম ত্রিশ টাকার ধাক্কা।'

'থাট্টি-ই দেব।'

পুনরায় গাদার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল দোকানদার, তার হাত ধরে বললাম, 'একটু কেয়ার নিয়ে রাখুন।'

বিছানো লাল নুড়ি পাথর, দুধারে চারানো আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া, বামদা ফরেস্ট কলোনির রাস্তা-ই এই।

খেলার মাঠের ভাঙা ইটের দেয়ালে পোড়া কাঠ কয়লায় কী সব অসভ্য লেখা, একটা গিরগিটি থাপার-থুপুর চার পায়ে তার খানিকটা ঢেকে রাখল, খানিকটা এখনও পড়া যায়।

না-না করেও পড়ে ফেললাম, পড়তেও লজ্জা, চলন রাস্তায় কে যে এসব লেখেটেখে! প্রায় দুপুর, হাতে রেডিও, সাইকেল চালিয়ে মহানন্দে কলোনীর চৌহদ্দিতে ঢুকে আসি।

সরকারী কুয়োয় দু'চারজন ডোরাকাটা বেড-কভার সাবান জলে ভিজিয়ে কাচছে থাপুস-থুপুস।

'ম্যাল, ভাল করে নিঙড়ে ক্লিপ এঁটে ম্যালে দে।' লীলাবতীর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠিকে-ঝিকে বলল।

বেঁটেখাটো ঠিকে-ঝি, ঠিক পাত্তা পাচ্ছে না কাপড় শুকোনো দড়িটার, বিস্কুট-দৌড়ের বাচ্চাদের মত লাফাচ্ছে।

এক হাতে ট্রানজিস্টার, সাইকেলের পিঠে বসেই আরেক হাতে দড়িটাকে টেনে ধরলাম, পাত্তা পেয়ে ঠিকে-ঝি মুচকি হাসল, তার পায়ের কাছে এখনও এক বালতি।

লীলার মা বলল, 'এই ত, এসে গেছ বাবা। নিঙড়ে নে, নিঙড়ে, অত জল! হাত তাড়াতাড়ি চালা।'

বলেই বলল, 'অনেক করেছ, আর কষ্ট কত্তে হবে না বাবা, দাও আমাকে।'

রেডিও ফেরত দিয়ে বলি, 'এ আর কষ্ট কি!'

'কষ্ট না? মহালয়া শুনবে ত বাবা? বীরেন ভদ্দের 'যা দেবী সব্বভূতেষু' কী ভাল যে লাগে!'

'রেডিও নেই, মাসিমা।'

'তাতে কি, আমাদের এখানে এসো, তুমি ত ঘরের ছেলের মত।'

'সে আর বলতে।'

মনোরঞ্জন কামিল্লাকে বলা হয়নি, আজ রাত্রে যাব, কালকের ভোর মহালয়া। মন বড় অস্থির পঞ্চম।

চোখ বুজি ত বাঁকা রামধনুকের তুল্য দাগ, পিছু হটতে হটতে অতি বড় খাদের গর্ভে গিয়ে ঠেকে, আর ঝটকা মেরে ভাত-ঘুমটাও ভেঙে যায়।

তো ফের শুরু করি, এক এক্কে এক, এক দুগুন্নে দুই, এক তিন্নে তিন—এই করে শেষ অব্দি ঢলে পড়লাম ঘুমে, ঘুম বড় মহাশয়।

যখন ভাঙল, রঙচটা সাইকেল হাঁকিয়ে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, ঝাড়েক গ্রামের রাস্তায় ঘোড়ার বেগে দৌড়ুলাম।

জনমানুষ নেই কোথাও, দুটো-চাট্টা কুকুর যা এদিক-ওদিক ছিটকে ছিটকে পড়ল, জীবগুলোর এমনি চিৎকার যেন গাড়ির সামনের চাকা তাদের বাঁকা ল্যাজের ওপর দিয়েই গেছে, আর দুয়েকটা ত রাজার মত গেল।

টুকরোটাকরা আলোর উপস্থিতি, ঢুলু ঢুলু ঘুম-চোখে উঠে এলে কি র'ম দেখতে লাগবে, লীলাকে? গেট খুলবে কে?—মাসিমা?

রাতচরা দুটো পাখি ডাকাডাকি শুরু করল, শুনলে মনে হবে পরস্পর বলছে, এই-তুই-যা, এই-তুই-যা—

চুপিসাড়ে গেলাম, কাঠের দরজায় ঘষা লেগে সামনের চাকার কিছু ধুলো খসে পড়ল ঝুরঝুর, এবার ডাকতে হয়!

'মাসিমা'

'ও মাসিমা!'

'লীল্লা।'

'শুনতে পাচ্ছেন, মাসিমা?'

'আমি—'

কড়াও নাড়লাম, চরাচর চুপচাপ, আরেক কিস্তি ডাকতে গিয়ে মনে হল, ধুর, আমি কি আদেখলা?

মনে হতে ফের চাকা ঘুরল সাইকেলের, স্পোকের মধ্যে কিছু না-কিছু একটা জড়িয়েছে!

ফিরে যেতেই জড়তা, খপাং করে লাথি ছুঁড়লাম মাডগার্ডে, টাল খেয়ে সামান্য দুমড়ে গেল।

আর সেই কিছু জড়িয়ে থাকার ফরফরানি আওয়াজটা নেই, সাইকেল দিব্য চলে।

জোরসে, আরো জোরসে চালিয়ে জগুবাবুর খাটাল পেরুলাম, আর ক'গজের মধ্যে ত পার্টি অফিস-মেস, মনোকষ্ট বড়।

মেসের সম্মুখভাগ সামান্য উঁচু, গায়ের জোরে এক হেঁচকায় সাইকেল সুদ্ধ উঁচু জায়গাটা ডিঙোব, আর পা ফস্কে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটে গেল আচমকা।

বাঁ বগলের এক বিঘৎ নিচে সাইকেলের হাড় ঢুকে বসে আছে, রক্তারক্তি কাণ্ড, যন্ত্রণা বড়।

বড় দাগা দিলে হে, লীলাবতী।

॥ চার ॥

দাগটা কিন্তু আছে, বাঁ কাঁধের ওপর বাঁ গাল চেপে ধরলে চোখের দৃষ্টিতে পষ্ট উঠে আসে দাগটা।

তবে সে আড়ষ্টতা নেই, বাজার-হাট করি, লীলাবতীকে পড়াই, মাঝে মধ্যে থেকেও যাই, খুব খাওয়া-দাওয়া হয়।

একদিন ত তুমুল বৃষ্টি, লীলার বড়দা রেইন কোট গায়ে চড়িয়ে অফিস বেরিয়ে গেল, জানলায় হাত গলিয়ে লীলা বলল, 'বিষ্টি বাদলায় চুপচাপ বসে থেকে জবের ছাঁট ধরাই হবি, কী ভাল যে লাগে!'

'আমার বাপু খিচুড়ি আর—' কথা অর্ধেক রেখে লীলাবতীর মা

জানলা টপকে পানের পিক ফেলল, জলে মিশে একাকার হয়ে আসে খানিকটা টপাৎ-লাল।

'আর, ডিম ভাজা? তাই হোক না মা, হোক।' মেয়ের চোখ-মুখে সুখ-সুখ।

মা বলল, 'ডিম ত নেই, ডাল খানিকটা শট আছে।'

'যাঃ' মুখ ঘুরিয়ে লীলা জলের ধারা নিয়ে পড়ল, ধারাপাত প্রবল। সত্বর ছেড়ে যাবে তার কোন ভরসা নেই, তবু আকাশের হাবভাব দেখে নিয়ে বলি, 'কী আনতে হবে বলুন, এনে দিচ্ছি।'

'বিষ্টি যা!'

'ভাববেন না, ওর'ম কত-অ ভিজেছি।'

'তা হলেও—'

দোনোমনো লীলাবতীর মা আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বলে, 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে কী বুঝি না।'

ঠিকই বোঝেন, নিজের মনে কপচে ধুম-বৃষ্টির ভেতর বেরিয়ে পড়লাম, এখান থেকে বাজার কম করেও দেড় মাইল।

দমকা হাওয়া আর বৃষ্টি, ছাতা নিয়ে গাড়ি চালানো-ই ঝঞ্ঝাট, ছাতা থাক অতএব।

ঝড়ো জলের দাপট চাকার গতিমুখ ঠেলে ঘুরিয়ে দিতে খুব চালাচ্ছে ছলাকলা, সামান্য শীত-শীত ভাব।

এই বৃষ্টি বাদলায় কে আর বাজার করতে আসে, যা মাথা তার থেকে ছাতাই বেশি, কালো কালো ভুসভুসে খইচালা।

ডাল ত নিলাম, এবার ডিম; ডিম কিনতে যেতে হবে সেই আলু আনাজপাতির ওদিকটায়, ঝরছে ত ঝরছে!

একটা নধর-গতর শূয়োর ভিজতে ভিজতে ড্রেনের ধার দিয়ে দৌড়ুল, তার পশ্চাতে দুটি নাদুস-নুদুস বাচ্চা, বাজারের নাবালক জীব সব, দেখেও আনন্দ। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল ডিম কিনেই ফতুর,

ছ জোড়া হাঁসের ডিম এক টাকা চল্লিশ, আর কিছু কেনার নেই।

বাজার থেকে বেরুব আর দেখি কি, এক থুত্থুড়ে বুড়ি কচুপাতায় বেলী ফুল সাজিয়ে বসে আছে, বিক্রী করবে।

মুখের রেখা কুঁচকে-মুচকে কদাকার, তার মধ্যে এই ছোট ছোট কাঁচের গুলির মত চোখ ছুটো চোখে পড়েও পড়ে না।

হাতে-পায়ে হাজা, হাজায় জল লাগলে জ্বলুনি হয়, বুড়ি যেন জল খাওয়াচ্ছে ঠুসে ঠুসে, কত খাবি খা!

খাড়া বৃষ্টির নিচেই বসেছে, বাজেপোড়া গাছের ওপর ছড়-জল নির্দয় যেরূপ, বুড়ির ওপর তেমনি ধারা অপঘাত, শীতে অঙ্গ কাঁপছে ঠকঠক।

'সরে বসলে ত হয়, শুধুমুছু ভিজছ?'

আরেকটু হলে সামনের চাকা কচুপাতায় ফুলগুলিকে থেবড়ে দিত, সাবধান হয়ে বলি, 'কত?'

'আনা চাইরেক দিবি।'

প্রায় চাবকে সাইকেলটাকে ছুটিয়ে আনলাম বামদা ফরেস্ট কলোনীর ভেতর, দেখেই লীলাবতীর মা বলল, 'এ-হে, ভিজে একদম ঝড়ো কাক হ'য়ে গেছ বাবা!'

না, দাঁড়কাক, আপনার মনে বলতে বলতে ডাল-ডিম নামিয়ে রাখলাম, ডাল খানিকটা ভিজে ছিল, নখে টিপে লীলাবতী মুচকি, 'আধধেক সেদ্ধ মা, বাঁচা গেল, তোমাকে বেশি খাটতে হবে না আর।'

'একটা টাকা দেন ত, মাসিমা।'

মা-মেয়ের চার চোখে কথা হচ্ছে, বললাম, 'দ্যান, ঘুরে এসে বলছি। গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে রাখলাম।

টাকা নয়, ছ'ছুটো আধুলি দিয়ে-থুয়ে লীলাবতীর মা বললে,

'আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের বুঝি না, কী সুখে যে আবার ভিজবে বাবা!'

বুড়িটা হেসে-খেলে ভিজছে, খাড়াখাড়ি বৃষ্টিবাণ, আর কোন হিন্দোল নেই, ফুলগুলি তেমনি আছে, একটাও বিকোয়নি।

দুটো আধুলি দিয়ে অল্প কিছু ফুল নিলাম, বাদবাকী ও বেচুক, আরো দুটো পয়সা পাক।

বলার মধ্যে বলেছি, 'যাও, কারুর দোকানঘরের আটচালায় উঠে পড়ো, এভাবে ভিজলে আর দেখতে হবে না!'

বলেই বড় সুখে লীলাদের বাসায় ফিরে এলাম, আজ এখানেও বড়ো সুখ—খিচুড়ি আর ডিমভাজা।

রান্নাঘরের দোরগোড়ায় শুকনো জামাকাপড়ে বাবু হয়ে বসে গল্পটা আগাগোড়া বলে ফেললাম।

তাতে আরেক কাঠি রঙও চড়ালাম, 'আসলে কি জানেন মাসিমা, ওই বৃদ্ধের মুখের কুঁচকানো-মুচকানো রেখার ভেতর গোটা একটা ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখেছি!'

শুনে ত লীলাবতীর মা মেয়েকে উস্তত-খুস্তন করে, আর বলে, 'মা রে, শুধুমুদু ছেলেটাকে ওর'ম করিস, ছেলে কিন্তু ভাল।'

॥ পাঁচ ॥

হুঁ ভাল-ই, খুব ভালমত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো, চড়ুইপাখির তুল্য লীলা এ-ঘর ও-ঘর করে।

এটা-ওটা উল্টায়, মন গেলে একদৃষ্টে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।—'কি হল, কী দেখছ?'

আর কথা নেই, ঘাড় নিচু করে পিঠের ওপর পড়ে থাকা বাসি

বেণীটাকে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, জলদি হাতে চুলের ভাঁজগুলো খুলে ফেলল, গাডারটাও।

ফের ধীরেসুস্থে বাঁধা, গার্ডার আটকে চুলের ডগায় সামান্য থুতু—ঝটকা মেরে ছুঁড়ে ফেলল, যে কে সেই।

কাঁধের দুদিকে ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'রেডিওটা খুলুন ত।'

'কী এখন খবর?' বলতে বলতে খুললাম, রেডিওতে সত্যই খবর হচ্ছে।

"এইমাত্র পাওয়া খবরে প্রকাশ, খানসেনাদের প্রবল প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে মুক্তি ফৌজ ঢাকা—"

আর কি, দু'হাত তুলে প্রায় নাচতে নাচতে লীলাবতী দৌড়ুল, 'মারেন্মা, শুনেছ? শুনবে ত এসো।'

'জয় বাঙলা! জয় বাঙলা!!' মা মেয়ে পরস্পর গলা জড়িয়ে বারান্দায় কাঁদতে বসল, কপালের সিঁদুরটিপ ধেবড়ে উঠে গেছে মাথায়, উড়োখুড়ো চুলের মধ্যে আটার ভুসি, কী যে আনন্দ!

এই লোকগুলোর দেশ ওপারে, ফকফকিয়ে ভোর হবার মত দেশটা খরখর স্বাধীন হচ্ছে।

তার আগেই হাজারে হাজারে ভয়ে-ত্রাসে বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে এদেশে আসছে হুহু, উঠে দাঁড়িয়ে লীলাবতীর মা বলে, 'জানলে বাবা, নব্বই বস্‌সরের বুড়ি শাউড়ি এখনও ওই দেশে, এই তালে যদি আসেন।'

চিঠি এল, জলপাইগুড়ির রাজাভাত খাওয়া থেকে লীলাবতীর বাবা লিখেছে, 'আমার মাতাঠাকুরানী গত পরশু পদধূলি দিয়াছেন, তুমি চিঠি আসামাত্র অবিলম্বে আইস।'

তাড়াহুড়োয় লীলার মা তার স্বামীর কর্মস্থল রাজাভাত খাওয়া রওনা হল, স্কুল আছে বলে মেয়ের যাওয়া হল না।

ভাবলাম, রসেবসে ক'দিন ভালই কাটবে, এই সংসারের দায় ত' এখন থেকে আমার।

ওই এক লোক, লীলার বড়দা, খায়-দায় পানটি মুখে ঢুকিয়ে অফিস করে, কী থাকল সংসারে—অত শতর অঙ্ক কষা তার ধাতে নেই, ধর্তব্যেও রাখল না।

'কী মাছ আনব, বড়দা ?'

'ঐ যে গরাসে-গরাসে মাথা!' তার মানে চুনোমাছ কিনে আনার ফরমাস, সাধ হয়েছে প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়ো খাবে। খুব চটকদার লোক, আছে ফূর্তিতে।

অতএব রোজ চালের ড্রামে বগলঅব্দি ডানহাত গুঁজে রেখে দেখি, আর কদ্দিন! ফুরিয়ে গেলে চাল-পাইকারকে বলতে হয়, 'ত্থান, এম-ও (মনি অর্ডার) এলেই শোধ করব, চেনাজানার মধ্যে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ত বটেই।'

আছে সুখে লীলাবতী, সময় সময় দু'হাতে কানের লতি টেনে খুলে ফেলে কানপাশা, ডাঁটি ধরে নাড়াচাড়া চলে, ফের কানের ফুটোয় উঠেও যায়। 'ডিজাইনটি বেশ।' তোয়াজ করে বলি।

লীলা হাসে, 'মনে করে খামটা কিন্তু আনবেন।'

'হুঁ', ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বললে না ত—কার নিকট লিখলে ?'

'জানি না, যান।'

'খাম-পোস্টকার্ড কিনে ঘরে এলে লীলা গেট ছেড়ে অনেকটা দৌড়ে আসে, হাতে নিয়ে ফের দৌড়ুতে দৌড়ুতে গেল।

বারান্দায় খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে বসে, অতঃপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।—'কি অত ত্থাখো ?'

নট নড়ন-চড়ন, ডাকটিকিটে মন, দেখেটেখে লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলে, 'কী যন্তন্না বলুন!'

'কিসের কি ?'

খামপোস্টকার্ডের গায়ে পাঁচ পয়সার এক্সট্রা টিকিট সাঁটা আছে রিফিউজি রিলিফের।

ছবিতে বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে তিনজন শরণার্থী, দুটো বাচ্চা, দেখতে দেখতে বলে উঠি, 'ও, এই জন্য।'

এর দিনকতক বাদে, একদিন খুব আহ্লাদে আসছি কলেজ করে, সেই রঙচটা সাইকেলে ঘোড়ার গতিবেগ, কলোনীর মধ্যে এসে আরেকটু উগ্রচণ্ড হলাম, লীলাও এতক্ষণে ফিরেছে।

চাকার এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম দরজাটা, আজকাল এভাবেই দরজা খুলে ফেলা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে।

অধিক ক্ষমতা পেলে যা হয়, আমিই ত এ বাড়ির হেড এখন, আর কে! ভাবতে ভাবতে ঢুকছি, আর দেখি কি বারান্দার ছোট ছোট ধাপিতে বসে আছে লীলাবতী, তার দু'চোখে জল টসাটসা। হল কি?

কাছেই আরেকজন, ফতুয়ার মত হাফ-শার্ট, গলায় তাবিজ, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। আমার থেকে যৎকিঞ্চিৎ বড় হবে, জলে জলে ঝাপসা চোখ দুটো, গড়িয়ে হাঁ-গালে এসে পড়লে জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছে লোকটা। নোঙরার জাশু!

একটু জোরেই শব্দ করে গাড়িটাকে হিড়হিড়িয়ে বারান্দার এক-কোণে তুলে রাখলাম, ঘরেও ঢুকলাম একবার। বেরিয়ে এলাম, ফের ঢুকলাম। ফের বেরুতেই লীলা বলল, 'মুচুকুন্দদা— আমাদের আত্মীয়, জয়বাঙলা থেকে এস্‌ছে।'

'তার মানে রিফিউজী।

আচমকা মুচুকুন্দ উঠে দাঁড়িয়ে তার ফতুয়া কাম-হাফ-শার্টের ফালি কাপড় দিয়ে লীলার চোখ মুছিয়ে বলল, 'ওড়ি, কান্দস না।'

ভোরবেলা উঠে দেখি, পাতকুয়োয় ধড়াস ধড়াস বালতি ধাসিয়ে জল তুলছে মুচুকুন্দ, কানায় কানায় ভরতি দুটো ড্রাম।

পাতকুয়োর পাড়ে লীলাবতীর শাড়ি-সায়া স্তূপাকারে রাখা, এখন বসে বসে কাচবে, এ আবার কি!

আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল, ব্রাশ কত্তে কত্তে প্রচণ্ড রাগে ঘাড় ঘুরিয়ে গাছের ওপর বসে থাকা কাক দেখলাম, সেও কি আচ্ছা। বাজার যাবার আগে মনটা আরেকবার খিঁচড়ে গেল, চেয়ারে মুখোমুখি বসে লীলার সঙ্গে কথা বলছি, কথা আর কি—এই কি দরকার, কি-কি আনতে হবে, মাছ না এনে ডিম আনা-ই ভাল, আয় দেবে বেশি, ইত্যাদি।

মুচুকুন্দ ঢুকল কী যেন চিবুতে চিবুতে, তার কচল-কচল আওয়াজ, ঢুকে লীলার চেয়ারের হাতায় থেবড়ে বসে পড়ল।—হাসছে।

সেই দাঁত বের-করা হাসি, আর সয় না, কথা থামিয়ে আচমকা উঠে পড়লাম, জোটেও যতসব।

রঞ্চটা গাড়ির সীটের ওপর জোর থাপড়ালে নিচের স্প্রিংগুলো ক্যাঁচর-ম্যাচর করল, বলল, শুধুমুধুই আমাদের মাল্লে, বড়বাবু!

সাইকেলটাও আর ঠিকমত চলে না, খুব সত্বর রিপেয়ারে দিতে হবে, ভাবতে ভাবতে চড়ে বসলাম।

বারান্দায় বেরিয়ে লীলাবতী তৎক্ষণাৎ বলল, 'কচুরি আনবেন।'

'দেখি!'

বটতলার হিঙের কচুরি বিখ্যাত খুব, সেই একঠোঙা আর বাজার, গলদঘর্ম হয়ে ফিরছি। রাস্তায় দু'জন চেনা-পরিচিত লোক কথা না বলে পাশ কাটিয়ে গেল, কার মনে না দুঃখ হয়! আর কি বুঝি না, এর মূলে হিংসা! আরে যা যা, কেউ না থাক লীলাবতী ত আছে, বামদা ফরেস্ট কলোনী—ওই ত ঢের।

বড় মুখ করেই ফিরছি, একদম হাতে গরম হিঙের কচুরি, খেয়েও সুখ-আহ্লাদ, মনোরঞ্জনদা, এই ত জীবন।

একটা কাক ঠোঙা দেখে গলা ফাটিয়ে চেল্লাচ্ছে, যতই চেল্লাও হে তোমার জন্যে সন্দেশ কেনা হয়নি! এককালে 'তীর্থের কাক' নিয়ে বাক্যরচনা ত কত করেছি, মনে পড়ল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, লীলাবতী চুল বাঁধছে, চুলের গোড়ায় টাইট-

বাঁধা দড়ির খুঁটটা দাঁতে চেপে পা ছড়িয়ে আরামসে। তার পশ্চাতে বাবু হয়ে বসা মুচুকুন্দ বাঁধা খোঁপায় হাত ঠুকে ঠুকে বলছে, 'ওড়ি, ধ্যানতা কস্ ত্যান্তা।'

মুচুকুন্দ চুল বাঁধে, কানের খোল্ বের করে দেয়, উকুন বাছে—কী না করে মুচুকুন্দ। নাচতে গাইতেও পারে।

একদিন ত খুব হচ্ছে নাচগান, মাথায় গামছা বেঁধে মুচুকুন্দ উঠোনে নাচছে, বারান্দায় এদিক-ওদিক করে তাল ঠুকছে লীলা, পারলে নেচেও নেয়—এমনি হাবভাব।

'পূবপরোদি ফহরত্ গাড়ত্ পানিন্নিবাল্লাই' না কী যেন গানের কথাগুলো, তার কী যে অর্থ যে জানে সে জানে, আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রাগে, তেড়েফুঁড়ে বললাম, 'কি হচ্ছে, কি?'

বলতেই মুচুকুন্দ আচমকা থেমে থাকল, ঘোরের মধ্যে তখনও তাল ঠুকছে লীলা, কেটে যেতে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'আপনি নাচুন ত, মুচুকুন্দদা।' নাচানাচি শুরু হল আবার, অসহ্য, দড়াম করে দরজার পাল্লা আটকে পিঠ ঠেকিয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠুকে ভাবলাম, এই উটকো লোকটা—

ঐ লোকটাই যত নষ্টের গোড়া, একে ত অন্নধ্বংস, তার ওপর এই ধ্যাস্টামো, দিনকে দিন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, একটা কিছু ভাবা দরকার।

ভাবতে ভাবতে দুদিন, তিন দিনের দিন রাজাভাতখাওয়ার চিঠি—ঘরের ছেলের মত আমি, সেইহেতু হুকুম হয়েছে—ভাতখাওয়ায় লীলাকে অতি অবশ্য পৌঁছে দেওয়ার, মায়ের খুব অসুখ, লীলার যাওয়া দরকার একান্তই। চিঠি পেয়ে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠলাম, সে কেউ দেখল না। যাক, আপদটা আর তা'লে সঙ্গে সঙ্গে থাকছে না, লেপ্টেমেপ্টে! যাবার একদিন আগে মুচুকুন্দ তার আরেক আত্মীয়ের বাড়ি রাঁচি রওনা-ও হয়ে গেল।

হেসে খেলে বলি, 'আর কি, এবার ত রেডী হতে হয়, উঠে পড়ো।'

॥ ছয় ॥

কামরূপ এক্সপ্রেসে যাব, হাওড়া থেকে রাত ন'টায় এটা-ওটা গুছিয়ে নিতে নিতে আচমকা আঁতকে উঠে লীলা বলল, 'এই যাঃ, আমার কন্‌সেসান্‌টাই আনা হয়নি, কী-ই হবে।'

'স্টুডেন্ট-কন্‌সেসান্‌? স্কুলের?'

'হুঁ।'

এর অধিক কথা নেই, বসে থেকে হাতে-পায়ের নখ খুঁটল, গোড়ালির ফাটা চামড়া টেনে হিঁচড়ে ছাড়াচ্ছে।

চিন্তা ভারি, তো বললাম, 'হেড-মিস্ট্রেস কি আছে? আজ ত ছুটির দিন।' লীলাবতী উঠল, খানিক এঘর-ওঘর খোঁজাখুঁজির ভান করল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল থমথম, তার অত কি-বা গরজ!

ঘাড় উঁচিয়ে দেখি, লীলার সায়ার লেস আর শাড়ি খাট থেকে ঝুলছে এক হাত।

এই লীলা আমার সঙ্গে একা ট্রেনে চড়ে যাবে, ভাবতেই বলবীর্য এসে গেল, দু'হাতে টুস্কি মেরে বলি, 'হোক ছুটি, চেষ্টা কত্তে দোষ কী, যাই?' দৌড়ুতে দৌড়ুতে এল, 'আমাদের স্কুলে যাবেন আপনি? উমন্না!' 'ওড়ি যাক যাক, তা না'লে অতগুলো ট্যাকা, কম কথা!' এঁটো কব্জি ভাঁজ করে বড়দা বাথরুমে গেল।

সাইকেলের পিঠে উঠতেই ক্যাঁচ-কোঁচ, শুরু হল খুনসুটি, স্প্রিং-গুলো খুব ত জ্বালাচ্ছে।—তালে? হাতে খাতা, ছাতা মাথায় আদায়ে চললে, বড়বাবু?

হুঁ, যে র'ম ভাবো, আর কি।

মেয়েদের স্কুলে ঢোকা একপ্রকার হুজ্জুতি, তার ওপর ছুটির দিন, অফিস ঘরটা খোলা দেখলাম। এক পাকা-মাথা বুড়ো টেবিলে মাথা গুঁজে কাজ করছে, দারোয়ান টপকে ওই বুড়ো লোকটাকেই ধরলাম, 'যদি একবারটি ছাখেন, বড়ো বিপদ!'

'কার?'

হকচকিয়ে বলি, 'না মানে, আপনার দয়া, যদি দয়া করে এক-বার—'উঁহু ছুটির দিন, হবে-টবে না ওসব।'

চেয়ারে বসলাম, পিন-কুশনের গর্ভ থেকে একেকটা পিন আধ্ধেক তুলে ফেলি, ফের মাথা ঠুকে দমন করি—বস হে বস।

নস্যির কৌটো খুলল লোকটা, ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ক্যারামের গুটি ছুঁড়ে ফেলার ভঙ্গি করল, তারপর ছ'নাকের ফুটোয় ছ'টিপ, পাঞ্জাবির বাঁ হাতায় নাক মুছে তুলে রাখল ফের।

'এক্ষেত্রে, কেসটা যদি আপনার মেয়ের হত, মানে বলছি, তা'লে আপনি কী কত্তেন স্যার?'

মাথা খামচে একটা আস্ত পিন বেভুলে তুলে ফেলেছি, আমার ডান হাতের ছ'আঙুলে তার মুণ্ডুটা ধরা, বুড়ো মানুষটার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আছে। সাদা মাথা বুড়ো ধরে ফেলল খপ করে, পিন-কুশনের মধ্যে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল, 'এ-জিনিস খুব বেয়াড়া, পায়ে যদি একটিবার ফুটে—'

'হাতেই ত ছিল সার।'

'তার অর্থ?' চটে উঠল বুড়োটা, 'লীলাবতী কে হয়?'

ডাঁট দেখিয়ে বললাম, 'বোন।'

'কী রকম?'

'কী রকম আবার, এক মায়ের পেটের বোন।'

সামান্য ঘাবড়ে গেল, স্বর বদলে বলল, 'কার কাছে যাবে রাজা-ভাতখাওয়া?

'বাবার, ওই জায়গা বাবার কর্মস্থল।'

'অ।' হাতে কলম, উঠে দাঁড়াতেই কাছা চেয়ারের হাতায় লেগে খুলে গেল, ফের ঠিক কত্তে কত্তে বলল, 'যাই বউদিমণিকে প্রোপোজ করে দেখি, হবে বলে ত মনে হয় না।'

স্টুডেন্ট-কন্‌সেশান হাতে পেয়ে খুশিতে উথলে উঠল না লীলা বরঞ্চ চোখ বড় করে জেরা করল, 'বড়দিকে কী বললেন? মানে, এই আমি আপনার কে হই? কী সম্পর্ক?'

'কেন, যা সত্য।'

'তার মানে? বলেছেন কি—আমি আপনার—'

'হুঁ বল্লেই বা।'

লীলাবতী পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল, 'আমার প্রেস্টিজ বলে আর কিছু থাকল না, কী জঘন্য আপনি। আমার পড়াও হয়ে গেল, এর পরে আর কি স্কুলে থাকতে দেবেন বড়দিমণি!' বলেই ক্রোধে-আক্রোশে ফেটে পড়ল।

এতক্ষণে যা যা ঘটেছিল—সেই সাদা বুড়োর গল্প—হাসতে হাসতে লীলাবতীকে বলি, শুনে ত থ!

'বাঃ, এত সুন্দর ম্যানেজ কত্তেও পারেন আপনি, দেখে ত মনে হয় হয় না একটুও!' কী হাসি চোখ-মুখে, আর কী আহ্লাদ।

বললাম, 'আমি ঐ রকম।'

ট্রেন চলতে শুরু করলে লীলা বড় ভাল মেয়ে হয়ে যায়, দুয়েক দণ্ড গেল ত বলে, 'এটা নিয়েছেন, ওটা? আর সেইটে?'

'হুঁ, আছে সব।'

'জলের বোতল? যাঃ যাঃ!'

'ঐ ত, ওদিকটায়।'

'টিকিটগুলো আছে ঠিক?'

'আছে', বুক পকেটে বাঁ হাত চেপে ধরে বলি, 'আমার জিম্মা থেকে জিনিস খোয়া যাওয়া—'অত্ত সহজ না!'

নিশ্চিন্ত লীলাবতী জানলায় মুখ রেখে বাইরের দৃশ্য দেখল, বেলা পড়ে আসছে। এই কামরায় চেনালোক নেই একটিও—আমি আর লীলাবতী—এই দৃশ্য তুমি যদি দেখতে মনঞ্জনদা। হুদ্দাড় ছুটতে ছুটতে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছে গেল, এবার গাড়ি বদলাবার পালা, আমাদের কামরূপ এক্সপ্রেস ত রাত ন'টায়।

ছোটখাটো লাগেজের ওপর বসে পড়ে লীলা কপালের উলুরঝুলুর চুলগুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে নিল, খুব টায়ার্ড।

শালোয়ার কামিজ পরা একটি পাঞ্জাবি বউ বোতলের ছিপি খুলে জল খাচ্ছে ঢকঢক, জল না দুধ? মনে হতে লীলাকে বললাম, 'কিছু খাবে? আনব?'

'হুঁ, জল একটু।'

ব্যাগের ভেতর থেকে ঝটাপট ওয়াটার বটলটা তুলে ধরলাম, হাত থেকে খামচে নিয়ে ফের ব্যাগের মধ্যে গুঁজে রাখল, বলল, 'কল থেকে আনুন।'

হতভম্ব হয়ে আমি হাঁটকে-পাঁটকে পলিথিনের সেই লাল গেলাসটা খুঁজছি ত খুঁজছি।

তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'ঐটুকু ত জল, এখন খরচা কল্লে বাকী রাস্তাটুকু কী করবেন?'

ঠিক কথা। অতএব লাল গেলাস হাতে দৌড়ুলাম জল আনতে হুড়ুক হুড়ুক, ট্রেন-ই এল না, এদিকে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার ভয়, কী কিত্তি-কাণ্ড!

জলটল খেয়ে লীলাবতী ঢেঁকুর তুলে বলল, 'কী, ঠিক বলিনি?'

'কিসের?'

'এই যে—কল থেকে জল এনে খাওয়া।'

ডানহাতের তর্জনী হেলিয়ে বার বার কবুল করি, 'বটেই ত, তোমার যুক্তি কত!'

কামরূপ এক্সপ্রেসে ভিড় তেমন নেই, কুলিদের হাতে-পায়ে ধরে দুটো সীট আরেকটা বাঙ্কের বন্দোবস্ত হল। এখন আর কোন ঝুটঝামেলা নেই, একদম ঝাড়া হাত-পা, লীলাবতী সীটের ওপর পা তুলে বসে আছে, তার চোখ দুটো খোলা।

ঢুলু ঢুলু, আরেক নন-বেঙ্গলী বুড়ো ট্রেনে ওঠামাত্র ঘুমুচ্ছে, ঘুমন্ত মাথা এদিক-ওদিক নড় নড় করে লীলার গায়ে ঢলে পড়ল।

আচ্ছা ত, বুড়োর হাঁটুতে হাত ঘষে বললাম, 'দাদা ঠিক হয়ে বসুন, মেয়েছেলের গায়ের ওপর যে—'

বলতেই সোজা হয়ে বসে লাল চোখে কটমট করে চেয়ে থাকল দু চার-মিনিট, ফের এখন ঘুমুচ্ছে। ঘুমুলে যে কে সেই, চাপা আক্রোশে লীলাকে উঠে আসতে বলি, তুমি এদিকটায় উঠে এসে বসো ত!'

সীট পাল্টাপাল্টি করে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম, নিশ্চিন্তে।

বুড়োটা আর এখন ঘুমুচ্ছে না, আরেকবার অন্তত ঘুমোও বুড়োবাবা, ঘুম বড় ভাল জিনিস।

বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, মাঝে মধ্যে আলোর ঝলকানি এর ভেতর দিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেস দৌড়চ্ছে দ্রুতবেগে। কামরায় লোক চলাচলের বিরাম নেই, এখান থেকেও দেখা যায়। বাথরুমের ছিটকিনি উঠছে নামছে, ছড়াক্ ছড়াক্।

ঘুমন্ত মাথা কাঁধ বরাবর এসে যেতে চটজলদি সরে বসলাম, পড়তে পড়তেও খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল মাথাটা, আর লীলার কী হাসি!

খেতে বসে বললাম, 'ঐটুকু ত খেলে, আরেকটা নাও।'

'ডিম? উমন্না।'

'আর্ধেকটা অন্তত ?'

'তুমি খাও।'

এই প্রথম আমাকে 'তুমি' বলল ও! আহ্লাদে ফেটে পড়ে বলি, 'খেতে-ই হবে।'

মুচকি হাসে, আচমকা আমার ডানহাতের কব্জি ওর বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ঠোঁটের কাছে ধরল, 'বাবারে বাবা, খাচ্ছি ত!'

নন-বেঙ্গলী বুড়োর চোখের ঘুম সেই যে চটকেছে আর নেই, জেগে বসে গাল-দাড়ি চুলকোচ্ছে।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে লীলাবতী বলল, 'এবার একটু ঘুমোব।'

'সাবধানে ওঠো, দেখো পড়ে না যাও!'

'নিচে আছো কী কত্তে, পড়লে ধোরো।' বাঙ্কে উঠে গিয়ে লীলা চোখ টিপে হাসল। হতবুদ্ধি আমি—কী বলব? বিড় বিড় করে বলি, 'তোমাকে জীবনভর ধরে থাকব, লীলা!'

বাঙ্কের হাতা ধরে ক'মিনিট ত দাঁড়ালাম, বুড়োর দু' ঠ্যাঙের মাঝে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে অতঃপর আয়েস করে বসি, কেমন দেখলে বুড়োবাবা?

ট্রেন বড় নাচাচ্ছে, দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে গন্তব্যে, এইমাত্র আরেকটা স্টেশন ক্রস করল।

আলোর ঝলকানি থেকে ঘাড় ঘুরোতেই দেখি, মুচুকুন্দ! অ্যাঁ, আপদটা ফের কোত্থেকে এল? রুমরুম ভূতের মত দাঁড়িয়ে মিটির মিটির হাসে। রাগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাউ দাউ জ্বলে উঠল রি রি করে, উটকো লোকটার জ্বালায় অত্তি-ঠুদু'দণ্ড একলা থাকার যো নেই কোথাও!

'ও কই?' হেসে ত্রিভঙ্গ মুচুকুন্দ জানতে চায়।

আমার দায় পড়েছে কথা বলতে, ডান হাত মাথার চার ধারে এক পাক ঘুরিয়ে তর্জনী ব্রহ্মতালু বরাবর উঁচিয়ে রাখলাম।

যা বোঝার বুঝল, বাঙ্কের মাথায় হাত রেখে ডাকল, 'ও-ওড়ি, জাগানি ?'

শোনামাত্র লীলাবতী ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল, 'আরে মুচুকুন্দদা, কী-ই মজা !'

কথা হতে লাগল একটানা—ধুদ্দূর, কী অত কথা ? কথায় কথায় জানলাম—ও যাবে এন-জি-পি, তার মানে নিউ জলপাইগুড়ি।

আর ত সয় না, বিরক্ত হয়ে বাথরুমে গেলাম, গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অযথা হাওয়া খেলাম, ফিরে এসে দেখি—লীলাবতী ঘুমুচ্ছে। উটকো মানুষটাও জবর দখল দিব্য বসে আছে নিচে, দেখে হাসল, সে বড় জ্বালাধরা।

মুখ ঝামটে উল্টোদিকে বসি, অ-বাঙালী বুড়ো এখন মুখোমুখি, তার লাল চোখ পাটি পাটি করে দেখল, কি রকম দেখছ বুড়োবাবা ?

কোলের ওপর দু' হাত জড়ো করে রাখা, ফতুয়া-কাম-হাফ-শার্ট, কালো কারে বাঁধা গলায় সেই তাবিজ, এক মাথা কদম ছাঁট চুল।

চোখাচোখি হলেই মুচুকুন্দ হাসে, হারে মূর্খ !

কামরায় আর তেমন সাড়া শব্দ নেই, যে যার ঘুমুচ্ছে, রেলবাতায় চাকার দাপাদাপিতে গাড়ির ঢুলুনি—বাড়ছে ত বাড়ছে। ঢুলুনি এসে গেল চোখেও, সেই ঢুলুঢুলু—ছেঁড়া ঘুড়ির তুল্য গোঁত্তা খেয়ে চোখ খুলেছি, আর দেখি কি কালো কোট গায়ে টি-টি, হাত বাড়িয়ে টিকিট চাচ্ছে।

চনমন করে জেগে উঠে দিলাম টিকিট দুটো, দেখে-টেখে ফেরত দিল, এবার ত নিশ্চিন্ত।

ওদিকে লোক দুটো সামনা-সামনি হতেই ফতুয়ার থলি হাতড়াল মুচুকুন্দ, নেই। উঠে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের পকেট দেখল, নেই ত ?

না টিকিট না রিফিউজী ক্যাম্পের দাগ নম্বর, কিছুই দর্শাতে

পারল না মুচুকুন্দ, ঘাড় ধরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওই দু'জন।

এতক্ষণে মনে হল, লোকটা ফাউ, কোথাকার উটকো আপদ, বিদেয় হয়ে ভালই হয়েছে, ধুলোটুলো ঝেড়ে সীটের ওপর দু' পা তুলে মহানন্দে বসলাম। আর ত ঝঞ্ঝাট নেই কোনও!

ঘুম থেকে উঠে ঈষৎ ঘাড় ঝুঁকিয়ে লীলা বলল, 'মুচুকুন্দদা কোথায় গো?'

প্রাণ খুলে মহাসুখে গল্পটা বললাম, শুনে চুপ থাকল দু' দণ্ড, তারপরেই দাঁতে দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে কথা, কথা ত না ফোঁসফোঁসানি—মানুষ? মানুষ তুমি, না জন্তু, জলজ্যান্ত লোকটাকে ধরে বেঁধে জল্লাদের হাত তুলে দিয়ে বসে থাকলে আরামসে?—তার একবার খোঁজ খবর-ও কল্লে না, ছিঃ!'

বাঙ্কের বালিশে মাথা গুঁজে লীলাবতী ফোঁপাচ্ছে, 'যান্, এই রাত্রে কোথায় হাপিস হয়ে গেল অতবড় লোকটা, খুঁজুন।"

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই নেমে পড়লাম, এদিক-ওদিক মানুষজনের ছুটোছুটি, তার মধ্যে ব্যাটাচ্ছেলে গেল কোথায়?—সেই ফাউ লোকটা।

॥ সাত ॥

তাকে এখনও খুঁজে মরি, চাকরি সূত্রে বনগাঁয় পোস্টেড, বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে কত লোক ত যায় আসে! অটো-রিকশায় ভ্যানে চড়ে লোকগুলো টাকা ভাঙিয়ে যশোর রোড বরাবর এগোয়, নানা মুখের সারি।

তার ভেতর সেই ফাউ লোকটাকে খুঁজি হুবহু কাউকে দেখলে তার পিছু পিছু হাঁটি, সে হয়ত ট্রেনে করে আর কোথাও যাবে। তার

সঙ্গে ঠাকুরনগর, হাবড়া অব্দি চলে যাই, ভুল ভাঙলে যে কে সেই, এ ত মুচুকুন্দ নয়!

ওপার থেকে চলে আসা লোকগুলোর তোয়াজ করি, তারা যাতে এ দেশের ভোটার হয় তার জন্যে ঠিক জায়গা মত যোগাযোগও করি—এর মূলে সেই।

মুচুকুন্দ বাঙলাদেশের ব'কলমা নিয়ে বসে আছে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে ডান হাতের তর্জনী মাথার চারদিকে এক পাক ঘুরিয়ে এনে চিবুকে ঠেসে ধরে ভাবি না এবার যা হোক করে সেই ফাউ লোকটাকে খুঁজতে হবে। সেই তাকে খুঁজে না আনলে লীলাবতীর মন পাচ্ছি না।

বড় দুঃখে আছি হে।

—

দেখতে নীনা ঠিক একই রকম। চোখ নাক থুতনি ঠোঁট সব ঠিক একই রকম। কানের দুলটা অবধি। খুব ভালো ক'রে দেখলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম, নীনা ঠিক একই রকম ছিল। মাথার চুল পর্যন্ত এক। ঘন কালো আর খুব ঘনিল লম্বা গোছায় বিস্তৃত। মুখের ডৌল যাকে বলে, চোখের ঠাণ্ডা চাউনির ভঙ্গি, গ্রীবার মুদ্রা সব একাকার। কোনো ভুল নেই, নীনারই দেহ, নীনারই সব, তবু নীনা নয়।

দেখতে দেখতে আমি যে বিভোর হয়ে গেছি, মেয়েটি তা বুঝতে পেরে চোখ নামিয়ে কোলের ওপর ফেলে রাখা হাতের নখ খুঁটতে লাগল। নীনা লজ্জা পেলে ঐ ধারা নখ খুঁটত। আবার মেয়েটা তল চোখে চেয়ে দেখল আমাকে। গালে লজ্জার আভা লাল হয়ে উঠল। ঠিক সেই রকম। খানিক বাদে মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর টানা লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে চলে গেল।

নীনা ছিল সঞ্জয় মিস্ত্রীর মেয়ে। রাজমিস্ত্রী সঞ্জয় শিমূলতলার আমাদের পাড়ার একটি টালির খোপরায় মেয়ে বউ নিয়ে সংসার করত। সঞ্জয়ের নীনা ছাড়া আর কোনো সন্ততি ছিল না। বউ ছাড়া আর কোনো আত্মীয় ছিল না। প্রতিবেশির সাথে তার প্রীতির সম্পর্ক মধুর ছিল। সঞ্জয় ছিল ভালো লোক। সঞ্জয় খুব মিষ্টি মানুষ ছিল। মিশুক প্রকৃতি ছিল তার। সে কখনো বিবাদ বিসম্বাদ ভালোবাসত না। নীনা অল্প কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। নীনা ছিল সুন্দরী আর

খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু নীনা কখনো সাঁতার শেখে নি। জলে নামতে নীনা খুব ভয় করত। সাঁতার না শিখে মানুষ কী ক'রে বেঁচে থাকে আমরা বুঝতাম না। নীনাকে আমরা ঠাট্টা করতাম, ধিক্কার দিতাম, নদীর দেশের ছেলে আমরা, খুব সাহসী। জলের সাথে আমাদের খুব বন্ধুত্ব। নদীর সখ্য আমাদের গর্বের বিষয়। আমরা সাঁতার দিয়ে নদী পারাপার করতাম। ঢেউ-এর মাথায় দুলতাম। জলের তলায় নাড়া দিয়ে ডুব দিয়ে চলে যেতাম কতদূর। তীরে দাঁড়িয়ে নীনা এইসব দেখত। নীনার কি আর জলে নামতে, ঢেউ-এর মাথায় দুলতে সাধ হতো না? তার নিশ্চয় খুবই ইচ্ছে হতো। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সাঁতারু ছিল নবীন। এত দুরন্ত ছেলে হয় না। রাতদিন জলেই পড়ে থাকত। বাড়ি ফিরতে তার কোনো ইচ্ছেই হতো না। জলের প্রতি তার ছিল গোপন আসক্তি। নদী ছিল তার প্রাণ। সাঁতার প্রতিযোগিতায় ক্লাবের সবাইকে সে হারিয়ে দিত। কেউ ওকে কখনো সাঁতারে পরাস্ত করেছে বলে শুনিনি। নীনা এই নবীনকে ভালোবাসত। নীনা যা মোটেও পারে না, নবীন তাই সবার চেয়ে ভালো পারত। নবীন ছিল সবার সেরা। নীনার ইচ্ছে হতো, সে-ও সাঁতার শেখে, জলে নামে। কিন্তু কিছুতেই সাহস হতো না। নবীন অবলীলায় নদীর জল তোলপাড় করে ফিরত। এই নবীনকে তাই নীনা মনে মনে কামনা করত। চুপি চুপি চেয়ে দেখত নবীনের রূপ। নবীনের স্বাস্থ্য। নবীনের বুকের বলিষ্ঠতা। কব্জির শক্তি। সব কিছুকে মনে মনে পূজা করত নীনা। নবীন না জানলেও নীনা মনে মনে দিনে দিনে নবীনের ভালোবাসার স্বপ্ন দেখত। সব সময় ঠাণ্ডা চোখে নবীনের একটা ছবিকে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখত। বাস্তবের নবীন যখন নীনার সামনে দিয়ে নদীর ঘাটে যেত, কল্পনার নবীন তখন নীনাকে রোমাঞ্চিত করত। নবীনের হাব-ভাব, কথা বলা, কণ্ঠস্বর, নীনার সব মুখস্থ হয়ে গেছিল। দূর থেকেও নবীনকে নীনা চিনতে পারত। পায়ের জুতো, ঘাড়ের গামছা, চিনতে

পারত। কলম খাতা বই, সবই তার চেনা হয়ে গেছিল। ভালোবাসার সেই রূপ সংসারে সবসময় সবাই দেখে না। সবার চোখে ধরাও পড়ে না। কিন্তু সেই ভালোবাসা এই জগতেই চুপি চুপি শুরু হয়। ধীরে ধীরে ফোটে। আপনমনে সেই ভালোবাসা গান হয়ে বাতাসে ভাসে, ফুল হয়ে বাতাসে ভেসে যায়। তা, সেই নবীনকে ভালোবাসত নীনা। বলতে পারত না। বোঝাতে পারত না। নীনার তখন কষ্ট হতো। দুঃখ হতো। নিজের ওপর রাগ হতো। ভালোবাসার কথা বলতে যে বুদ্ধি লাগে নীনার তা জানা ছিল না। কী ভাষায় বলতে হয়, সেই ভাষা সে বুদ্ধি ক'রে কোথা থেকে জোগাড় করবে বুঝে পেত না। কেউ তাকে সাহায্য করত না। আমরা ছাড়া তার কোনো বন্ধু ছিল না। আমরা ছেলেমানুষ, আমরা সবাই পুরুষ, আমরা তার মনের কথা বুঝতাম না। ফলে একা একা নীনার বড় দুঃখ হতো। তার ভার সইতে হতো নীনাকেই। সইতে পারত না, তবু।

একদিন নীনা কী ক'রে শুনতে পেল, যাকে ভালোবাসতে হয়, তাকে খুশি করতে হয়। এই কথা কোথা থেকে সংগ্রহ করল নীনা, সে এক রহস্য। কে তাকে এই কথা শোনাল কেউ জানে না। হঠাৎ নীনার মনে হল, নবীন খুশি হলেই নবীনের মন পাওয়া যাবে। তাই নীনা নবীনের মন পাওয়ার জন্য কত কি চিন্তা করল। ভেবেই পেল না, নবীন কিসে খুশি হবে। নবীনের মন কী চায়, কী পেলে খুশি হয়, নীনা তার হদিশ বার করতে পারল না। গাছ থেকে ডাঁটোডাগর পেয়ারা পেড়ে নিয়ে গেল নবীনের কাছে। নবীন পেয়ারা দেখে একটা পেয়ারা হাতে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। কিন্তু তার খুশি অখুশি কিচ্ছু বোঝা গেল না। তখন নীনার মনে হল, পেয়ারা দিয়ে কাউকে খুশি করা যায় না। একদিন সঞ্জয় মিস্ত্রী মেয়ের জন্য বাজার থেকে মতিচুর নাড়ু কিনে আনল। নীনা চুপ ক'রে সেই নাড়ু লুকিয়ে রাখল নবীনের জন্য। জলে নামবার আগে নবীন সেই নাড়ু খেল। তারপর হৈ হৈ

ক'রে রোজকার মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীনা বুঝল, মোতিচুরের নাড়ুও কাউকে খুশি করে না।…একদিন নীনার মা পায়েস রেঁধে নীনাকে বলল—যা তো মা, নবীনকে এই বেলা নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে নিয়ে আয়। নীনা নবীনকে ডাকতে চলে গেল। নবীন হাপুস-হুপুস ক'রে পায়েস আর লুচি খেল। খেয়ে দেয়ে বলল—বেশ রেঁধেছ মাসি। খাসা হয়েছে। গন্ধ সুবাস খুব হয়েছে।

মাসি খুশি হয়ে বলল—নীনা পায়েস রাঁদতে ভালোই পারে বাবা। ওই তো সব করল নিজে হাতে।

তাই নাকি? নবীন অবাক হওয়ার ভান করল। কিন্তু পায়েস রান্নার খাতিরে কাউকে কি খুশি করা যায়? নবীন খুশি হয়েছে মনে হল না। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে কেউ কখনো খুশি হয়? নবীন গান গাইতে গাইতে বাড়ি চলে গেল। নবীন যখন-তখনই গলা সাধে। তাই খেয়ে দেয়ে খুশি হয়ে গান ধরেছে, এ কথা মনে করার কারণ নেই।

অতএব খুশি করার আর কী উপায়? এই সব তুচ্ছ আয়োজন দিয়ে কারই বা মন ভরে? কোনো অদ্ভুত আশ্চর্যজনক ঘটনা দরকার। খুব ঝলোমলো ব্যাপার দরকার। চোখে একদম অবাক-করা কিছু একটা চাই। সঞ্জয় মিস্ত্রী মেয়ের জন্য নতুন রাঙা শাড়ি আর ব্লাউজ কিনে আনল। লাল টকটকে রঙ! চোখ ধরে যায়। নদীর কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো নীনা। লাল শাড়ি আর ব্লাউজ পরে কপালে মস্ত বড় লাল টিপ এঁকে নীনা যে কী সুন্দর সাজল, কতখানি রূপসী হল কে বলবে! অনেক দূরের দেশ থেকে যৌবন কত কি নতুন খবর বয়ে এনেছে এই ছোট্ট মেয়েটির জন্যে, কে-ই বা তার বার্তা শুনতে পেল। নবীন জল থেকে জল ছুঁড়ে মারতে পারত নীনার রোমকূপের রোমাঞ্চে। তা করল না। তাই যদি হতো, তবে নীনা কি জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলত—দাঁড়াও নবীন, আমিও জল-ঝাপটির খেলা খেলব তোমার সাথে। নীনা এইসব ভেবে মন খারাপ ক'রে ফেলল।

পাড়ের ওপর চুপচাপ বসে বসে দুঃখ পেতে লাগল। নীনা যে জলকে ভয় পায়। সাঁতার জানে না।

নবীন একলা একলা বহুদূর সাঁতার দিয়ে গেল। উল্টোপাল্টি খেলা দিয়ে চলল জলের বিছানায়। এ যেন জলশয্যায় ভাসছে নীনার বর। বেহুলা এই জলকে ভয় পায়নি। তাই সে সতী সাধ্বী হতে পেরেছে। নীনার মনে হল, নবীনের এতটুকু যোগ্য সে নয়। কিছুতেই না। নীনার চোখে জল এল। নবীন ডাঙায় উঠে নীনার কাছে এসে কাছে দাঁড়িয়ে দেখল নীনাকে। নীনার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। এই চোখের জলের যে কী গভীর মানে, নবীন তা একটু খেয়াল করল না? নীনাকে দেখে সে কি এক ফোঁটা মুগ্ধ হল না? দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে নীনাকে চেয়ে দেখল না কেন? গান গাইতে গাইতে নবীন চলে গেল। শিস্ দিতে দিতে নবীন চলে গেল।

একটার পর একটা সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে চলল। একটার পর একটা সব আয়োজন ফুরিয়ে যেতে চলল। নীনা নিঃস্ব হয়ে গেল। ফতুর হয়ে গেল। তার আর কোনো জাদু জানা নেই। নীনা নিজে জাদুকর সেজে নিজেই কত খেলা দেখাল। একা একা খেলে গেল, একা একা দেখল। নিজেকেই নিজে খুশি করতে পারল না। মনে হল, কোনো একদল নীনার সামনে কোনো একটি নীনা জাদুকাঠি ঘুরিয়ে বলল—আর নেই। আর আমি জানি না। তখন সেইসব নীনারা একসাথে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠল। বলল—এই খেলাগুলো বড্ড পুরাতন। আমরা বহু দেখেছি। নতুন কোনো খেলা তুমি জানো? আধুনিক কোন খেলা? তোমার খেলায় কোনো মনে রাখার মতো 'চমৎকার' নেই। এসব খেলা তো কোনো জাদুর খেলাই নয়।

নীনা হেরে গেল। সে জিততে পারল না। সে যে কেমন ক'রে হেরে যাচ্ছে, কেউ তা বুঝতেও পারল না। একদিন একজন কানে কানে বলল—নীনা তুই গুনীন ধর গে। সত্যিকার ফল পাবি। গুনীন

তোকে মন্তর বলে দেবে। তাবিজ-কবচ বেঁধে দেবে। যা। চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি?

না। নীনা বলল—না। তা হয় না ভাই। তা হয় না।

কেন হয় না?

আমি তা কিছুতেই পারি না। যাকে নিজের ক্ষমতায় পারি না, তাকে অন্যের দেয়া মন্তর দিয়ে বশ করতে পারব না। অন্যের মন্তর অন্যেরই। আমার আপন সাধ্যের জিনিস তো নয়।

তোর ভারী গুমোর দেখছি। শেষে পস্তানী হবে, এই বলে রাখলাম।

তা হোক। তবু পারব না।

আহা মুখপুড়ী! নিজের তোর কী আছে শুনি? কী দিয়ে তুই নবীনের মন ভরাতে পারিস দেখলি তো!

নীনা হু হু করে কাঁদতে লাগল। তার আর কিছুই ভালো লাগত না। একদিন তার নিজের ভেতরটা রি রি ক'রে জ্বলে উঠল। তার চোখে একটা অপূর্ব আগুনের শিখা স্থির হয়ে প্রতিজ্ঞা হয়ে জ্বলতে লাগল।

সেদিন চাঁদ উঠল আকাশে। তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত। রাত্রি নির্জন। দাওয়ায় শুয়ে চাঁদের মুখ দেখছিল নীনা। তার মনের সব সাধ ফুরিয়ে গেছে। তবু সে কোনো এক নির্মম প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ। তার ঘুম আসে না। চোখের পাতা এক হয় না। এক সময় সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে আসে। বাগান পেরিয়ে, ছায়া আর জোছনা মাড়িয়ে চলে আসে নদীর কিনারে। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নদীর জল এখন শান্ত। চৈত্র মাসের শীর্ণ নদী। তবু কত ভয়াবহ! জ্যোৎস্নায় নদীর জল চিকচিক ঝিলমিল করছে। ওপারে বালুচর নদীর পাশে ঘুমিয়ে আছে। একটা রাত-জাগা পাখি একটানা শব্দ করছে দূরে। মনে হল, নদীর জলে নবীন সাঁতার দিচ্ছে। ওই তো নবীন জল তোলপাড় করছে। টুপটুপ ডুব দিচ্ছে

আর উঠছে। নীনা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। আস্তে আস্তে পা টিপে জলের কাছে নেমে আসে। জলের গায়ে হাত দিয়ে ছুঁতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে শিউরে ওঠে নীনা। এই জল, তাই না নবীন? এই জল, তোমার বড় প্রিয়। আমি তাকে ছুঁতে এত ভয় পাচ্ছি কেন? নীনা হাত টেনে নেয়। সে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ ধারণ করল শরীরে। পা বাড়াল এবার। হাত নয়, পা। পা ডুবিয়ে দাঁড়াতেই সব দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। জলের বিন্দুরা স্রোতের শেকল নিয়ে এগিয়ে এল রূপসী নীনার কোমর অব্দি। বলল, আমরা তোমায় ছাড়ছি না কিছুতে। জলের অনেক গভীর ভালোবাসায় তোমায় নিয়ে যাব। নীনা গভীর আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠল। তার কান্নায় ভয় পেয়ে চর ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল চখাচখি দুইজন। তাদের পাখার ঝাপটা এসে যেন বা বাতাস দিয়ে নীনার বুকের কাপড় ছুঁয়ে গেল। নীনার আরো ভয় লেগে গেল। নীনা জল ছেড়ে আতংকে বিহ্বল হয়ে পাড়ে এক লাফে উঠে পড়ল। আমি পারছি না নবীন। তোমার ভালোবাসার জলকে ভয় পাচ্ছি খুব।

নীনা বাগানের ওদিকে চেয়ে দেখল বারবার। কেউ আসে না। কেউ মানে নবীন। এত রাতে নবীন আসবে কেন? কেন এসে বলবে—নীনা তুই সাঁতার শিখবি? বেশ তো। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এই দ্যাখ, জল আমাদের বন্ধু, ভয় কি?

নবীন জানে না, নীনা এখন কী করছে। নীনার চেষ্টার কথা পৃথিবীর লোক কখনো জানবে না। নীনা পাড়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করল। সে আজ কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। এই জল কত সত্য তার কাছে। জলের বন্ধুত্ব কতখানি আকুল করেছে তাকে। সে ফিরবে না। এই জল নবীনের দেহের উত্তাপ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে রাজি। সে ফিরবে কেন? তার চোখে প্রতিজ্ঞার অপূর্ব মোম পুড়ছে। এবার জোর ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল নীনা তার নিজেকে। মনে মনে বলল—নাও গ্রহণ করো।

নদী খুশিতে ছলচ্ছল ক'রে উঠল। নীনা বুঝতে পারল, নবীন যাতে খুশি; নদীও তাই চায়। নদী আর নবীন এক ধারা দুরন্ত। সবাই বলে, নদী নারী। আমি জানি, নদী এক পুরুষের দুরন্ত যৌবন। মনে মনে বলল নীনা। অনুভব করল। গলা অব্দি জল তাকে সোহাগ দিতে লাগল। হাত-পা ছেড়ে দিল নীনা। বিপুল বেগে নদীর সূক্ষ্ম জলের জাল চারদিকে ছড়িয়ে দিল নদী। বলল—তুমি আমাদের রানী।

তারপর নদী নীনাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলল। কথাটা যত সহজে বলা হল ঘটনা আদৌ তা নয়। নদী প্রথমে নীনাকে নিয়ে অনেক হিমশিম খেল। নীনা হাত-পা ছুঁড়ল। জল খেল। তবু সে সাঁতার দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। সাঁতার যে কী, নীনা তার কৌশল আমৃত্যু বুঝতে পারল না। মনে হল, নবীন যা করে, তা এক মস্ত অলৌকিক ব্যাপার। আর নীনা যা করল, তা কি পৃথিবীর মানুষ করে?

সকালবেলা নীনার শরীরটা পাওয়া গেল ওপারের চড়ায়। এপার থেকে নীনাকে টানতে টানতে ওপারে নিয়ে গেল নিশির টানে। অদ্ভুত এক ভালোবাসার ঘোর লেগেছিল মেয়েটার।

লাশটাকে নবীন ওপার থেকে সাঁতার দিয়ে টেনে আনল। সবাই বলল—সাঁতার শিখতে মেয়েটা জলে নেমেছিল। কথা শুনে নবীন সবার মুখে চেয়ে চেয়ে দেখল। তার চোখমুখের চেহারা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—সাঁতার শিখবে, একথা নীনা বলতে পারত! আমরা কি শেখাতাম না? বল্ নবীন, তুই কি 'না' করতিস? নীনা আমাদের বন্ধুর মতো ছিল। বল্ তুই?

নবীন কোনো কথা বলল না। চুপচাপ উঠে বাড়ি চলে গেল। পরের দিন নবীন গামছা ঘাড়ে নদীর পাড়ে এসে বসল। আমরা তার মনের অবস্থা খারাপ দেখে কাছে এগিয়ে গেলাম। পাশে বসে ওর গা ছুঁয়ে বললাম—চল্ নামি, চান করবি না?

নবীন কোনো কথা বলল না। তার চোখে চেয়ে দেখলাম, কেমন এক চাপা রাগ নিয়ে, হালকা অশ্রুর ছোঁয়া নিয়ে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে নবীন। নদীর ওপর তার সব বন্ধুত্ব কখন নষ্ট হয়ে গেছে আমরা বুঝতেই পারি নি। নবীন আর কোনোদিন নদীজলে সাঁতার দিল না।

এই এক চির বিচ্ছেদের গল্পটা এতক্ষণ ধরে আমায় আলোড়িত করছিল। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে মনে হল, সেই নীনা, সেই দেহ, সেই সব কিছু।

অবিকল সেই রকম একটি মেয়েকে আমি দেখছি।

মন্ত্রীর চেম্বারে রোজ রোজই কি মেয়েটা (মেয়েটা বলা ভুল, বলতে হয় নীনা) এই রকম ধর্না দেয় চাকরির জন্যে। আমি ব্যবসার লাইসেন্স বার করবার তদ্বির করতে এখানে আসি। নবীন আর আমি একটা বাল্ব তৈরির কারখানা শেয়ারে চালাব বলে স্থির করেছি। মন্ত্রী সহজে রাজি হচ্ছে না। ঘুস খাবে বলে মনে হচ্ছে। এখানে এসে নীনাকে দেখলাম।

নবীনকে ব্যাপারটা বলতেই নবীন প্রথমে হেসে উঠে কথাগুলো গল্পের মতো অবিশ্বাস করল। বলল—মেয়েটার নাম নীনা?

বললাম—নাম নিশ্চয় নীনা নয়। তবে ওটা নীনাই। একদিন তুই ত্যাখ্। তারপর যদি না মেলে, কথা যদি মিথ্যা হয়, তখন আমায় অভিশাপ দিবি।

নবীন মেয়েটিকে দেখল। কিছুক্ষণ একেবারে বোবা হয়ে গেল। বলল—নীনার তো বোন ছিল না। ওটা তবে ওর মাসির মেয়ে।

বললাম, নীনার কোনো মাসিই ছিল না। ওটা নীনার কেউ না। আসলে ওটা নীনাই। চোখ দু'টো নীনা। চোখ নাক কান আলাদা আলাদা ভাবে নীনা, একসাথে সাজিয়ে ছবি ক'রে দেখলেও নীনা। তাই তো?

নবীন বলল—হ্যাঁ। আমি ওকে সাঁতার শেখাব।

কথাটা শুনে আমি কেমন চমকে উঠলাম। নবীন আবার বলল—ওকে—একদিন শুধিয়ে নে ও সাঁতার শিখতে রাজি তো?

আমি মেয়েটিকে ধরে পড়লাম—বললাম, শোনো তো! তুমি এখানে চাকরির জন্য তদারক করতে ··

হ্যাঁ। আমার একটা চাকরির খুব দরকার। আপনি আমার হয়ে মন্ত্রীকে একটু বলবেন! আমি বি. এ. পাশ। আমার মার্কস খুব ভালো। আমি ডিসটিংশান পেয়ে পাশ করেছি।

বললাম—মন্ত্রী আমার বন্ধু। চাকরির চিন্তা কোরো না। তোমার ঠিকানাটা দাও। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে তোমায় চিঠি দিয়ে জানাব।

ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আমি নীনার বাপ-মায়ের সাথে দেখা ক'রে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই ওঁরা রাজি হয়ে গেলেন। বললেন—ছেলেকে একদিন নিয়ে আসুন। আমরাও দেখব।

বেশ। তাই হবে। আমি কথা দিয়ে চলে এলাম।

নবীন বলল—সব কথা বলেছিস তো?

কোন কথা?

কেন ঐ সাঁতার শেখানোর কথাটা?

সেটা কি কোনো কথার মতো কথা হল নাকি? বিয়ের পর বউকে যত খুশি সাঁতার শেখাবি, কে বলতে আসবে!

•

নবীনকে দেখে ওরা এক বাক্যে বিয়ের জন্য কবুল হয়ে গেলেন। বললেন—ছেলের পছন্দের খবরটা আমরা এখনো শুনি নি।

নীনা সামনেই বসেছিল। বললাম—দেখুন, নবীন আপনার মেয়ে নীনাকে পছন্দ না ক'রে পারে না। কারণ···

ভদ্রলোক সাথে সাথে বলে উঠলেন—আমার মেয়ের নাম নীনা নয়। ওর নাম অমৃতা।

কিন্তু ওকে যে নীনা হতে হবে। অমৃতা নীনার মতো। একেবারে নীনার আদল। সব কিছু নীনা।

ভদ্রলোক বললেন—তাই কি সম্ভব? নীনা যে কেমন, তা অমৃতা জানবে কেমন ক'রে? অমৃতাকে এমন ক'রে মানুষ করেছি, সে কখনো অন্যের মতো হতেই পারে না।

বললাম আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন না ঠিক। আপনি একে অমৃতা বলছেন। আমরা কিন্তু নীনা বলছি। এই জন্যেই আমরা বিয়েতে রাজি হয়েছি। তাই না, নবীন?

নবীন বলল—হ্যাঁ, তাই তো! বিয়ের পর আপনার মেয়ে সাঁতার শিখবে। আমি শেখাব।

বললাম—ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি আপনাদের।

অমৃতা আমার মুখে নীনার সব কথা শুনল। নবীন নীনার সব গল্প অমৃতাকে সেই দিনই শুনিয়ে দিতে চেয়েছিল। নবীন মনে করছিল, কেমন ক'রে মরল, সে কথা যেন শুনিয়ে শেষ হয় না। তবু সেই কথাগুলো বারবার গল্প ক'রে বলতে পারলে নবীন আরাম পায়। দুঃখের ভারটা অনেক হালকা হয়। নীনা এখন গল্প হয়ে গেল অমৃতার সামনে, আর সেই গল্পটা ফুরায় না। চলতে থাকে। সেটা এক গোলাকার গল্প। তার আবর্তন থামে না। শেষ হয় না। একই গল্প, একই আবর্তন, তবু নবীন বলে চলে। নবীনের মনে হয়, এত বলছি, তবু ঠিক ঠিক নীনার ভালোবাসাকে স্পর্শ করা যাচ্ছে না। তার গভীরতার ভাষা আমরা জানি না।

তার এই কষ্ট দেখে অমৃতা অবাক হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে গেল। শুনতে শুনতে তার চোখে জল এসে পড়ল। নবীন বলল—নীনা এই নদীর এখানে দাঁড়াত। আমরা জল-বাজি করতাম। সাঁতার দিয়ে কতদূর চলে যেতাম। জলের মধ্যে আমাদের এক রকম উৎসব চলত।

সে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তার খুব সাধ হতো জলে নামবার, সাঁতার দিয়ে বেড়ানোর, খুব কষ্ট হতো ওর। সে কিন্তু অসহায়। সেটা এক অসহায় মানুষের আশ্চর্য ছবি। খুব করুণ। কী বলব, তার কোনো তুলনা নেই। সেই যে ছবিটা, তুমি পারবে সেই ছবির মতো হতে ? অসহায় হয়ে বসে থাকা, চেয়ে দেখা, সাধ জাগে, পারে না। অথচ কী রকম মুগ্ধ হয়ে গ্যাখে সে।

একজন জ্যান্ত মানুষকে ছবি হতে হবে। অমৃতা শিউরে উঠল। অমৃতার বলতে ইচ্ছে করল, সে সাঁতার জানে। জেলা প্রতিযোগিতায় অমৃতা ফার্স্ট হয়েছিল একবার। আর কতবার যে কত সাঁতার দিয়ে মেডেল জিতেছে। সেটার কোনো গুণতি নেই।

নবীন বা আমি একবারও সেদিন অমৃতাকে দেখিনি, অমৃতা সাঁতার জানে কি না।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, যে-মেয়ে দেখতে অবিকল নীনা, সে কখনোই সাঁতার দিতে পারে না। তার চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, খুব ঠাণ্ডা হু'টি চোখ, অসহায়। অমৃতা সাঁতার জানবে, এটা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে ? মনে হল, আমরা নবীনের জন্য যে-বস্তুটা খরিদ করছি সেটা একটা নীনার ছবি।

অমৃতার বলতে ইচ্ছে করল, আমি ছবি নই। আমি অমৃতা। এই দেখুন, আমি অমৃতার কণ্ঠে কথা বলছি। অমৃতার চোখে দেখছি। অমৃতার কানে শুনছি। আমি যে শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করছি, গ্রহণ করছি, সবই আমার নিজস্ব। আমার বুকের স্পন্দন আমারই। আমি অমৃতা। এই কপালের টিপটা আমিই এঁকেছি। বলুন, আমি কী ক'রে ছবি হব ?

অমৃতার এইসব কথা বলতে ইচ্ছে হল, অমৃতা পারল না। নবীন তখন অমৃতাকে বলল—আমি তোমাকে কিন্তু সাঁতার শেখাব। তুমি

কখনো ডুবে মরবে না। সাঁতার শেখা জলের মতন সহজ ব্যাপার। হাত পা খেলাতে পারলেই দেখবে, তুমি ভেসে আছো, তুমি ডুবছ না।

শুনতে শুনতে অমৃতা খুশি হয়ে উঠল। বলল—এই নদীটা বেশ দেখতে। জল খুব সুন্দর। সব নদীই রূপসী হয় না। এরই নাম বুঝি রূপসা!

নবীন বলল—হ্যাঁ। এরই নাম রূপসা। এত ভালো নদী। তবু এই জলে কতকাল স্নান করিনি। নীনা মারা গেল, আমিও সেই থেকে এই নদীকে খুব দুঃখ ক'রে বললাম, আমি আর তোর কাছে আসব না। তুমিই আবার তার কাছে ফিরিয়ে আনলে নীনা।

অমৃতার বলতে ইচ্ছে করল—তুমি ভুল বললে নবীন। তুমি অন্যমনস্ক হয়ে আমায় নীনা বলছ। নবীন পাছে দুঃখ পায়, তাই সে-কথা শুধরে দিতে ইচ্ছে হল না। অমৃতা চুপ ক'রে থাকল। বলল—এইখানে দাঁড়াত নীনা, এইখানে, তাই না?

আবার সেই গল্প। নবীন বেশ উৎসাহে শুরু করল—হ্যাঁ। এই-খানে সে বসত। সেটা একটা ছবি। কখনো মুখ ভার ক'রে থাকত। কখনো খুব হাসিখুশি। জলে নামতে তার বড্ড আকুলি-বিকুলি আর ভয় হতো। অসহায় সেই রূপটা আমি খুব উপভোগ করতাম। বেশ মজা, তাই না? একটা ছবি। এই ছবিটা এসে তোমার চোখেমুখে মিশে গেছে। দাঁড়াও, এবার আমি জলে নামব। তুমি দেখবে।

অমৃতা দাঁড়িয়ে পড়ল আর নবীন জলে নামল। জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল অমৃতা। হাত-পায়ের ঘা খেয়ে নদীর জল নেচে উঠে উল্লাসে ছিটকে ছিটকে এসে অমৃতার চোখে মুখে স্পর্শ ক'রে গেল। অমৃতা শিহরিত হয়ে চোখ বুঁজল। তার সব প্রত্যঙ্গ জলের প্রতি আশ্চর্য কামনায় কেঁদে উঠল। বুকের মধ্যে তৃষ্ণা জেগে উঠে মাথা কুটতে লাগল। চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। অথচ অমৃতা জলে নামতে পারল না। কারণ এখন সে নীনা হয়ে গেছে। সে নদীতীরে দাঁড়িয়ে নবীনের স্নান করা দেখতে লাগল। জল-বাজি

আর নানা রকম কসরত দেখতে থাকল। অসহায় হয়ে অমৃতা নীনা হয়ে গেল। একদিন সে নবীনকে বলতে চাইল, আমায় সাঁতার শেখাবে বলেছিলে তুমি। কৈ তার কি হল ? অমৃতা বলতে চাইল এইসব। কিন্তু পারল না। কারণ, নীনা কখনো নবীনকে সাঁতার শেখাও বলে আব্দার করেনি। এইসব বললে অমৃতার কষ্ট ক'রে গড়ে তোলা নীনার ছবিটা পাছে নষ্ট হয়ে ভেঙে যায়, এই ভয়ে সে নবীনকে কিছুই বলতে পারল না। নবীনও অমৃতাকে সাঁতার শেখাতে এতটুকু উৎসাহ দেখাল না। এমনকি সে-কথা তুললও না কোনোদিন। শুধু একদিন একটুখানি ইংগিতে শোনাল—সাঁতার শেখা কাজটা আবার কঠিনও বটে, তোমার ভয় করে, তাই না ?

অমৃতা কী বলবে ? চোখে তার জল এসে গেল। মাথা নিচু ক'রে মাথা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ। নবীন সাথে সাথে বলল ঃ নীনাও সাঁতারের কথা তুললে, তোমার মতো লজ্জা পেত। আর আমার তখন কী যে ভালো লাগত। গর্বে বুকখানা পাঁচ ইঞ্চি বেড়ে যেত। একটা ছবি।

অমৃতা বলল ঃ সেই ছবিটা আমার মুখের আদলে এসে মিশে গেছে, তাই না ?

নবীন হাসতে হাসতে বলল ঃ ঠিক বলেছ। আমি ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম।···

অমৃতা একলা আড়ালে এসে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে ভেবেই পেল না, ঐ বিস্মৃত চোখ দু'টি তার নয়। এ নাক, কপাল, ভুরু, ঠোঁট, গলা, তার নয়। এটা অমৃতা নয়। সুইমিং-এর সার্টিফিকেটটা বাক্স থেকে চুপি চুপি বার করল। চেয়ে চেয়ে দেখল। ঝরঝর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। নদীটাকে দেখল অমৃতা। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় সে নদী তাকে কামনা করত। রাত্রির জোছনায় সে নদী তাকে আকুল হয়ে ডাকত। কতদিন সে একলা নদীর ধারে গেল। জলে নামতে সাধ হল। জল তোলপাড়

ক'রে তুলতে ইচ্ছে হল। সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে যেতে মন তাকে লুব্ধ করতে থাকল। অমৃতা পারল না। অমৃতা নীনার কথা ভাবল। নবীনের প্রেমমুগ্ধ তন্ময় নিশ্চিন্ত জীবনের কথা ভাবল। নবীনের এই ঘোর-লাগা আত্মতৃপ্তির সুন্দর অভিব্যক্তি সে মিথ্যে করতে পারল না। সব সাধ ফুরিয়ে গেল। সব উদ্যম ফুরিয়ে গেল। সব হাসি চলে গেল। অমৃতা শীর্ণ হয়ে পাংশু হয়ে কেমন যেন হয়ে গেল।

নবীন অমৃতাকে চেয়ে চেয়ে দেখল। অমৃতার কী হচ্ছে, নবীন বুঝতে চাইল। পারল না। নবীনের মনে হল, অমৃতা একটা ছবি। একই ছবি এক-একসময়ে এক-একরকম লাগে। রঙ বদলায়। চোখের ভুল হয়। আবার একসময় ছবিটা সুন্দর দেখাবে। নবীন চলে গেল। নবীন গান গাইল। শিস্ দিল। আনন্দ করল। অমৃতা সেই গান শুনল। কিন্তু গানের কথা, গান যে কি বলছে, তা সে বুঝতে পারল না। সে একলা একলা ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে আবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে চেয়ে দেখল নিজেকে। অমৃতা আর নিজেকে চিনতে পারল না। তার মনে হল, অমৃতা বলে কেউ নেই। কখনো ছিল না কোনোদিন। বসে থাকতে থাকতে মনে হল, সে একটা মূর্তি। পাথরের তৈরি মানুষ। তার প্রাণ নেই। চোখ আছে। দৃষ্টি নাই। কানটি আঁকা। সে কিছুই শোনে না। ভাবতে ভাবতে তার বুকের স্পন্দন থেমে গেল। তার রক্তপ্রবাহ থেমে গেল। নিঃশ্বাস থেমে গেল। অমৃতা সত্যিকার একটি ছবি হয়ে গেল। যেভাবে ছবি তৈরি হয়, অমৃতার আঁকা-জোখা সেইভাবে সম্পূর্ণ হল। প্রথমে দুটি চোখ আঁকা হল। যে চোখ দ্যাখে না। কিন্তু চেয়ে থাকে। এইভাবে দু'টি পা আঁকা হয়ে গেল। যে দু'টি পা একদম স্থির। কখনো হেঁটে হেঁটে কোথাও যায় না। অমৃতার সব ছবিটা এখন আয়নার সামনে স্থির। কোনো কম্পন নেই। মৃদু একটু শিহরন নেই। জমাট একটি মূর্তি।

নবীন ঘরে ঢুকে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সেই

ছবি। একেবারে নিখুঁত। ঘাড়ে হাত রাখল নবীন। সেই স্পর্শে একবার চোখ খুলল অমৃতা। অমৃতা প্রতিবিম্বকে একবার ডেকে উঠল—'নীনা!' নবীন তা শুনতে পেল না। চোখ বুঁজল অমৃতা। আর সামান্য ধাক্কা লেগে অমৃতা এবার কাঠের মূর্তির মতো মেঝেয় পড়ে গেল। নবীন হতভম্বের মতো ঝুঁকে নামল মেঝেতে। দেখল অমৃতা মরে যাচ্ছে। বাইরে একটি কোকিল নিঃসীম আনন্দে ডেকে উঠল।

পৃথিবীতে বসন্ত এসেছে। অমৃতা মরে যেতে চায়। কিন্তু মরে যাওয়ার উপায় সে জানে না। একটি পরিপূর্ণ ছবি সে হতে পেরেছে। জীবন নেই। প্রাণ নেই। সাধ এবং স্বপ্ন নেই। ভালোবাসা নেই। ছবি বলতে এই যদি হয়, তবে অমৃতা ছবি। কিন্তু অমৃতার তখনো প্রাণ ছিল। নবীনের মনে হল, অমৃতা এখনো বেঁচে আছে। একটি পাথরের মূর্তির মধ্যে এখনো জীবন রয়েছে। স্থির চোখের গভীরে স্বপ্ন আর ভালোবাসার সূক্ষ্ম আলোড়ন থেমে আছে, স্তব্ধ হয়ে আছে। আর জীবনের এই নির্বাপিত-প্রায় একটি অদ্ভুত মায়া ছড়িয়ে আছে চোখে মুখে।

সেদিন চাঁদ উঠল আকাশে। একদিন পৃথিবীতে এই রকমই চাঁদ উঠেছিল। তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত। রাত্রি নির্জন। দাওয়ায় শুয়ে চাঁদ দেখছিল অমৃতা। নীনা একদিন এমনি ধারা চাঁদের মুখ চেয়ে দেখে কেঁদে ফেলেছিল। অমৃতারও সব সাধ ফুরিয়ে গেছে। তবু সে কোনো এক নির্মম প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ। তার ঘুম আসে না। চোখের পাতা এক হয় না। এক সময় সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে আসে। বাগান পেরিয়ে, ছায়া-জোছনা মাড়িয়ে চলে আসে নদীর কিনারে। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নদীর জল এখন শান্ত। অবিশ্রান্ত কোকিল ডাকছে বাগানের অন্তরাল থেকে। চৈত্র মাসের শীর্ণ নদী। তবু কত ভয়াবহ। জ্যোৎস্নায় নদীজল চিকচিক ঝিলমিল

করছে। ওপারে বালুচর নদীর পাশে ঘুমিয়ে আছে। অমৃতার হাতে দড়ি। কাঁখে কলসী।

অমৃতা বালি দিয়ে কলসিটা পূর্ণ করল। তারপর দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধল। পা দু'খানি জড়ো ক'রে আরো একটি দড়ি দিয়ে কষে নিল। তারপর দুই চোখ বুঁজে চিন্তা করল, নীনা সাঁতার জানত না। নীনা নবীনের এই প্রিয় নদীকে ভালোবেসেছিল। মরবার আগে সে কেমন আনন্দে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সবই অমৃতা অনুভব করবার চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে অমৃতা জলের কাছে নেমে এল। জলের গায়ে হাত দিয়ে ছুঁতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে শিউরে উঠল অমৃতা। নীনার মতোই অমৃতা বলে উঠল—এই জল, তাই না নবীন? এই জল, তোমার বড় প্রিয়! আমি তাকে ছুঁতে এত ভয় পাচ্ছি কেন? কথাটা আর একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য রকম করে আবৃত্তি করল অমৃতা। এই জল, তাই না নীনা? এই জল, তোমার বড় প্রিয়! আমি ছুঁতে গিয়ে এতখানি ভয় পাচ্ছি কেন? সভয়ে হাত টেনে নেয় অমৃতা। সে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ ধারণ করল শরীরে। কোমরে দড়ি বাঁধা। বালিপূর্ণ কলসী। জলের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। পা ডুবিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সব দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। জলের বিন্দুরা স্রোতের শেকল নিয়ে এগিয়ে এল রূপসী অমৃতার কোমর অব্দি। বলল, তুমি আমাদের রানী। তোমাকে আমরা জলের অনেক গভীর ভালোবাসায় নিয়ে যাব। ছাড়ব না। জলের প্রতিটি বিন্দু যেন আহ্লাদে চিৎকার ক'রে উঠল ছাড়ব না। ছাড়ব না। নদীর এই গোপন আর্তভাষা অমৃতাকে বিভোর ক'রে তুলল। জলের স্পর্শ করল উদ্বেলিত। অমৃতা পাগল হয়ে গেল। গভীর সানন্দ আর্ত বিহ্বলতা অমৃতাকে উন্মাদ ক'রে দিল। অমৃতা শুনতে পেল কোকিলটা থেমে গেছে। এক খণ্ড মেঘ এসে লাগল চাঁদের মুখে। নদীর ওপর দিয়ে কালো ছায়া ভেসে

গেল। অদ্ভুত কর্কশ স্বর ছড়িয়ে চরের চখাচখি উড়ে গেল দূর দিগন্তের দিকে। অমৃতা হঠাৎ ভয় পেল। আরো বেশি আনন্দ পেল। আতঙ্ক-চালিত অমৃতা এক টানে কোমরের দড়ি খুলে ফেলল। পায়ের দড়ি আল্‌গা ক'রে দিল। মনে মনে বলল—আমি পারছি না নবীন। তোমার ভালোবাসার জলকে আমি খুব ভয় পাচ্ছি!···অমৃতা বাগানের ওদিকে চেয়ে দেখল বারবার। কেউ আসে না। কেউ মানে নবীন। এত রাতে নবীন কি আসতে পারে?

অমৃতা এবার উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি খুলে ফেলে জলে ঝাঁপ দিল। পাগলের মতো, দস্যি মেয়ের মতো, দুরন্ত অঙ্গ চালনায় অমৃতা কিসের যেন বাঁধন ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনকে তোলপাড় করে চলল। সাঁতার কেটে কেটে কিছুতেই তার সাধ মেটে না।··সব ভয় ধীরে ধীরে দূর হয়ে যেতে থাকল। এত দিনের একটা ছবি কয়েক মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে সহসা তাবৎ পৃথিবীকে জলের ভিতর আন্দোলিত স্পন্দিত করে চলল। এই সময় নবীন অমৃতাকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল। দেখল, পূর্বজন্মের নীনা অমৃতার শরীরে সাঁতার খেলে ফিরছে। এত দিনে একটি ভালোবাসা মুক্তি পেল। এই জ্যোৎস্নায়। এই বসন্তে···

নীনা ঠিক অমৃতার মতোই ছিল। ঠিক সেই রকম। সেই চোখ। সেই নাক। সেই চুল। সব ঠিক একই প্রকার। জল থেকে উঠে এল অমৃতা। চোখে মুখে জলের ফোঁটায় জ্যোৎস্না লেগে ঝিলমিল করতে লাগল। অপূর্ব এই ছবি চেয়ে চেয়ে দেখে নবীন মুগ্ধ হয়ে গেল।

কলসিটা লাথি মেরে জলে ফেলে দিল নবীন। অমৃতাকে জড়িয়ে নিয়ে বাঁ হাতের বেষ্টনে পাশাপাশি বালির ওপর পা ফেলে, পায়ের ছাপ ফেলে, এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। চলতে চলতে একবার ঘুরে দাঁড়াল অমৃতা। নবীনও ঘুরে দাঁড়াল নদীর দিকে চেয়ে। অমৃতা মনে মনে বলল—আমায় তুমি ক্ষমা করে দিও। আমি পারিনি নীনা। আমরা পারি না।

মনে হল, এই জ্যোৎস্না রাতে নীনা ভীষণ একলা ঐ নদীর জলের তলায় শুয়ে আছে। ভালোবেসে যারা এই রকম ডুবে যায়, তারা সবচেয়ে একা। তার কোনো বন্ধু নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কেউ নেই।

আর তখন দূর কোনো অচেনা জগৎ থেকে নবীনের অন্ধ দুই চোখে তাজা এক অনির্বচনীয় আলো এসে লাগল। সে কথা এখন থাক। সেটা আর একদিন বলা যাবে। গোলাকার সে গল্পের কি কোনো শেষ আছে?

—

শ্রাবণীকে আমার শেষ চিঠি ছিল, এখনও তার একটা লাইন মনে আছে, আমার যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে শ্রাবণী তোমার একটা চুলও আমি ছাড়তাম না।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, শ্রাবণী হঠাৎ চোদ্দ বছর পর আমার খোঁজে এল কেন ?

চোদ্দ বছর বনবাস, এর সঙ্গে কোনও মিল আছে নাকি ?

আমি বাড়ি গেছি, গিয়ে শুনি শ্রাবণী এসেছিল।

—কে শ্রাবণী ?

আমার যেন ধন্ধ হয়।

কুমকুম বলল—তোমার বউ !

আমার ওইটুকু ছেলে পর্যন্ত জানে কুমকুমই আমার বউ, সে বেশ মজা করে আধো-আধো বলে—বাবা, মা তোমার বউ ? আমি কুমকুমকে বুকে টেনে নিয়ে বলি—আমার হৃদয়েশ্বরী !

শ্রাবণীকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও গোপনীয়তা নেই। কুমকুম আমার পারমিশান নিয়েই আমার ডায়েরী পড়েছে, ক্লাস এইট থেকে কলেজ পাস করা পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা আছে। কি জানি কিসের তাগিদে আমি আমার শেষ চিঠিটাও ডায়েরিতে টুকে রেখে-ছিলাম ঃ আমার যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে শ্রাবণী তোমার একটা চুলও আমি ছাড়তাম না।

কিন্তু যেহেতু ক্ষমতা নেই সেহেতু তাকেই ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন কুমকুম ঠাট্টাচ্ছলে মনে করিয়ে না দিলে আর মনে পড়ে না।

আমি তার বিয়ের পাঁচ-ছ' বছর পরে বিয়ে করি, আমি বোধহয় আমার প্রেম নিয়ে একটু বেশি কবিত্ব করে ফেলেছিলাম।

গোড়া থেকে দেখছি শ্রাবণীর প্রতি কুমকুমের অদ্ভুত একটা বিদ্বেষ আছে, বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তার বিদ্বেষ সে আমাকে বাতিল করেছে বলে।

—এত স্পর্ধা তোমাকে বাতিল করে! তাহলে ডুবে ডুবে জল খেত বলো!

আমি বললাম—না, সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে।

—কিন্তু তোমাকে বাতিল করল কেন, আমি তো তোমার সঙ্গে এত বছর সংসার করছি, কই আমার দারুণ ভাললাগে তোমাকে, আমি তো তোমাকে দারুণ ভালবাসি।

—ধ্যাৎ, এখন শ্রাবণী-টাবনি ছাড়ো তো!

আমি পনেরো-কুড়িদিন অন্তর বাড়ি আসি। শহরের পাশে একটা আইডিয়াল গ্রামে আমার বাড়ি। নদী আছে, জঙ্গল আছে, খেতখামার-বাঁশবাগান, কোকিল-ঘুঘু পাটকাক-উদবিড়াল…একশো-রকম ঘাসফুল চারদিকে ছড়িয়ে। এই ফুল-পাতার হাটে আমি, আমার স্ত্রী, মা আর ছোট্ট খোকা—মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন সুখে আমরা বসবাস করছি। আমি শেষ কেঁদেছি আমার বিয়ের সময়, প্রচণ্ড কেঁদেছি, কিন্তু সে কি শ্রাবণীর জন্য? তার বিয়েতে তো একেবারে খট্‌খট্ করে গেলাম। তাকে মাঝে বসিয়ে মহিলামহল তখন সাজাচ্ছিল, গীতবিতান ধরিয়ে দিয়ে নেমে এলাম। রাগে নিজের নামটাও পর্যন্ত লিখিনি। বেরিয়ে আসার সময় মেসোমশায় জিজ্ঞেস করলেন, খেয়েছ তো? আমি মিথ্যে অথচ সহজ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়েছিলাম। কিন্তু প্রায় দুশো সাক্ষী আছে, সেই আমি আমার বিয়েতে কীরকম ছেলেমানুষের মতো…। সবাই ধরে নিলো আমি শ্রাবণীর জন্য কাঁদছি! সাধারণভাবে ছেলেরাই বিয়ে করে, মেয়েরাই কাঁদে, কিন্তু

কোনও-কোনও রাক্ষসীও আছে এবং আরও বড় কথা কোনও ছেলেও যে এরকম একটা রাক্ষসীর জন্য এমন হাউ-হাউ করে কাঁদতে পারে তাদের কাছে এ দৃষ্টান্ত ছিল খুবই বিরল।

বাড়ি পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, শীতকাল, কুমকুম গরমজলে আমার পা ধোয়াচ্ছিল। আমি বাধা দিলে বলে— আমি তোমার রক্ষিতা নই। এসব কথা শোনার ভয়ে আমি আর বাধা দিইনি, যা খুশি করুক। সে পনেরো দিনের শোধ একদিনে তুলে নেয়। কাছে থাকলে সিগারেটটা পর্যন্ত ধরিয়ে খেতে দেয় না। আমাদের এমন মধুর জীবনে হঠাৎ শ্রাবণীর আবির্ভাব রীতিমতো বেমানান। আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না শ্রাবণী কেন এসেছিল। এসেছিল-এসেছিল, বাড়িতে তো কত লোক আসে, শ্রাবণীও তেমনি একটা লোক!

কুমকুম সোজা হয়ে মা কোথায় দেখে নিয়ে আমায় একটা চুমু খেলো।

সে-ই হাসতে হাসতে বলল—জানো, তোমাকে দেখতে এসেছিল, বলল চন্দনদা'কে কতদিন দেখিনি! আবার আসবে বলে গেছে!

ফস্ করে বলে ফেললাম—কেন, ওর স্বামীর কিছু হলো-টলো নাকি?

—ভ্যাট্, এ কী ইয়ার্কি? এসো মা ডাকছে, খাবে এসো।

খেতে-খেতে মা বলল—শ্রাবণী এসেছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে। যাওয়ার সময় আমাকে জড়িয়ে বলল—মাসিমা, আপনার বউ আপনাকে ভালবাসে, আপনি সুখী তো?

মা'কে আর জিজ্ঞেস করলাম না, তুমি কি বললে, আমি অল্প খেয়েই উঠে পড়লাম।

এও একটা আমাদের মজার দৃশ্য, যেদিন আমি কম খেয়ে উঠি সেদিন একদিকে মা ধরে, একদিকে কুমকুম ধরে, একজন হয়তো

পটলভাজা মুখে পুরছে, একজন পোস্তভাজা।—কী মুড়মুড়ে হয়েছে খেয়ে ছাখো।

আজ আর কেউ কিছু বলল না। ওরা ধরে নিলো আমি শ্রাবণীকে নিয়ে কিছু ভাবছি। হয়তো তুজন তুজনকে মনে মনে বকছে—আপনি খাওয়ার সময় বললেন ?

—তুমি তো ধুলো পায়েই বলতে শুরু করে দিলে, আমি সব শুনেছি।

মা আর কুমকুম খাচ্ছে, আমি ঘরে এসে বিছানায় বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় আমার বিলাসিতা, মজুরটাকে বললাম—নদীর পাড় থেকে এক ঝুড়ি বালি নিয়ে আয় তো, হয়তো একঘণ্টা ধরে নদীর বালিতে পা ডুবিয়ে বসে রইলাম। বহুকালের পুরনো আশুদগাছ ছিল পাড়ায়, কেটে নিয়ে গেছে, কোনওদিন তু'আড়াই ঘণ্টা গিয়ে সেই কাটার ওপরে বসে থাকি। কুমকুমকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাঁশ-বাগানগুলোতে বাঁশকড়া দেখতে যাই, তাকে আঙুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখাই, হাত দিয়ে ফেলেছিল একদিন, হাতভর্তি রোঁয়া শুয়োপোকার কাঁটার মতো হাতে পিল পিল করছে আর কুমকুম ভয়ে অ্যাঁ-অ্যাঁ করছে।

কুমকুমও খুব প্রকৃতিপ্রেমিক, কোথাও জোড়া-শালিক দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডেকে দেখায়।

কোনওদিন জ্যোৎস্না দেখে তু'ঘণ্টার জন্য বাঁচার নৌকো ভাড়া করে নিলাম, আমরা তুজনেই মোটামুটি গান জানি—এই পথ যদি না শেষ হয়...এই পৃথিবীটা যদি স্বপ্নের দেশ হয়...কিন্তু শ্রাবণী এর মাঝখানে ঢুকে গিয়ে, না: তার ঢোকার আর কোনও রাস্তা নেই, সে এখন গাছের শেকড়ের মতো, আমরাই এখন ফুল-ফল।

কুমকুম রান্নাঘরের পাট সেরে ঘরে ঢুকল, আমি তখনও গুন-গুন করে গাইছি : এই পৃথিবীটা যদি...

কুমকুম বলল—কী বউ এসেছিল বলে খুব ফুর্তি যে!

আমি তাকে তুলে নিয়ে এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে খাটে আছড়ে দিলাম।

কুমকুম উঠতে যেতে বললাম—কী হল?

—দাঁড়াও তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

আমার সেই ডায়েরিটা নিয়ে এল। গায়ে ধুলো-টুলো নেই, এর মানে সময়ে সময়ে ব্যবহার হচ্ছে। নিয়ে এসে আমার সামনে এক চান্সে একটা পাতা খুলল।

আজ শ্রাবণীর কাঁধে হাত রাখি। আগুনে হাত দেওয়ার মতো ভয় করছিল। কী হয়ে গেল, তার পাতলা শাড়ির মধ্যে সেই দুই মনোমুগ্ধকর···কিন্তু সত্যি সত্যি ছ্যাঁক করে উঠল যে। আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, মাথার ছাদ নেবে আসছে।

—ধুস্ এসব ছেলেমানুষি রাখো তো!

ইয়ার্কি মারলাম—তার বুক-টুক কেমন দেখলে বলো। আমি হো-হো হাসছি, কুমকুম আমাকে টেনে নিয়ে বলল—এই যে মশায় এখানটা পড়ো!

আজ প্রতিজ্ঞা করছি রাত দশটা থেকে এগারোটা প্রতিদিন একঘণ্টা করে শ্রাবণীকে ডাকব—শ্রাবণী-শ্রাবণী····

আজ একঘণ্টায় চব্বিশ হাজার চারশোবার ডাকলাম।

আমি খপ্ করে হাত বাড়িয়ে ডায়েরির ওই পাতাটা ছিঁড়ে ফেলি। কুমকুম আঁ···করে ভেতর থেকে একটা চিৎকার করে ওঠে।

রাতটা আমাদের ভাল কাটেনি। কী হয়ে গেল যে—দুধ কেটে গেলে যেমন হয়! সকালে বাপ-বেটায় কিছুক্ষণ টেনিস খেললাম, মাকে দাওয়ায় বসিয়ে তার কাছ থেকে খানিকক্ষণ পুরনো দিনের গল্প শুনলাম, ইউক্যালিপ্টাস চারাদুটোর গোড়া কুপিয়ে দিলাম, রান্নার জন্যে সজনেডাঁটা পেড়ে দিলাম। মা জিজ্ঞেস করল—সজনেফুল খাবি?

আমি বললাম—না থাক্। ফুল খেতে আমার কষ্ট হয়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু শুয়েছি, সকালে উঠে আমার পনেরো কুড়িদিনের চলে যাওয়া, সাধারণত দুপুরে কোনওদিন শোওয়া হয় না। নিমাই, বচনদা এল দেখা করতে। আমাকে গ্রামের সকলে খুব ভালোবাসে। কিছু উপকার করতে না পারি আশ্বাস দিতে দোষ কি।

উঠতে যাচ্ছি কুমকুম এসে ধমক দিল।

—ঠিক আধঘণ্টা শুয়ে থাকবে, আমি ওদের বসাচ্ছি, চা করে দিচ্ছি।

—এই তাহলে তুমি মাকে বলো।

—কী?

—চা করতে, তুমি একটু এসো।

কুমকুম এল না, আমি অনেকক্ষণ বিরক্ত হয়ে হয়ে শ্রাবণীর কথা মনে করতে লাগলাম। শ্রাবণীর একবার ভীষণ জ্বর হয়েছিল, আমি তার কপালে জলপট্টি দিয়েছিলাম, রাসপূর্ণিমার রাতে ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক চাঁদ দেখেছিলাম, গানের স্কুল থেকে শান্তিনিকেতন গেছলাম, দুজনে একটা রিক্সা নিয়ে দ্রষ্টব্যস্থানগুলো ঘুরেছিলাম, আর ওই কাঁধে একবার···আমার প্রেমের দাবি বলতে এই। তখন বয়স কম ছিল, এই সামান্য কারণের ওপর ভিত্তি করে তাকে একখানা বিশাল চিঠিও লিখে ফেললাম—আমার ক্ষমতা থাকলে শ্রাবণী···এসব এখন ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

শ্রাবণী একদিন আমার জন্যে লুচি আর মাছভাজা এনেছে। আমি তখনও কাঁটামাছ বেছে খেতে পারতাম না, মা বেছে দিত। শ্রাবণী আমার মাছ খাওয়ার রকম-সকম দেখে কী হেসেছিল, জোর করে কাঁটা বেছে দিয়েছিল।

আমি এখন নিজে নিজেই চেঁচিয়ে উঠলাম এগুলো কি প্রেম, এ তো মাছ বেছে দেওয়া। শ্রাবণী বড়লোকের মেয়ে, ওর বাবা নামী

ডাক্তার। আমার একবার কঠিন অসুখ সারিয়েছিলেন, সেই থেকে পরিচয়। প্র্যাকটিক্যালি ওর বাবা-মা'র কাছে আমি ভীষণ ঋণী। আর এক মজার ঠাকুমা ছিল, হারমোনিয়ম মাঝখানে আমরা দুজন গল্প করছি, বুড়ি এসে বলত, ঠাকুমা রেওয়াজকে চর্চা বলত—চর্চা বাদ দিয়ে তোরা প্রেম করছিস! ঠাকুমাকে টেনে এনে হারমোনিয়মের কাছে বসিয়ে দিতাম দুজনে—দিদা, একটা গান গাও। প্রেমের প্রসঙ্গ ভুলে যেত, সে বলত—তোরা গা আমি শুনি, আমার এ ফোকলা দাঁতে কি গান হয়!

—বেশ হয়, হরি দিন তো গেল তো হবে, নাও!

শ্রাবণী সুর ধরিয়ে দিত, আমি তবলা টেনে নিতাম ধা-ধা ধিন্ তা, তেটে ধিন্ তা…

নাঃ, এ-সবের কোথাও শ্রাবণীর কোনও প্রেম ছিল না। সে এসেছে অন্য কোনও কারণে, হয়তো অন্য কোনও ধান্দা আছে।

আধঘণ্টা হয়ে যেতে কুমকুমই গায়ে হাত দিয়ে ডেকে দিল, আমি তাকে না ধরে খাট থেকে নেমে চলে এলাম।

বিকেলটাও এভাবে ঘুরে-ফিরে কাটল, স্কুটার নিয়ে সুবলদার চা দোকান পর্যন্ত একটা ট্যুর দিয়ে এলাম।

কোথাও মন বসছে না। শরীরে কোথাও একটা ঘা থাকলে যেমন কিছু ভাল লাগে না।

কুমকুমকে বলেছিলাম চলো সিনেমা দেখে আসি। সে বলল, যাওয়া হবে না কাজ আছে।

—কী কাজ?

—নাম বলতে নেই, প-এ হস্‌সই ঠয়ে একার, বুঝেছ?

তাড়াতাড়ি ফিরে আ'সবে!

শ্রাবণী আমাকে বিয়ে না করে ভালই করেছে, সেটা বড় দৃষ্টিকটু হত। তাকে রাখতাম কোথায়! শুধু হৃদয় ছাড়া আমার সর্বত্র প্রচণ্ড দীনভাব। কুমকুম সাধারণ বাড়ির মেয়ে, কোনওরকমে ঘুস-

ঘাস দিয়ে একটা মাস্টারী জোগাড় করেছে, ওর দাদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল সেই সূত্রে বিয়ে। আমি বিয়ের আগেও বেশ কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছি, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক কুমকুমকে তখন দেখিনি, ওদের বাড়িতে সদর-অন্দরের ভাগটা একটু বেশি ছিল।

একদিন শুধু দুটো ফর্সা পা দেখেছিলাম, তোড়া পরে বারান্দা দিয়ে ঝুমঝুম করে পার হচ্ছিল। সেই দৃশ্যটা আর শব্দটা কোথাও যেন ধরা হয়েছিল, এখানেও বাড়াবাড়ি করলাম, বললাম—মেয়ে আমার দেখা, আর দেখার দরকার নেই। কথাবার্তা হয়ে গেল, বিয়ে হয়ে গেল।

আমার একটা ভয় এসে গেছলো যে কাউকেই যদি পছন্দ না হয় কিংবা যাকে-তাকে হয়তো হ্যাঁ বলে ফেললাম। তখন মেয়েদের ওপর এমন অ-আসক্তি যে বিয়ে না করলেও চলত। এখন কুমকুম এক-একদিন টিপ্পুনি দেয়—এই লোক বিয়ে করবে না বলে-ছিল যে কী করে বুঝতে পারছি না! আমি কোনওদিন যদি শ্রাবণীর জন্যও কেঁদে থাকি তাহলেও কুমকুম প্রমাণ করে দিয়েছে, সেগুলো সব অনর্থক বাড়াবাড়ি। আমি যেমন স্বামীর আদর্শ, কুমকুমও তেমনি আদর্শ স্ত্রী।

তাই চোদ্দ বছর পর, যে শ্রাবণী অত্যন্ত হীন শ্রাবণী, সে এসে যে এমন ঝড় তুলে দেবে, ভাবতেই পারছি না।

আমি-মা-কুমকুম, আর খোকা আমার কোলে, চারজনের উনুনের পাশে গোল হয়ে বসে পিঠে খাচ্ছি। শীতের রাতে এভাবে গল্প করতে খাওয়া বেশ জমে গেছলো। আমার বাবার কথা উঠল, খুব পিঠে খেতে ভালোবাসত। কিন্তু খোকা আমার মুখটা টেনে নিয়ে বলল—বাবা-বাবা···মা, আমাদের বাড়ি কে এসেছিল?

—কবে?

—ওই যে···দিদা?

কুমকুম বলল—ও পিসি !

—পিসি ! জানো বাবা, পিসি আমাকে কোলে করেছিল।

আমি বললুম—বাঃ !

আমার মুখটাকে ফের টানছে।

—শোনো না ! পিসি আমাকে কোলে নিয়ে বলছে, আমাকে মা বল্, মা বল্ ! আমি হঠাৎ চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে ?

কুমকুম হঠাৎ জোরে হেসে উঠল।

আমি আর না, আর না করে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে পালিয়ে এলাম।

আমার প্রিয় বাতাবিতলায় বরাবর একটা দড়িখাট পাতা থাকে, আমি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বসলাম, এবার আমি চাঁদ দেখব। অথৈ কুঁকড়ানো সমুদ্রের ফেনার মতো আকাশ, তার মাঝখানে চাঁদ। আজ কোন্ তিথির চাঁদ, দ্বাদশী ?

মা'কে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—মা পূর্ণিমা কবে ?

মা বলল—আজ দ্বাদশী, হিসেব করে নে !

আমার তো দ্বাদশীটাই দরকার। আমি একবার না গুনেই বলে দিয়েছিলাম গাছটায় কতগুলো কাঁঠাল আছে। কেটে নামানো হচ্ছে, বোঁটায়-বোঁটায় চুন লাগিয়ে রেখে পাকাতে হবে, গাছে পাকানোর শত্রু অনেক।

কুমকুম বাজি ধরলো। বললাম—যদি বলে দিই !—একশো টাকা।—একান্নোটা। গুনে দেখা গেল পঞ্চাশটাও নয় একবারে একান্ন। অথচ শ্রাবণী কেন এসেছিল ? আমাকে দেখতে চাইবে কেন, হিমালয়কে কেউ যদি ভালবাসে, হিমালয়ও কি তাকে ভাল-বাসবে সে তো পাথর ! তাহলে শ্রাবণী পাথর নয়।

ভালবাসার দাম চোদ্দ বছর পরেও রিটার্ন পাওয়া যায় !

বাতাবিগাছের ঝাঁকড়া ডালের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না গলে

আসছে কলাগাছে চার-পাঁচটা কলাবাদুড়ের বাচ্চা। পাকা কলা খুঁজতে আসে। ঝড় ঝড় করে একটা শব্দ হল ঢিল ছোঁড়ার মতো। আমি টর্চ জ্বালালাম, আবার ঝড় ঝড় করে পালিয়ে গেল। ডাবফুল ফুটেছে গন্ধ আসছে, খুব হাল্কা গন্ধ; ফুলগুলোরও অবিকল চাঁদের মতো রঙ।

কখন কুমকুম এসে দাঁড়িয়েছে, তার খুব পাতলা পা, চলার সময় পায়ে কোনও শব্দ হয় না।

শ্রাবণীর পায়ে শব্দ হয়? না, মনে নেই?

সরু-সরু আঙুল, আঙুলের ডগায় দুটো আঙুলে আঙট, বাদামি নখ। কিন্তু এতো কুমকুমের পা।

হঠাৎ কুমকুমকে বললাম—তোমার একটা পা দেখি?

কুমকুম শাড়ি তুলে দেখালো। আমি একটু গুম হয়ে গেলাম। তারপর ঠোঁট নত করছি দেখে কুমকুম বলল—ভ্যাট্।

ঘুরে ফিরে সেই শ্রাবণীর কথাই আসছে আমাদের মধ্যে।

—এই তোমার বউ না বিশাল করে টিপ পরে, একদম মানায় না।

—তুমি বলে দিলে না কেন?

—আমার বয়ে গেছে, খারাপ দেখালে তো ভাল, তবু আমার ভয় কমবে, এই ভদ্রলোকটিকে তো চিনি!

—এই তোমাদের মধ্যে কে বেশি সুন্দর?

—আমি?

কুমকুম তাড়াতাড়ি এমনভাবে বলল যে আমরা দুজনেই খ্যাক্-খ্যাক্ করে, না দু'বার হেসেই থমকে গেল কুমকুম। সে ভয় পাচ্ছে শ্রাবণীর কাছে না হেরে যেতে হয়! কী মুশকিল! এখানে হারজিতের কোনও প্রশ্নই নেই! ফুলের যত দামই হোক শুকিয়ে গেলে তার আর···

—না চলো, শুয়ে পড়তে হবে, কাল ষ্টিলে যাব।

স্টিল মানে আটটা পঁয়ত্রিশ, আমার যাওয়ার ট্রেন দশটা পাঁচ।

—কেন ?

আসলে ভাল লাগছে না।

বললাম—একটা কাজ ফেলে এসেছি, খুব জরুরি।

গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি, ঠাণ্ডা জল খেলাম, চোখে জলের ঝাপটা নিলাম। আমার অনেকদিন পর এই ঘুমহীন রাত, ভয় হল আজকেও যদি ঘুম না হয়! সেই আগের মতো শ্রাবণী-শ্রাবণী চব্বিশ হাজার চারশো বার, ওরে বাবা, মুখ ব্যথা, গুনে গুনে আঙুল ব্যথা।

কোথেকে শ্রাবণী চলে এল. কেন এলে তুমি, আমার কুড়িদিনের একটা দিন, কুমকুমের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকি, তুমি আমার এই প্রিয় সুখটাও কেড়ে নিলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক-একটা অভিশাপ থাকে, শ্রাবণীও তেমনি আমার একটা অভিশাপ।

কুমকুম মশারি ঠিক করতে-করতে বলল, যে মশারি ঠিক করে আমি তার গায়ে হাত রাখি, এ এক অদ্ভুত খেলা। কতো বয়স পার হলে লোকে ম্যাচিওর হয়? কুমকুম বলে, তুমি ম্যাচিওর হলে না!

শুলো।

গালে গাল রাখলাম।

—এই খোকা কেমন পাজি দেখেছ ?

—ও যে এত ত্যাঁদোড় দেখে বোঝা যাবে না! মনে রেখে যে পরে বলে দেবে দেখলে কারো বিশ্বাসই হবে না!

জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ, তারপর কী করলো, ও কি মা ডাকল ?

—ডাকতেও পারে, বিচ্ছু—বিচ্ছু, লাইক ফাদার....জানো তো ব্লাড রিলেশনের চেয়ে হার্ট রিলেশন বড়!

আমার বালিশের নীচে ঘড়ি রেখে শোওয়া অভ্যেস, ঘড়িটা টিক-টিক করছে, আর বুকের ভেতরে আরও একটা বুকের টিকটিক শব্দ।

প্রেমের প্রসঙ্গে জ্যোৎস্নার যেমন আছে, তেমনি আছে অন্ধকারের সঙ্গে গভীর যোগ। আমি কখনও এ মুহূর্ত নষ্ট করি না। কিন্তু আজ

যেন আমার শরীর মাথা তুটো আলাদা হয়ে গেছে, শরীর যে কথা বলছে মাথা শুনছে না। কুমকুমকে ঠেললাম—ঘুম পাচ্ছে ?

—না।

জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা শ্রাবণীর তো ছেলেমেয়ে আছে ?

—হ্যাঁ, তু মেয়ে।

—ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করো তো !

—কোন ব্যাপারটা ?

—শ্রাবণী কেন এসেছিল ?

তুজনেই খুব সিরিয়াস হয়ে গেলাম। কুমকুম বালিশে বাঁ কনুই মুড়ে, আমি ডান কনুই মুড়ে।

—এই !

কেউ আর একটু ঝুঁকে গেলে নাকে নাক ঠেকে যাবে আমার ছেড়ে দেওয়া গরম নিঃশ্বাস কখনও কখনও কুমকুমেরও নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে ! আমার মুখটা ঠেলে একটু সরিয়ে দিল।

কুমকুম বলল—ওর একটা আগের ছবি থাকলে ভাল হত !

—কেন ?

—তুমি যে এত মোহিত হয়েছিলে কেন, একটু দেখতাম !

শ্রাবণীর কয়েকটা ছবি ছিল, একদিন ছিঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। সেও এক ছেলেমানুষি। যেন আমি আমার কোনও প্রিয়জনকে দাহ করে এলাম, অশৌচ পালন করলাম তিনদিন, তিনদিন দাড়ি কাটলাম না, জুতো পরলাম না, আমিষ খেলাম না !

কিন্তু দাহ-র পরেও যে বেঁচে থাকে তাকে কী করবো !

আমি একটু রেগে উঠলাম।

—জানো আমার মনে হচ্ছে ওর হাজবেণ্ডের কিছু একটা অভাব আছে, সেটাই চোদ্দবছর ধরে শ্রাবণীকে কুরে কুরে খাচ্ছে !

কুমকুম হাসল।

—কী হাসলে যে ?

—সে তো তোমারও আছে!

আমার যে হাতটা গালপাট্টায় ঠেক দেওয়া ছিল সেটা হঠাৎ ফসকে গেল, মাথাটা নীচে পড়ে গেল।

কুমকুম লেপ টেনে মুখ পর্যন্ত চাপা দিয়েছে, আমি মাথার দিকে অনেকটা উঠে গেছি, আমার প্রায় আধখানা খোলা।

কুমকুমকে বললাম—এই আমার শীত করছে যে! সে আমাকে টেনে ঢাকা দিল।

না-না ও এমনি ইয়ার্কি করছে, আমাদের মধ্যে কী সুন্দর আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং! আমি আজকাল মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারি না সেজন্য আমি এলে মাছ খায় না। কে বলেছিল মেয়েদের চুলে হাত দিলে চুল উঠে যায়, এই ভয়ে কোনওদিন তার চুলে হাত দিতেই পারলাম না!

হাসতে-হাসতে বললাম, যাই বলো, শ্রাবণীকে চোদ্দবছর পরেও আমার কাছে ফিরে আসতে হল, তবে একটাই আপশোষ যে আমাকে বুঝতে শ্রাবণীর চোদ্দ বছর লেগে গেল!

খুব হাসছি।

হঠাৎ কুমকুম বলল—কিন্তু আমি কী করবো?

—কী?

—আমার যে কোনও চন্দনদা নেই!

আর হু হু করে কুমকুমের কান্না।

আমি যত তাকে থামাতে চাইছি—এই, কী হল, এই! আশ্চর্য!

কিন্তু আমার ভয় হল, আমি যে কোনওদিন তাকে আর থামাতে পারবো না!

—

সমরেশ মজুমদার

দিনরাত এখানে হাওয়া উথাল-পাথাল হয়। চিকণ বালির সর গায়ে মেখে পাক খায় নিচু আকাশে। সূর্যের কড়া টানে ঝুরু-ঝুরু হয়ে গিয়েছে চরের বালি। কাশ আর বুনো ঝোপে ছেয়ে গেছে চওড়া নদীর বুক। শুধু এক পাশে, সেই সে-পাড়ে, পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা জলের ধারা তিরতিরিয়ে বয়ে যায় বাঙলাদেশের দিকে। ওপারের গরু হেঁটে স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে আসে এদিকের চরে।

তুই মাইল চওড়া এই নদী সেদিনও পৃথিবী কাঁপাতো। ছ'মাস নিরীহ সাপের মত গা এলিয়ে যে ঘুমতো তার গায়ে খুঁটি পোঁতার সাহস হয়নি কারো। যেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল, পাহাড়ে নাচন শুরু হত বর্ষার, সঙ্গে সঙ্গে নদী দাঁড়াতো ফণা তুলে। তারপর ছোবল আর ছোবল। তু'মাইল চওড়া ঘোলা জল দিনরাত গর্জে উঠত আর পাশের শহরটার প্রাণ সেই শাসানিতে হয়ে থাকত আধমরা। হঠাৎ একদিন জলগুলো নদী ছেড়ে উঠে এল তুই পাড়ে। তুমড়ে মুচড়ে শহরটাকে ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে নেমে গিয়েছিল আবার। লোকে বলল, প্রলয়, মহাপ্রলয়। মানুষ মরল, সম্পত্তি গেল, অতবড় শহরটাকে মৃত্যুপুরীর মত দেখাচ্ছিল।

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে নদীর দাঁত ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেল। আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়ে গেল নদীটাকে। সেই পাহাড়ের তলা থেকে বোল্ডার সাজানো হল, বাঁধ তোলা হল শহরের খানিক ওপর থেকে। ফণা তোলার আগেই কোমরে ঠিকঠাক ঘা মেরে রাখা হল। পোষা কুকুরের মত তখন ওই পঞ্চাশ গজে জল নেমে যায় বাংলাদেশের দিকে।

আশ্চর্য। নদী এই বাঁধন মেনেও নিল। আর তার ফণা নেই,

নেই ফোঁসফোঁসানি। যদি কিছু বাড়তি জল বর্ষায় নেমে আসে তা চালান করে দেয় অন্য দিকে। পাহাড়ের গা থেকেই আর একটা ধারা অন্য দেশ অন্য গ্রাম দিয়ে বয়ে যায়। তাই শহরের মানুষ নিশ্চিন্ত। আর দিনের পর দিন বয়ে যাওয়া জল ক্রমাগত বালি ফেলে ফেলে চরের শরীর মোটা করেছে। নদী তাই নিজের বালি নিজেই অতিক্রম করতে পারে না। পঞ্চাশ গজেই প্রাণভোমরা ভুকপুক করে।

শহরটা কিন্তু চটপট নিজেকে সরিয়ে নিল। বেশ রঙচঙে হয়ে উঠেছে আবার। সেখান থেকে একটা লোক একদিন উঠে এল বাঁধে। উঠে জরিপ করল নদীর বুক। তারপর পিছন ফিরে চিৎকার করল শহরটার উদ্দেশ্যে। তার ঝুপড়িটা ভেঙে দিয়েছে নগরপাল। ঘর ভাড়া পাওয়া ওখানে স্বপ্নের মত ব্যাপার। শুধু দিনমজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রাত্তির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না। একটা ভিখিরীকেও এই শহরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ঝুপড়ি ভেঙে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেলখানায়। তিনদিন বেদম পিটুনি দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। পকেটে যার টাকা নেই তাকে কে দেবে ঘর! অন্য মজুররা ওই ভিনদেশীকে দেয়নি ঠাঁই। ফলে লোকটা উঠে এল বাঁধে। এসে বলল, শহরের মুখে আমি ইয়ে করি।

লোকটা বালির মধ্যে হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর কয়েকটা বাঁশ আর দরমা দিয়ে তৈরী করে নিল মাথা গোঁজার জায়গা। নিচু হয়ে ঢুকতে হয় কিন্তু জানলা কেটে নিল সে। ফুরফুরে বাতাস ঢুকতে লাগল অবিরত।

আর তাই দেখে শহরের লোক উঠল আঁতকে। একি পাগল! ওই সাপের গালে গাল রেখে কেউ ঘুমাতে পারে? খবরটা পৌঁছালো নগরপালের কাছে। তাঁরা কাগজ নেড়ে দেখলেন নদীর চর শহরের সম্পত্তি নয়। অতএব যে মরতে চায় সে মরুক, শহরের লোকের তাতে কি যায় আসে!

অতএব তিনমাসের মধ্যেই চালার গায়ে লতানো গাছের কচিপাতা বাতাসে দোল খেতে লাগল। সারাদিনে মজুরের কাজ সেরে বিকেলে ফিরে যায় লোকটা চালায়। শহরের লোক ভুলেও চরে পা দিত না। দূরের বাঁধে দাঁড়িয়ে তারা চালাটাকে দেখত আর হাসতো। লতানো গাছে কি যেন একটা ফলও ফলিয়েছে লোকটা। খবরটা শহরের নিচু তলায় পৌঁছে গেল। যারা কোনমতে ঘর যোগাড় করে আধপেটা খেয়ে পড়ে ছিল তাদের দুজন সাহস পেল। কোন রকমে আর একটা চালা তৈরী করে নিল খানিক তফাতে। তবে সে কিনা সংসারী মানুষ, বউ বাসন মাজে বাড়ি বাড়ি। দ্বিতীয় লোকটা অবশ্য সেই পয়সায় খায় না। তার গাঁজার মশলার হাত চমৎকার। এরকম একটা নির্জন চরে তার ব্যবসা জমে গেল খুব। সন্ধ্যে হলেই শহরের ছোকরারা বাঁধ পেরিয়ে নেমে আসে গাঁজার টানে। অবশ্য বউটি ফিরে এলেই হাওয়া হয়ে যায় বাউণ্ডুলেরা। তখন চড় চাপড় পড়ত গেঁজেলের ওপরে। প্রথম লোকটা শেষে চিৎকার করে বলেছিল, 'অ্যাই, যা কিছু ঝামেলা শহরে গিয়ে করবি, এই চরে যেন কোন শব্দ না হয়।' লোকটার বিশাল চেহারা, একমুখ দাড়ি দেখে ভয় পায় এরা।

তারপর একদিন মেঘ পাক খায় আকাশে। ফিনকি দিয়ে জল ঝরতে থাকে। দ্বিতীয়জনের বউ ছুটে যায় প্রথমজনের কাছে, 'কি হবে, বর্ষা এল যে!'

লোকটা হাত ঘোরায়, 'যা ভাগ। বৃষ্টি দেখতে দে। ভয় তো এলি কেন?' এই গায়ে পড়া ভাবটা একদম সহ্য হয় না তার। বউটা দু'তিনদিন চেষ্টা করেছিল ভালমন্দ খাবার পাঠিয়ে দিয়ে ভাব জমাতে। যেমন আছ তেমন থাকো, অত গা শোঁকাশোঁকির কি দরকার? গেঁজেলের খদ্দের কমেছে। বৃষ্টিতে চরে আসতে ভয় পায় সবাই। বউটা একটু নরম হয়েছে যদিও কিন্তু হঠাৎ জলের ভয় ধরেছে গেঁজেলেরও মনে। কিন্তু নদীটা যেন চিরে গেল হঠাৎ। ওপাশে

ছিল পোষা কুকুরের মত, একটা ধারা হঠাৎ এপাশে এসে গেল বর্ষার জল পেয়ে, কিন্তু স্বভাব হল আদুরে বেড়ালের মত। মাঝখানের চরটা উঁচু হয়ে শক্ত বালি আর দুটো চালা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগল বেশ। এখন বেশ সুবিধে হয়েছে বউটার। জলের ধারায় গা ডুবিয়ে স্নান করে। চরের দিকে ফিরে বুকের কাপড় ছাড়ে। লোকটাকে চোখ বন্ধ বরতে হয়। ছুটে গিয়ে শাসায় গেঁজেলটাকে, 'ভাল ভাবে যদি এখানে না থাকো তাহলে উড়িয়ে দেব চালা। গেঁজেলটা বুঝতে পারে না কিন্তু বউটা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে 'ঢঙ!'

একটা বর্ষা ফুরোলেই শুকনো বালি ওড়ে হাওয়ায় আর দুটো রিকশাওয়ালা নেমে আসে চরে। তাদের ডেরা ভেঙ্গেছে নগরপাল। সুন্দর উত্থান হবে সেখানে। এসে জিজ্ঞাসা করে প্রথমজনকে, 'এখানে ঘর তুলব? শহরে থাকার জায়গা নেই।'

লোকটা মাথা নাড়ে, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তবে আমার চালা থেকে তফাতে। আঁটোসাঁটো চালা বানায় তারা। তাই দেখে ভরসা বেড়ে গেল শহরের নড়বড়ে আধ-পেটাদের। তিনমাস না ঘুরতে পনের ঘর বাসিন্দা হয়ে গেল চরের। বালির ওপর বুনো ঘাস গজাচ্ছে, নধর লতানো গাছে চালাগুলো ছেয়ে যায়। আর একটা চালায় রেডিও বাজে সারাক্ষণ। তবে লোকটা ফিরে এলেই তার গলা নেমে যায়। শহরেব লোক সকাল বিকেল বাঁধে বেড়াতে এসে বলাবলি করে, সাহস খুব। একটা বর্ষা কোনমতে কেটেছে কিন্তু পরের বর্ষায় নদী ক্ষেপলে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে ব্যাটারা। নদীর স্বভাব জানে না এই পরগাছাগুলো।

কিন্তু একদিন দারোগাবাবু এলেন চারজন পুলিস পেছনে নিয়ে। বাঁধ থেকে বালিতে পা উঠিয়ে চালা অবধি হেঁটে এসে হাঁক দিলেন, 'এই, তোদের মোড়ল কে? সর্দার কোন হ্যায়?'

গেঁজেলটার বউ আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল আলাদা চালাটাকে। দারোগা তার সামনে গিয়ে গর্জন করল, 'কে আছিস, বেরিয়ে আয়!'

সারাদিন খেটেখুটে লোকটা, তখন সবে শুয়েছিল, অবাক হয়ে বেরিয়ে এসে দেখল পুলিস।

'তুই এই চরের মোড়ল ?'

লোকটা ঠোঁট নাড়ল। সে মোড়ল হতে যাবে কেন ? সে কারো সাতে পাঁচে থাকে না।

পিছন থেকে বউটা চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ বাবু, ও মোড়ল।'

'শোন। এই চর তোমাদের ছাড়তে হবে।' দারোগাবাবু হুকুম করলেন।

'ছাড়তে হবে ?' লোকটার চোখ ছোট হল, 'কেন ? অপরাধটা কি ?'

'এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুরিচামারি বেড়ে গেছে। লোকে বলছে চরের লোকই রাতে শহরে চুরি করতে যায়। এটা বেআইনি বসতি, অতএব উঠে যাও তোমরা। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।' দারোগাবাবু লাঠি নাচালেন।

লোকটা মাথা চুলকালো, 'অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

'কি ?'

'আপনার হাতে খারাপ ফোঁড়া হয়েছে।'

'আমার হাতে ?' দারোগাবাবু হকচকিয়ে দুটো হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'কই ? নেই তো! ইয়ার্কি হচ্ছে হারামজাদা, শুয়ার!'

লোকটা হাতজোড় করল, 'অভয় দিয়েছেন তাই বললাম। হুজুর, খারাপ ফোঁড়ার কথা শুনেই আপনি সেটাকে ডাক্তার দেখাতে গেলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ঠিক কিনা ? তাই তো ?'

'কি বলতে চাস ?'

'হুজুর, ভাল করে দেখুন এখানকার কেউ চুরি করে কিনা! সত্যি হলে আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

দারোগাবাবু হাসলেন, 'বুদ্ধিমান লোক মনে হচ্ছে। বেশ, ধরতে পারলে আমি সব চালায় আগুন ধরিয়ে দেব, মনে রাখিস।'

দারোগাবাবু চলে গেলে আনন্দিত লোকগুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে, 'দাদা, তুমি বাঁচালে এ যাত্রা। তোমাকে আমরা সবাই মোড়ল বলে মেনে নিলাম।'

লোকটা হুঙ্কার দিল, 'ভাগ শালারা! আমাকে একা থাকতে দে!'

লোকগুলো হেসে বলল, 'দাদার মন সরল, ঠিক সন্ন্যাসীর মত।'

লোকটা চেঁচালো, 'দারোগা কি বলে গেল সবাই নিশ্চয় শুনেছ। চোর-ছ্যাঁচোর এখানে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

লোকগুলো হেসে উঠল, তারপর ফিরে গেল যে যার ডেরায়। এই সময় একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এল হেলতে দুলতে। তার শরীর ভারী এবং চোখ চড়ুই পাখির মত উড়ছে বসছে। এসে বলল, 'চুরি-চামারি মানে কি?'

লোকটা নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে তাকাল, 'এটা আবার কে?'

দ্বিতীয় জনের বউ এগিয়ে এল পাশে, 'আমার বোন। এখন থেকে এখানে থাকবে।'

'অ। তা বোনকে চুরির মানে শিখিয়ে দাও।'

'আহা, তুমিই বল না শুনি! হুকুম করলে, চোর-ছ্যাঁচোর থাকতে পারবে না। তা চুরি করা কাকে বলে সেটা বলে দাও।' মেয়েটি চোখ ঘোরাল।

'অন্যের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হয়।' লোকটি ভেবে-চিন্তে জবাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'কেউ যদি জিনিসটা হারিয়ে ফেলে আর একজন যদি তা টুক করে তুলে নেয়?'

'সেটাও চুরি বলে।' লোকটা গম্ভীর গলায় জবাব দেয়।

'তাই?' চোখ ঘোরাল মেয়েটা। 'তাহলে তো চোর খুঁজতে যেতে হয়।'

'মানে ?'

'আমার একটা জিনিস চুরি গেছে।'

'কি জিনিস ?'

আঙ্গুল তুলে ধীরে ধীরে বুকের ওপর হাত রাখল মেয়েটা। রেখে হেসে উঠল উচ্চস্বরে। সঙ্গে সঙ্গে তার বোন আঁতকে উঠল, 'ওমা, কখন ?'

'ওই যে, যখন দারোগার সঙ্গে কথা বলছিল। কি চমৎকার কথা বলে, না দিদি ?'

লোকটা আর অপেক্ষা করল না। চালায় মাথা নামাবার আগে চিৎকার করল, 'ওসব ছেনালি কথাবার্তা আমার কাছে বলে সুবিধে হবে না। আমি মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াই না।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারাটাকে তুলে নিল হাওয়া, সমস্ত চরময় ছড়িয়ে দিল যেন ।

*

নদীর বুকে বালি জমে যাওয়ায় খালটার অবস্থা কাহিল। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে খালটা বয়ে যেতো। জল গিয়ে পড়তো নদীর বুকে। সেই মহাপ্রলয়ের সময় এই খালটাকেও সঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করেছিল নদী। নিজের জল উজিয়ে দিয়েছিল খালের বুকে। শহরের মানুষ সে রাস্তাও বন্ধ করেছে বাঁধ বেঁধে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছে লম্বা খালটা। একটু একটু করে মজে গেছে জল, তলার শ্যাওলারা পর্যন্ত অখুশী এখন। গেল বিজয়ার ভাসান পর্যন্ত নৌকোয় চেপে হয়নি খালের বুকে। একটা মরা আঁশটে গন্ধ ছড়ায় খালটা সারাদিন। শহরের মাতব্বররা বলল, এভাবে খালটাকে মেরে ফেলা ঠিক নয়। বেশ টলটলে জল থাকবে, নৌকো চলবে। হাউসবোট

ভাসালে লোক বেড়াতে আসবে এখানে, শহরটারও ইজ্জত বাড়বে। নানারকম ফন্দীফিকির চলতে লাগল খাল-উন্নয়নের জন্যে কিন্তু কোন রাস্তা বের হয় না। খালের সামান্য ঘোলাটে জল বাঁধের গায়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বাঁধের ওপাশে বালির চর। তার বহুদূরে নদীর ধারাটি বয়ে যায়। আগের মত খাল তার বুকে মুখ ডোবাতে পারে না। এমন কি তার শরীরের মাছগুলো গত গ্রীষ্মে পেট উল্টে ভেসে উঠেছে। এখন চওড়া খালের ওপারের সুন্দর সেতুগুলোকে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়।

তবে এটা ঠিক, খালটা শহরের লোকের কাছে নদীর তুলনায় অনেক আপন। এটা যদি সম্পূর্ণ বুজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হাজার হাজার টাকায় কাঠা কিনে বাড়ি বানাবার লোকের অভাব হবে না। বোধহয় তাই এই মরা খালের গায়ে কোন চালাঘর তুলতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। আবর্জনা বাড়াতে দেওয়া চলবে না। বাস করতে চাও চলে যাও নদীর চরে। সেখানে তোমার কি হল না হল তাতে কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব নেই। তবু শহরের মানুষ অবাক হয়ে ভাখে নদীর চরের মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বেশ গাছগাছালি লাগানো শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। ঘরদোরের গঠনও পাল্টাচ্ছে। বেশ শৌখিন আর মজবুত চেহারা নিচ্ছে সেগুলো। রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, দিনমজুর আর ঠিকে ঝি-দের চমৎকার পাড়া হয়ে গিয়েছে ওটা। বর্ষায় যখন এদিকে একটা ধারা গজিয়ে যায় তখন ভেলা করে পারাপার করে ওরা। সুন্দর হাওয়া বয় সারাদিন ওখানে। চাষবাসের একটা চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। রাত্রে কাছে পিঠে শেয়াল ডাকে না। শহরের কিছু বাউণ্ডুলে ছেলে চলে যায় ওখানে। লুকিয়ে গাঁজা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ওরা। এই নিয়ে ঝামেলা লেগেই আছে। আর গেল বর্ষায় খালটা জলে ভরে গিয়েছিল। সেই জল স্থির হয়ে থেকে একটা পচা গন্ধ আরও তীব্র হয়ে শহরে ছড়াচ্ছে। অসুখ-বিসুখ হচ্ছে

মানুষের। খালের জল ব্যবহার করা নিষেধ হয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন এবার খালটাকে বুজিয়েই ফেলবেন। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার যে পরিকল্পনা ছিল অর্থাভাবে বাতিল করে দিয়ে মোটা দামে জমি বিক্রী করে আর পাঁচটা ভাল কাজ করা যাবে।

*

সন্ধ্যে নাগাদ চরে ফিরে এল লোকটা একটা মাছ হাতে ঝুলিয়ে। চমৎকার নাদুস-নুদুস কাৎলা মাছ। এসে ঝাঁপ খুলে ওটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'যা, খুব ভুল হয়ে গেল! লোভে লোভে কিনে ফেললাম এখন কাটবে কে?'

'চিন্তা কি, কেটে দেব, রেঁধে দেব, খাইয়েও দিতে পারি।'

'কে?' চমকে উঠল লোকটা। ঘরটায় এখন আঁধার, 'এই ঘরে কে?'

লোকটার হাঁকডাকের উত্তরে একটা ছোট্ট হাসি বাজল, 'পেত্নী! চরের পেত্নী।'

দ্রুত হাতে কুপী জ্বালালো লোকটা। তারপর সেটাকে উঁচু করে লোক খুঁজল। আলো পড়তে বুকে আঁচল টানলো মেয়েটা, 'আঃ, লজ্জা লাগে না! ব্যাটাছেলের চোখ না তো করাতের দাঁত। নামাও ওটাকে!'

বাজ পড়ল ঘরে 'অ্যাই, এখানে কি চাই তোর? চুরি করার মতলব?'

'চুরি!' হাসল মেয়েটা, 'ডাকাতের ঘরে চুরি? লোকে হাততালি দেবে।'

'মানে? আমি ডাকাত?'

'নিশ্চয়ই। আমার মন ডাকাতি করেছ গো!' তারপর সুর

ধরলো, 'ও যে দিন-দুপুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই।' শুয়ে শুয়ে পা নাচালো, 'কি মাছ গো?'

লোকটি তখন তার বিশাল চেহারা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না নিচু ছাদের জন্যে। ঘাড় নামিয়ে তবু ছুটে এল পাশে, 'অ্যাই, ওঠ, বেরো এখান থেকে! যা, চলে যা!'

'কোথায় যাবো?'

'কেন তোর দিদির ঘর নেই। সেখানে গিয়ে জামাইবাবুর গাঁজা সাজ।'

'ওই জন্যে তো পালিয়ে এলাম, যত রাজ্যের বাবু ছোকরাগুলো দিনরাত সেখানে ঝঁাকিয়ে বসে থাকে। আমি গেলেই ড্যাবডেবিয়ে তাকায়। বুকের আঁচল ফেলে যে শোব তার উপায় নেই। রাক্ষস-গুলোর মধ্যে আমি থাকতে পারি? তুমি বল?' ঠোঁট ফোলালো মেয়েটি।

'কেন তোর দিদি কোথায়? সে মাগীর তো বড় মুখ!'

'অ, দিদির কথা আর বলো না। সে তো এখন জামাই-এর দোসর হয়েছে। গাঁজা খেতে এসে ছোকরাগুলো ভাল টাকা দেয় বলে রসের কথা বলে। দিদির এখন গতর খাটিয়ে ঝি-গিরি করতে বয়েই গেছে। ছিলিমে টান দিচ্ছে আর এর ওর সঙ্গে রস করছে। ওর মনে খুব দুঃখ।'

'দুঃখ? দুঃখ কেন?'

'বাঃ, দুঃখ হবে না? তোমার দিকে নাকি প্রথমে ঝুঁকেছিল। তখন এই চরে তোমরা দুইঘর ছাড়া নাকি মানুষ ছিল না। তা তুমি পাত্তা দাওনি।'

'পাত্তা দেব কেন? সে অন্যের বউ না?'

'তাই তো। তবে কাঁচ তো আর ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তার জন্যে হিরে চাই'। বলে খিলখিলিয়ে উঠল মেয়েটি।

'তা আমি কি করব এসব কথা শুনে। যেখানে ইচ্ছে হয়

সেখানে যাও, আমায় একা থাকতে দাও।' লোকটার গলার স্বর ভাঙছিল।

'বাঃ, তুমি জানো না তো কে জানবে? তুমি এখানকার মোড়ল।'

'না, আমি কেউ নই। একা থাকতে চরে এলাম তাও সব ভিড় জমালো।'

'তাহলে ওরা ঠিকই বলে।'

'কি বলে?'

'তুমি পুরুষ মানুষ নও। তাই লুকিয়ে থাকতে চাও।'

'কে বলে?' গর্জে উঠল লোকটা।

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। আমি বলি কি, আজকের রাতটা এখানেই থাকি!'

'না, কক্ষনো না।'

'তোমার পায়ে পড়ি চেঁচিয়ে ওদের জানিও না। তাহলে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে আমাকে। কাল সূর্য উঠলে আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'যেখানে দু'চোখ যায়। মেয়েছেলের শরীরে যৌবন থাকলে ঠিকানার অভাব হয় না। এখন মাছটা কাটবো?'

'মাছ?'

'ওই যে পড়ে আছে। দেখি দেখি ভাল করে আলো ফেলো তো। এমা, এ যে পোয়াতি মাছ! ব্যাটাছেলেদের কাটতে নেই।'

'পোয়াতি?'

'হ্যাঁ, দেখছ না পেট ভরতি ডিম?'

লোকটা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সত্যি মাছটার পেট বেশ ফোলা। কোনরকমে বলল, 'ঠিক আছে!' সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে কুপির আলো নিবিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা, 'তুমি কেমন পুরুষ দেখব আমি?'

ঝটকা মেরে ফেলে দিতে চাইল লোকটা। কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধরে মেয়েটা চাপা গলায় হিসহিস করল, 'ওরকম করলেই চেঁচাবো! বলব তুমি আমার ইজ্জত নিয়েছ।'

'আমি?' লোকটার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

'হুম্। লোকে দেখবে আমার শরীরে কাপড় নেই। গ্যাখো না, গ্যাখো। মিথ্যে বলছি না।'

*

মাঝ রাত্তিরে লোকটার মনে হল মেয়েরা হল নদীর মত। শুকিয়ে থাকলে মরা চর আর ঢল নামলেই কালনাগিনীর মত হিংস্র, যতক্ষণ না গিয়ে গিলছে ততক্ষণ শান্ত হয় না। এই যে মেয়েটা এখন তার শরীরের ওপর হেলান দিয়ে কি আরামেই না ঘুমোচ্ছে। দু'দুবার সে ঝড় তুলেছে তবে এই শান্তি। অবশ্য সুন্দর করে মাছ রেঁধেছিল, তাই দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়া গেছে। বেশ সুখী সুখী লাগছে আজ। ঘরে মেয়েছেলে থাকলেই হবে না, সেই মেয়েছেলেকে সুখ দিতে জানতে হবে তবেই পৃথিবীটাকে অন্যরকম লাগবে। তবে এ মেয়ে নির্ঘাৎ ভাল মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই অনেক ঘাট ঘুরেছে এর মধ্যে, নইলে এতো ছলাকলা শিখলো কি করে? যদি ভাবো খারাপ তো খারাপ, নইলে নয়। ওই নদীর কথাটাই ফিরে আসে। এ ঘাটে ছলাৎ ও ঘাটে ছলাৎ, কেউ করল স্নান কেউ কাচলো কাপড়, কিন্তু পরের ঘাটে নদী আবার নতুন। লোকটা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। ঘুম ভেঙ্গে হাঁসফাঁস করল মেয়েটি, অস্ফুট আওয়াজ বেরুল, 'কি হল?'

লোকটা বলল, 'বাঁধ দিলাম, বেঁধে নিলাম।'

মেয়েটি হেসে ফেলল অস্বস্তিতে, 'ওমা, আমি কি নদী?'

লোকটি বলল, 'তাঃ

*

রোদ উঠলে চরে শুরু হল হইচই। মেয়েটির বোন আর গেঁজেলটা এল তেড়ে। চেঁচিয়ে লোক জুটিয়ে আনল, 'সোমত্থ মেয়েকে নিয়ে শুয়েছে সারারাত, বিচার চাই।'

লোকজন উত্তেজিত ছিল। মেয়েটার জন্যে যাদের জিভে লালা জমতো তারা বলল বেশী। থানায় যাও, পুলিস ডাকো। একি কেলেঙ্কারী! যাকে মোড়ল ভাবা হয় সে-ই কিনা এই পাপ করল! লোকটা মেয়েটার দিকে তাকাল, 'কি বলছে সবাই, শুনেছিস!'

মেয়েটা শরীর মোচড়ালো, 'তুমি শোন, ঘুম পাচ্ছে আমার!'

মেয়েটার বোন তাতে ভোলে না। তার টাকা চাই।

ক্ষতিপূরণ করতে হবে। খাইয়েছে পরিয়েছে যাকে, তাকে বেইজ্জত করেছে। লোকটা বলল, 'আমার টাকা নেই।'

এরা নাছোড়বান্দা। কাজে যাওয়া হল না লোকটার। দুশো টাকা চাই। নগদ। এক পয়সা কম নয়। লোকটা মাথা নাড়ে, অসম্ভব। দুপুর নাগাদ ঘুমিয়ে-টুমিয়ে মেয়েটা বেরিয়ে এল চালা থেকে, 'দিয়ে দাও দুশো।'

লোকটা বলল, 'কোথায় পাবো?'

মেয়েটা বলল, 'তা বললে চলে। ঠিক আছে, আমি দিদির কাছে রইলাম, তুমি টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো আমাকে।' গতর দুলিয়ে সে চলে গেল বোনের সঙ্গে। লোকটার সামনে শুয়েছিল একটা নেড়ি, প্রচণ্ড লাথি খেয়ে সেটা চর ফাটাতে লাগল চিৎকারে। কি করা যায় বুঝতে পারছিল না লোকটা। ভিড় এখন পাতলা। রেডিও বাজছে কোন এক চালায়। গেঁজেলের ঘরে মেয়েটা সেঁধিয়েছে বোনের হাত ধরে। সেখানে জমেছে শহরের ছোকরা-গুলো। লোকটা ছটপট করছিল। টাকা তার আছে। সর্বসাকুল্যে

আড়াইশো টাকা। তার নিজের চালার তলায় বালি খুঁড়ে এক হাত গেলে টিনের কৌটোয়। কিন্তু সে টাকা জমিয়েছে আপদ বিপদের জন্যে। দূরের চালাগুলোর দিকে তাকাল সে। বেশ সংসারী সংসারী চেহারা। ওপাশের ধুধু-চর ঝলকাচ্ছে এখন। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠল। চালায় ঢুকতেই মোচড় দিল মন। এরকমটা কখনও হয়নি। কালকের রাতটাই সব গোলমাল পাকিয়ে দিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি তবু খিদে পাচ্ছে না। বিছানার দিকে তাকাতেই কষ্টটা বেড়ে গেল। মেয়েমানুষের শরীর, তার ব্যবহার, দুটো কথাবার্তার টোকা আর রান্নার স্বাদ শালা পাইথনের মত। একবার গিললে আর ছাড়ে না। দ্রুত হাতে বালি খুঁড়ে কৌটোটা বের করল সে।

গেঁজেলটার চালার দরজা সরিয়ে উঁকি মারতেই মন হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। বাপরে বাপ! গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর এখন ভাসছে। ওকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। পা ছড়িয়ে সে শুয়ে ছিল বোনের পাশে। সেই পায়ে হাত বোলাচ্ছে শহুরে ছোকরা। লোকটা চেঁচালো, 'উঠে আয়।' তারপর ছুঁড়ে দিল টাকাগুলো। বোনটা দ্রুত হাতে কুড়িয়ে নিয়ে গুণে বলল, 'দুশো।' তড়াক করে বেরিয়ে এল মেয়েটা, 'তবে যে বললে টাকা নেই? মরণ! এই নাহলে পুরুষ মানুষ!'

*

মাস তিনেক বাদে এক সকালে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। অবাক হয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?' মেয়েটা পা ছড়িয়ে বসল, 'কি হবে আমার! পেটে একজন এসে গেল সাত তাড়াতাড়ি।'

লোকটা হেসে বলল, 'এই কথা।'

'হেসো না। এখন তোয়াজ করবে কি দিয়ে? ক'টা টাকা কামাও? আমার এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াও দিকি!' মেয়েটা চোখ ঘোরাল।

লোকটার জিভ শুকিয়ে এল। শহরে মাংসের দাম অনেক। মাল বয়ে যা পায় তাতে দু'বেলা ভাত আর সেদ্ধ জোটে। তবু কোনরকমে একজনের জন্যে মাংস নিয়ে এল বিকেল বেলায়। চেটেপুটে খেয়ে নিল মেয়েটা। খেয়ে বলল, 'আমি খাচ্ছি না পেটেরটা খেল। কাল একটু ইলিশ এনো।'

লোকটা বলল, 'টাকা নেই। অত নোলা কেন?'

মেয়েটা বলল, 'পুরুষ মানুষ তো বাচ্চা ধরে না, বুঝবে কি!' লোকটা গোঁজ হয়ে রইল।

দুদিন বাদে মেয়েটা বলল, 'দিদির যে কাজ ছিল শহরে তা আমায় নিতে বলল। ভালই হবে, দুটো পয়সা পাবো।'

লোকটা বলল, 'খবরদার, তুই শহরে যাবি না।'

'কেন, গেলে কি আমায় খেয়ে ফেলবে? পেটে বাচ্চা আছে না?' মেয়েটা রুখে দাঁড়াল। লোকটা ভাবল, তা বটে। রক্ষা-কবচ তো পেটে বাঁধা। ভয় কি!

দুদিন বাদে বেশ রগরগে ইলিশ রাঁধলো মেয়েটা। লোকটার পাতে ধরে দিয়ে বলল, 'পেটি খাও।' লোকটা অবাক গলায় বলল, 'পেলি কোথায়? এর তো বহুত দাম।' মেয়েটা হাসল, 'যে বাড়িতে কাজ করি তার বাবু দিয়েছে। বাজার থেকে আসছিল, পথে দেখা হতে হেসে বললাম, 'কতকাল খাইনি। বাবু গলে গিয়ে দিয়ে দিল।'

মাথায় আগুন চড়ে গেল লোকটার, 'খবরদার, ও বাড়িতে আর ঢুকবি না।'

মেয়েটা বলল, 'কেন?

'ও তোর সর্বনাশ করবে।' লোকটা গর্জালো।

'মাথা খারাপ তোমার। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কাল সন্দেশ আনবো।'

'কোত্থেকে ?'

'আর একটা বাবু দেবে বলেছে।'

লোকটা আর পারল না। লাথি মারল ইলিশ মাছে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'ফের যদি শহরে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মারব। সেদ্ধভাতে সুখ হবে কিনা বল ?'

মূর্তি দেখে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। ভয়ে ভয়ে বলল, 'হবে।'

লোকটা চেঁচালো, 'শহরে কেউ তোর গায়ে হাত দিয়েছে।'

মেয়েটা সভয়ে মাথা নাড়ল, 'না।'

দুদিন বাদে মেয়েটা আবার উসখুস করল। লোকটা বলল, 'কি চাই ?'

'আচার। আমের।'

'এই চরে ওসব পাওয়া যায় না। আমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করিস কেন ? দিদির কাছে গিয়ে চাইতে পারিস না ?' লোকটা মুখ ফেরালো।

'দিদির কাছে চাইলে তোমার মানে লাগবে না ?'

'একি কথা! বোন দিদির কাছে চাইলে আমার মান যাবে কেন ?'

তিনদিন বাদে এক বোতল বড় আচার এল। লোকটা বলল, 'বাবাঃ, এত কে দিল ?' মেয়েটা লাজুক হাসল, 'খেয়ে ছাখো না একটু।'

'কে দিল ? তোর দিদি ?'

'না, দিদির খদ্দের। ওই যে শহরের লোকটা যে গাঁজা খেতে আসে। আমার ইচ্ছের কথা শুনে শহর থেকে এনে দিল।'

'এমনি এমনি কেউ দেয় ? কি করছিল ও ?'

'কিছু না। শুধু বলছিল তোমার মিষ্টি হাতে গাঁজা সাজিয়ে দাও, দিয়েছিলাম।'

আগুন হল লোকটা, 'খবরদার, আর ও ঘরে যাবি না। হাত কেটে ফেলব।'

অনেক রাত্তিরে মেয়েটা আদর খেতে খেতে বলল, 'তবে যে তুমি বল আমি নদীর মত তাহলে এত অবিশ্বাস কর কেন?'

লোকটা সরল গলায় বলল, 'নদীর মত হারামি আর কেউ নেই।'

*

এবার বর্ষার রোয়াব যেন বেড়ে গেল দশগুণ। ভেলায় চেপে পারাপার শুরু হল চর থেকে। শহরের ভেতর যে খাল সেটা হয়ে গেল টইটুম্বুর। সাত দিনেও বৃষ্টি থামে না। বৃষ্টির জল জমেছে রাস্তায়। খালের জল উপচে উঠল দু'পাশের শহরে। জলটা বাড়ছেই কারণ বেরিয়ে যাওয়ার মুখ বন্ধ। সেখানে বাঁধ আছে নদীকে আগলাতে। খবর এল পাহাড়ে জব্বর জল ঝরছে। সব ঝোরা এসে লাফিয়ে পড়ছে নদীতে। পুলিস হেঁকে বলে গেল, চরের লোক পালাও নইলে এবার ডুববে। পড়ি কি মরি করে পালানো শুরু হল। যা কিছু শখের তাই নিয়ে লোকজন উঠল বাঁধে। প্রসববেদনা সামলে মেয়েটা বলল, 'পালাবে না?'

লোকটা মাথা নাড়ল 'না।' মেয়েটা আঁতকে উঠল, 'জল আসছে, ভাসাবে সব।'

'আসুক আগে। অত মানুষের দঙ্গল আমার ভাল লগে না।' বলে মেয়েটির স্ফীত উদরে হাত বুলিয়ে দিল, 'এখানেই বাচ্চাটা হোক। এই নিরিবিলিতে।'

'তুমি কি পাগল ? যেটা আসছে তার কথা ভাবো।' মেয়েটা ককিয়ে উঠল।

'ভাবনার কিছু নেই।'

মেয়েটা অসহায় চোখে তাকাল। এখন এই লোকটার ওপর নির্ভরতা এত বেড়েছে যে একা চলে যাওয়ার সামর্থ তার নেই। সে দুহাতে লোকটাকে জড়িয়ে কষ্ট সামলালো।

নদীর বুকে ঢল নেমেছিল পাহাড়ের নিচে। সেটা গড়িয়ে আসতে আসতে দুদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। চরের বালি এত উঁচু যে সোজা আসতে পারছে না। ফলে জলের ধারা মাঠ ভরিয়ে পাকা রাস্তাটাকে বেছে নিল খাত হিসেবে। যেহেতু নদীর বিপরীত দিকে তাই ওই অংশে বাঁধ গড়া হয়নি। নিচু জমি পেয়ে ছুটে যাচ্ছিল জল। বৃষ্টি থামছিল না। ময়লা ন্যাতার মত চপচপে আকাশটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছিল। নদীর জল সেই মদত পেয়ে ঢুকে গেল খালে। টইটুম্বুর খালটা বহুদিন পরে নদীর স্পর্শ পেয়ে ছিটকে উঠল আকাশে। আর তখনই ডুবে গেল শহরটা। উল্টো দিক থেকে জল ঢুকছে কিন্তু বেরোবার পথ বাঁধের জন্যে বন্ধ। সমস্ত শহরের লোক যে যেভাবে পারে ছুটে এল বাঁধের ওপর প্রাণ বাঁচাতে। জলটা পাক খাচ্ছে শহরে। একতলা বাড়িগুলো গেল তলিয়ে। মানুষ আর জন্তুর মৃতদেহ ভাসতে লাগল সেই ঢেউয়ে। অতবড় শহরটা অতিকায় হ্রদ-এর চেহারা নিয়ে নিল এবার। বাঁধগুলো তার দেওয়াল।

বাঁধে আর মানুষ ধরে না। হঠাৎ ওদের নজর পড়ল চরটার দিকে। বিশাল নদীর চর শুকনো পড়ে রয়েছে। নিজের জমা করা বালি ঠেলে নদীর জল এদিকে আসতে পারেনি। কিছু লোক নেমে এল চরে। এসে হাত-পা ছড়িয়ে ববল, 'কি আরাম !'

তাদের আরাম দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হল। মুহূর্তেই বাঁধের সঙ্কীর্ণ জায়গা ছেড়ে শহরের সব মানুষ পিল পিল করে নেমে এল চরে। বাতিল চালার মালিকরা অসহায় চোখে দেখছিল তাদের

চালাগুলো বেহাত হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারাও মিশে গেল শহরের লোকদের মধ্যে। এই মুহূর্তে পোশাকে আচরণে ওদের আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

লোকটা এক হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে দেখছিল এই জন-স্রোত। এখন তার চারপাশে শুধু মানুষের মুখ। সে চাপা গলায় বলল, 'শালা!'

মেয়েটা বলল 'ওরা যে শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এল।'

লোকটা দ্রুত হাতে বালি খুঁড়ে টাকা বের করে বলল, 'চল।'

'কোথায়?' মেয়েটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা কোন উত্তর দিল না। মেয়েটাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বাঁধের ওপরে। তখন শহরের কোন মানুষ বাঁধে নেই। এমনকি চরের লোকেরাও এখন সেখানে। লোকটা দেখল শহরটা এখন বিশাল হ্রদ, জল ফুঁসছে। আর চরটা যেন আচমকা শহর হয়ে গিয়েছে। রাত ঘনালে চরে আলো জ্বলে উঠল। লক্ষ লক্ষ হায়নার চোখের মত জ্বলতে লাগল চরটা। আর শহরটা গভীর জঙ্গলের মত অন্ধকারে মাখামাখি। মেয়েটার যন্ত্রণা বাড়ছিল। শেষে চিৎকার করে উঠল, 'ও, মাগো!'

লোকটা তাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। এবার কষ্ট মুছিয়ে দেবার গলায় বলল, 'বিয়ো, খুশী মনে বিয়ো।' মেয়েটার কানে সে কথা ঢুকল না। কাটা ছাগলের মত ছটফট করছিল সে। ওলট-পালট হওয়া শহর আর নদীর শব্দ শুনতে শুনতে গালে হাত দিয়ে লোকটা বিহ্বল গলায় বলল, 'এখানে কেউ নেই, এই বেলা সেরে নে।'

—

কবিতা

শিল্পী—পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাতে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে গেছে
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলুদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক-চেপে ধরে
এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল—
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি।

তারপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ-চাপা দিয়ে
দড়ি পাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভালবাসার জন্যে ভালবাসা,
তা ছাড়া আর কী,
এই কথাটাই বোকার মতো গোপন করেছি
কলকাতা শহরে।

বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করছে প্রচণ্ড পিপাসা।
অথচ কলঘরে
জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় ফোঁটায়।
অন্দরে তোর সদর তোলে মাথা,
হারে রে কলকাতা,
দুধের বিন্দু শুকিয়ে আছে বুকের শুকনো বোঁটায়।

যাওয়ার জন্য যাওয়া যেমন, আসার জন্যে আসা,
তেমনি ভালবাসা।
তেমনি করেই ফিরেছি তোর বিষণ্ণ কলঘরে।

দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, আবার কাছে আসি,
ভালবাসার জন্যে ভালবাসি।
তা ছাড়া আর কী!
এই কথাটাই বোকার মতো গোপন করেছি
কলকাতা শহরে।

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠানের কোণে।
ছায়া ছিলো, মায়া ছিলো, মুথা ঘাস ছিল
ছাঁচতলায় আর ছিলো বৃষ্টি-ক্ষতগুলি····
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে
কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
কেউ ধীর পায়ে এসে, ত্রস্ত, একা একা

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
গভীর গভীরতর রাত হয়ে এলো

কেউ সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি

গভীর গভীরতর রাত শেষ হলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি।

—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

গত বছর এমন দিনে ছোট্ট ছিলে
এই বছরে হঠাৎ হলে মস্ত বড়ো ;
তোমায় বাঁধে এমন বিছে কেউ শেখেনি,
যত বিশাল পাত্রে রাখি, উপচে পড়ো।

গত বছর হাত দু'খানি শালুকপারা
অবলীলায় খেলতে দিতে, সবাই জানে—
আজ কী হোল, চমকে ওঠ চোখ তোল না
কাঁচা আমটি হারিয়ে এলে কোন বাগানে ?

এক বছরের বৃষ্টি পেয়ে তুমি হঠাৎ
ছটফটিয়ে ফুটে উঠলে—ডাগর ভারি ;
এক বছরের চৈত্রে আমি ঝরে গেলাম
শুকনো হাওয়া চাবুক মারে ফুলকুমারী।

—পূর্ণেন্দু পত্রী

দুঃখ দিয়েছিলে তুমি
আবার লাইটার দিয়েছিলে।
বোতাম ছিঁড়ে আমাকে নগ্ন করেছো তুমি
আবার বুনে দিয়েছো নাইলনের সবুজ জামা।
কমলালেবু নিংড়ে নিংড়ে বানালে শরবত
ভিতরে মিশিয়ে দিলে গোপন কান্নাকাটি
স্মৃতির পেস্তা-বাদাম।
সেই সরবত খেতে হবে এখন প্রত্যহ,
বাইশ বছরের যুবকটা যতদিন আমার
চুলের ভিতরে আঁচড়াবে
আগুন রঙের চিরুনি।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

গোসলখানায় ঢুকে বলেছিলে একদিন আমায় করাবে স্নান
সেই থেকে বুক আনচান করে
কেঁপে আছি ভেতরে ভেতরে
ব্যগ্র ব্যাকুল হাতে সাবান জোগাড় করি
গন্ধতেল আর নির্যাস
মাথাঘষা রিঠে তাও যত্ন করে রেখেছি কৌটোয়
আর আছে প্রলেপন কমলা সরের
কখন মাখাবে তেল কখন সাবান কখন বা অঙ্গরাগ
তা তো জানা নেই
তোয়ালে গামছা দুই রেখেছি একান্তে কেচে
যে কোনওটা নিও অভিরুচি
জল মুছি জল মুছি বলবে যখন তুমি
তখন দু'হাত ধরে আবদারে জড়ানো গলায়
বলব আরেকটু থাক বলব আরেকটু রাখো
নরম সাবান এই বুকে
তেলের সঙ্গে দাও মাখিয়ে তোমার পৌরুষ
সেই ছবি কল্পনায় সারা দেহ টানটান
প্রতীক্ষায় দিন কাটে প্রতীক্ষায় রাত
হয়তো প্রাপ্তির চেয়ে স্বপ্নই অধিক মধুর
জানি না অঙ্গের কি যে আচরণ গোসলখানায়
দরোজা যদি বন্ধ করে দাও অকস্মাৎ

—রাখাল বিশ্বাস

ভালোবেসে নামতে পারি
উপত্যকার বিহ্বলতায়
চোখের জলে, নদীর কাছে
সুখের কাছে, তপ্ত কথায়।

ভালোবেসে নামতে পারি
সর্বনাশের ধুলোর দিকে
গোলাপ তুমি অট্টহাসির
নাচাও কেন ঝর্ণাটিকে ?

ভালোবেসে নামতে পারি
আঁধার রাতের অন্ধকারে
মেঘের দুপুর জড়িয়ে আছি
বকুল হাওয়ায় বারে বারে

সারাজীবন একটি খেলা
বুকের ভিতর, মর্মতলে,
কোন বিরহের দু'কূল জুড়ে
সই গো, তোমার আগুন জ্বলে।

—কৃষ্ণা বসু

মনোহরণ সন্ধ্যা এলো, চিত্ত হরণ দাহ
ছড়াচ্ছে দিক দিগন্তরে অনন্ত সংবাহ,
বিলোচ্ছে কী পুষ্পসুবাস বাসাচ্ছে কী ভালো!
এই এত দিন শুষ্ক ছিলাম, এবার দিল আলো
জীবন এবার জুড়ালো হায়! পোড়া জীবন জুড়ে
খরার মাঠে মেঘ জমেছে বৃষ্টি ঘন পড়ে,
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে, জল চলেছে ঘুরে,
জল চলেছে ঘুরে ঘুরেই, জল চলেছে ঘুরে,
নদী হয়ে নামবে নাকি' নিকট কিম্বা দূরে?
সাতটি তো না, একটি মাত্র সমুদ্রকে চায়,
নদী আমার, সোহাগী খুব, সাগর নোনা হায়!

—শ্যামলকান্তি দাশ

আইবুড়ো-ভাত খেতে সেদিন টুকটুকি
আমাদের বাড়ি এসেছিল।
খাওয়া-দাওয়ার পর এঁটো থালায় কড়ে আঙুল দিয়ে
টুকটুকি মানুষের মুখ আঁকছিল।
মুখ আঁকতে আঁকতে নৌকো
নৌকো আঁকতে আঁকতে মাছ,
মাছ আঁকতে আঁকতে পতঙ্গ
কিন্তু কোনো ছবিই তার ঠিকমতো পছন্দ হচ্ছিল না।
আসলে এইরকম অনেকগুলো অপছন্দের সঙ্গে আজ
টুকটুকির বিয়ে।

টুকটুকির বর লোক ভালো
কাকে যমক বলে আর কাকে উৎপ্রেক্ষা
এসব জানতে তার বয়ে গেছে
কিন্তু সে কবিতা লেখে অতি চমৎকার।
নদীর ঢেউ গুণতে গুণতে সে রাত্রি কাবার করে দেয়
কিন্তু একটাও নদীর নাম জানে না।
তার কবিতায় এত সাপের ছড়াছড়ি
কিন্তু সে চেনে না কোন্‌টা চন্দ্রবোড়া আর কোন্‌টা চিতি।
আজ টুকটুকির বিয়ে
ভাবছি আজ তাকে ঝোপঝাড়সুদ্ধ একটা আস্ত
লাউডগা সাপের বাচ্চা উপহার দেব।

টুকটুকিই বা মেয়ে হিসেবে কম কী!
কতবার সে যে আমার জন্য কালো-হলুদ ডোরাকাটা হয়েছে
আর কতবার ঘন সবুজ বনবাদাড়
তার কোনো হিসেব নেই!
মনে পড়ে সে শুধু পুকুরের ভাষা বুঝত
আমি তাকে হাত ধরে অন্ধকার চিনতে শিখিয়েছিলাম।

আজ টুকটুকির বিয়ে
ভাবছি আমার এই দীর্ঘ কালো মণিমাণিক্যে গাঁথা শরীর
আজ তাকে উপহার দেব!

তার চোখে আগুন জ্বলে উঠবে কি না জানি না!

—মলয় সিংহ

অদ্ভুত,
এ অন্যরকমভাবে ভালোবাসা উজাড় করলে তুমি
অনন্ত ফুলের মাঝে হঠাৎ ফুটে উঠলো কুসুম
এ আমার তো জানাই ছিলো না ;
ভাবতেও পারিনি যে তোমার সৌরভ এত বেগবতী
নদীটির স্রোত ম্লান হয়ে গেল।

তোমার কুসুম দেহে এত উদ্ধার, এত উষ্ণ অবগাহন ?

পুরুষের কাঠিন্য ওই সূর্য থেকে এলো বলে উত্তপ্ত অধীর
বসন্তের প্রথম বাতাস সে সইতে পারে না ;
তাকে ঢেকে দাও ;
রেণু দিয়ে রক্তিম —উদাত্ত করো।

তোমার আনন্দ-নদী ব্যক্তিত্বে বড়ো বেশি আরাম এনে দিলে
আমি পাগল, পাগল হয়ে যাই ;
পথিক দেখি না কোনও, ঘরও দেখি না—শুধু তোমাকে
তোমাকেই চাই।

হয়তো বিলাস হলো, সহজ হলো না কাছে থাকা।

—প্রমোদ বসু

লঘু স্বভাবের গান আর এ-কণ্ঠ নেবে না।
কঠিন কথার জন্যে এসো প্রথাবিরুদ্ধ প্রেম,
তোমাকেই প্রাণপণে চাই।

লঘু স্বভাবের প্রেম আর শরীর নেবে না।
এসো প্রেম অন্নে ও জঠরে,
এসো অন্ধ, মূর্খ দেশাচারে,
এসো মিথ্যে, ভুল রক্তপাতে।

এসো ঘর-হিম-করা অমর্ত্য দারিদ্র্যে,
এসো নিরাবেগ কঠিন বাস্তবে।

এখন চিতার কাঠে আগুনও প্রেমিক,
অন্ধকার কথা বলে সকালের বাংলা ভাষায়।

জ্বলে প্রেম, দেহপ্রেম, শরীর সর্বস্বে—
যা শুধু শিথিল, গতানুগতিক।

—রতনতনু ঘাটী

সেদিনের সেই গল্পটার কথা যদি বলো
আমি বলব, আমার কিচ্ছু মনে নেই ।
অতশত কিছুই মনে থাকে না বলেই
সেই যেদিন ছোট্ট নদীর ধারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে,
তার কোনো ক্ষত আজ নেই ।
অথচ সেদিন দুটি পাতায় গড়াতে গড়াতে
কীভাবে রাত্রি হয়েছিল ভোর —সব মনে আছে !

আসলে তুমি তো শহরের মেয়ে, তুমি কখনো
কুয়াশা জড়ানো ভোরের খামার ছাখোনি ।
মনসাপোতার খালের কাঠের সাঁকোটি পেরিয়ে
অন্ধকার কিশোরীটি যে কিশোরের বুক ভেঙে গেছে
তুমি তার এক মহাসাগর কষ্টের কিছুই বুঝবে না ।

এখন আমার হৃদয়ে কোনো ক্ষত নেই ।
ছোটখাটো দুঃখগুলো লতায়-পাতায় আজ
পুষ্পবতী তুমি !

—জয় গোস্বামী

ঘুমোচ্ছে বুঝি নি, আমি জানলা খুলে দিতে গেছি ভোরে
ভোরেরও তখন রাত্তি, হাওয়াতে সে পাশ ফিরে শোয়
নদীর সামনের মাঠে। উপরে চক্কর মারছে চাঁদ—
চাঁদ জ্বলজ্বলে চোখে নেমে এসে তার পাশে দাঁড়ায়
তাকায় দু'দিকে আর খুব সাবধানে শুঁকে ছাখে,
জিভ দিয়ে চাটে ঠোঁট, দূর থেকে স্পষ্ট হয় রোঁয়া,
তারপরই ছোঁয় বুঝি একবার, কেননা তক্ষুনি
চমকে পিছনে হঠে, লাফ দিয়ে, গোঙাতে গোঙাতে
উঠে যেতে থাকে ফের পশ্চিম গির্জার মাথায়
আমি ফিরে এসে দেখি খাট ভরে যে-চুল ছড়ানো
তা থেকে অজস্র সোনা ঝরে আছে ঘরের মেঝেতে !

—চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

অমন অপাপবিদ্ধ
আলো, তার শাদা প্রান্তে সময়ের ধূলো লেগে আছে।

দেবতা বললেন, তবে বৃষ্টি হোক আজ।
আমি সূত্রবাহিকার মতো জল এনেছি মাটিতে ;
নিচু ঘরগুলি রাতে জলমগ্ন হবে।

এই নান্দনিক দৃশ্যাবলী ঘিরে রাখে আমাদের ;
রমণীর মতো নিরুপম জাল বোনে,
জাল ছিন্ন করে।
দূরে, শ্মশানের মাঠে হেসে ওঠে চতুর-করোটি।

বিষণ্ণতাময় এ-আলোকরাশি, এর চেয়ে অন্ধকার ভালো !
গুঁড়ো সাবানের মতো জ্যোৎস্না ঝরিয়ে আজ
ডাইনিরা হাত ধুচ্ছে, দেখি আর
পাণ্ডুর আলোয় এই শ্বা-দন্ত আমার জ্বলে ওঠে।

জ্যোৎস্না ও প্লাবনের মাঝে ছন্দোময়
দুলে ওঠা সেতুটিও ... ...

ও-পারে জ্যোৎস্না মেখে সারি সারি শব শুয়ে আছে;
মুগ্ধ এ বিভেদকারী চোখ, তুলসিপাতায় ঢেকে
সাজিয়ে তুলেছি চিতা।

কেন-যে আবার কাছে টেনে আনো আগ্নেয়শকট
কেন-যে আবার সেই অন্ধকার স্রোত!

প্রকৃতির কাছাকাছি
চোখ দুটি পেতে দিই অবশ, বিহ্বল!
মৃদু স্বরে গান গায়, কথা বলে কেউ,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম ভেঙে কেউ কেঁদে ওঠে।

এই রূপ, এই অশ্রুজল ঠেকানো যেত না বুঝি!
ভ্রূণ-হন্তারক শর ছুঁড়েছো তুমিও
স্ফীত চাঁদ লক্ষ্য করে।
আজ সারারাত
মিশকালো অন্ধকারে আমরা দু'জন জেগে আছি।

—উদয়ারুণ রায়

প্রতি মাসেই
ছু-এক ঘণ্টা সময় দিও
আমার জন্য
সাদা-কালোয় আঙুল মিলবে
সন্ধ্যেবেলা
হাওয়ায় ভাসবে সবুজ গন্ধ
ইতস্ততঃ।
জোয়ার আসবে চলকে উঠবে
স্রোতস্বিণী।
হাসবে নাচবে ভাসিয়ে দেবে গাছের পাতা
ছলাৎ ছলাৎ

এমন সময়
আমরা তুজন পেরিয়ে যাব
প্রকাণ্ড বাঁধ
ঘোড়ায় চড়ব। তুলবে কোমর।
হাতের মুঠোয়
বন্দী থাকবে ছোট্ট টিলা
ওষ্ঠ রাখব রঙীন মেঘে
অরণ্য শির
তুলবে হাওয়ায়, ডাইনে বামে।

অনুভূতির
ধোঁয়াস শরীর পেঁচিয়ে নেবে
সিংহকটি।
ছুটতে ছুটতে অশ্বখুরে মিলিয়ে যাবা
অচিন ব্যোমে।

প্রতি মাসেই
কয়েক ঘণ্টা ঘোড়ায় চড়ব
আমরা দু'জন।

—বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

ভাসমান বিজ্ঞাপনে ওই মুখ ডুবে গেছে তার
চারদিকে এখন পুকুর, শিশুজল, পুকুরের মাঝখানে
জলের বলয় ছাড়া অন্য কিছু নেই ; তবু একা পেলে
কিছুক্ষণ একা পেলে তাকে, কপালে আঁকবো কৃষিকাজ
মাটি খুঁড়ে তাকেও নামাব নিচে, জলের তলায়
তখন ও মেয়ে তুমি কথা কি বলবে ঠিক আগের **মতন** ?
তখন ও মেয়ে তুমি অন্য মেয়ে লোকে বলে অন্য কার মেয়ে
রুমালে মুছবে ঠিক কপালের ঘাম ? দু'হাত পেছনে রেখে
গোছাবেই চুল ? জলের তলায় পা ছুঁয়েছিলে বলে
বুক থেকে হাত তুলে ছোঁবে কি কপাল ? শিশুজল নয়
কপালের কৃষিকাজ ছাড়া তোমার শহরে আজ অন্য কিছু নেই
যেমন শহরে নেই যথেষ্ট শহর, সামান্য পুকুর ছাড়া
যা রয়েছে ছেঁড়াখোঁড়া ঋতুবিজ্ঞাপন, ডুবে যাওয়া
কী ক্ষুদ্র স্টেশান, সহসা কপাল ছুঁয়ে সিঁথি বরাবর
সোজা ছুটে যাবে ৮টা ১৯-এর ট্রেন, আর তুমি !
তুমি তো থাকবে না তখন, অন্য মেয়ে লোকে বলে
অন্য কার মেয়ে, আমি শুধু ভাসমান বিজ্ঞাপনে
ওই মুখ ডুবে যাওয়া দেখব।

—পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

সেই কবে ভালোবেসেছিলে মনে নেই
এখনও চাঁদ ওঠে, বাসন্তী রঙের ছোঁয়ায়
সারা আকাশ লুটোপুটি।

শ্মশানের হরিধ্বনির মতো বিগত দিনগুলি
ক্রমশই তাড়া করে
একাকী আনমনে। বাতাসের
খেলা দেখি শরতের ছায়ায় ছায়ায়।

দেহাতী পাখির ডাকগুলো শহরমুখো
কেমন যেন বাঁধনহীন, আলগা
হয়ে যায়। সন্ধ্যার আকাশে আতর
ছড়ানো নিয়ে আগে কত
মারামারি হত। বহুদিন আগে।

তবুও সমস্ত অন্ধকার ভেঙ্গে কারা যেন ভালোবাসে
দু'হাতে দু'হাতে।
রঙের ছোঁয়ায় যেন
সারা আকাশ লুটোপুটি।
ভাসা ভাসা অন্ধকারে
কারা যেন কাছে ডাকে,
চাঁদের বাসন্তী রঙ
সাক্ষী হয় বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।

—তাপস মহাপাত্র

এই প্রথম বুনো হাঁস হয়ে বসেছি নীল করোটির ওপর।

রয়ে বসে ভীষণ সবুজ ছড়িয়েছি আজকাল,
এসো, রঙ নাও, গাছ সাজো,
একটু একটু বদলে যাওয়া ভালো।

একটা কিছু প্রলয়ের আগে মানুষও গাছ সাজে
গায়ে গতরে ছড়ায় সালোকসংশ্লেষ,
দেখেছি তার শস্যকান্নাও কদাচিৎ,
তাই হিরণ্য করোটির ওপর আজ বসেছি বুনো-হাঁস হয়ে।

বলো—এই তো পরমানুবাদ।

ছেঁড়া খোঁড়া আকাশের গা পোড়া গন্ধ ঢেকে আছে,
ফিনফিনে আনন্দের নিচে টাটকা শবের মতো
মাটিও পাশ ফিরে শোয়, এসো···
চামড়া বদল করে নিই ;
বসেছি এই আমি নির্বংশ বাবা হয়ে ঘনিষ্ঠ প্রলয়ের ভেতর।
সাজো, গাছ-সংসার সাজো,
এখনই ফিরি হবে প্রলয়ের ভ্রূণ এইখানে,
একটু একটু বদলে যাওয়া ভালো।

প্রবন্ধ

পঃ বঃ দঃ রাঃ, কেঃ সঃ রিঃ অঃ-এর কন্যা, বি, এ, দিয়েছে, সুন্দরী, গৌরবর্ণা, গীটারিস্ট ; সি, এ, ইঞ্জীঃ ব্যাঃ অঃ পাত্র চাই। পশ্চিমবঙ্গীয় দক্ষিণ রাঢ়ি শ্রেণীর এক ভদ্রলোক,—কেন্দ্রীয় সরকারের রিটায়ার্ড অফিসার তাঁর কন্যার জন্য চাটার্ড অ্যাকাউনট্যাণ্ট, ইঞ্জিনীয়ার অথবা ব্যাঙ্ক অফিসার পাত্রের খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কন্যাটি অর্থাৎ পাত্রী গৌরবর্ণা, সুন্দরী, কলেজে শিক্ষিতা এবং গীটার বাজাতে জানেন। এহেন পাত্রীর জন্য পাল্টিঘরের পাত্র চাই। কখনো কখনো বিদেশ প্রত্যাগত মোটা মাইনের পাত্রের অভিভাবক বিজ্ঞাপন দেন, প্রকৃত সুন্দরী ব্যতীত পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন !

এই ভাবে প্রকৃত সুন্দরী অথবা এম-এ পাঠরতা রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীদের ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষায় পণ্যের মতো বিজ্ঞাপিত হতে এবং তারপরে বিবাহিত হতে বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না। অন্যদিকে সুপাত্রটিও প্রায় আলু-পটল কেনার ভাবনায় ভাবিত হয়ে, চরম অসম্মানের মধ্য দিয়ে একটি অতীব সুন্দরী পাত্রীকে বিবাহ করেন। এইভাবেই এখনও মেয়েদের বিয়ে হয় আর ছেলেরা বিয়ে করে। শিবু পণ্ডিতের মন্ত্র এখনও আবৃত্ত হয় 'যত দিন জীবন, ততদিন ভাত-কাপড় প্রদান, স্বাহা।' সাধারণ বিচারে, এই বিবাহে প্রেমের সূচনা অথবা প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি। এই বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত/উচ্চবিত্ত সমাজে রূপবতী না হ'লে এই স্বীকৃতি জুটতে মুশকিল হয়। কজন আর অরুণেশ্বরের নির্মল বোধে পৌঁছতে পারেন,— 'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।'

মার্কস বলেছেন, একটা সমাজকে বোঝা যায় সে সমাজে নারী-জাতির অবস্থান ও মর্যাদা দিয়ে। এর বিপরীতটিও বোধহয় সমান-ভাবেই সত্যি। আমাদের এই আজবদেশে একুশ শতকের ভগীরথ একজন 'আধুনিক' প্রধানমন্ত্রীর স-দাপট উপস্থিতি সত্বেও সতীদাহ, বহুবিবাহ, তালাক, ক্যাবারে, বোর্খা, দেবদাসী প্রথা, বিকৃত আধুনিকতা তথা বিবিধ ব্যাভিচার ক্রমবর্দ্ধমান। এদেশে হবু জামাইকে দেয় পণের বোঝা থেকে জনক-জননীকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য তিন বোন একসঙ্গে গলায় কাপড় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে নির্বিবাদে ঝুলে পড়ে; এদেশে সম্পন্ন পিতামাতা কন্যা সম্প্রদান করতে চান সুউপায়ীর হাতে। এদেশে তাই নারীর মর্যাদা বোঝার জন্য মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না। এমত অবস্থায় প্রেম সম্পর্কে কিছু বলা দুরূহ বৈকি! প্রেম শব্দটির সঙ্গে নারীর মর্যাদা আর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর মর্যাদা-বোধ না থাকলে দুটি নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে রূপজ আকর্ষণ থাকতে পারে কিন্তু বোধহয় প্রেমের উন্মেষ হয় না;—সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়-যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় 'প্রাকৃতিক।'

একজন নারীর পক্ষে বা একজন পুরুষের পক্ষে কোন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এই 'ধ্রুব সম্বল' অর্জন করা নিতান্ত সহজ নয়। কারণ, কোন শ্রেণী বিভক্ত সমাজই নারীকে যোগ্য মর্যাদা দেয় না। গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান ইংল্যাণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলেই (১৮৬৭) জন স্টুয়ার্ট মিল-এর উদ্যোগে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নারীজাতি এ অধিকার পান অনেক পরে, ১৯১৮ সালে। এজন্য তাঁদের অনশন ধর্মঘট পর্যন্ত করতে হয়েছিল। যে সমাজ পুরুষ প্রাধান্যের জন্য নারীকে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার অবাধ স্বাধীনতা পর্যন্ত দেয় না, সে সমাজে নারী-রূপের চাটুকার অনেক থাকতে পারেন কিন্তু 'মোহমুক্ত শক্তির দান' গ্রহণ করার মতো প্রেমিক কি তারা সকলেই হতে পারেন ? এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলিতে সমাজ নবনারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতা দিয়েছিল। প্রেম-বিবাহের স্বাধীনতাকে সমাজ মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কিন্তু এ ধরনের প্রেম-বিবাহও শ্রেণী সমাজের গতিপ্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

সদ্য স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন থেকেই অবশ্য মহিলারা ভোট দিয়ে আসছেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মহিলাদের রাজনৈতিক চিন্তাও পরিবারের প্রধান পুরুষের চিন্তা-ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর অন্যতম কারণ আমাদের দেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের মতো কোন ঘটনা বোধহয় ঘটেনি। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের ভোঁ হঠাৎই আমাদের আধুনিক করে দিল। আমরা সঙ্কর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে লালিত হলাম। অনার্য ধর্মের প্রভাবে আমরা, অর্থাৎ আজকের হিন্দুরা বহুলাংশে মাতৃপূজক ; কিন্তু বিশুদ্ধ 'আর্য রক্ত' আমাদের ধমনীতে, কারণ 'মোক্ষমূলর বলেছে আর্য'। পুরুষ শাসিত আর্য সমাজের ঐতিহ্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। এই বেদ-বেদান্ত রামায়ণ মহাভারতের দেশে মনুবাক্য

আজও অনুসৃত হয়, 'স্ত্রীজাতি, সর্ব অবস্থাতেই পুরুষের অধীন থাকবে। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন।' বাঙলার এক প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে উপহার যোগ্য এক সুরম্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। কিন্তু অধীনের মর্যাদা কোথায়? বৈদিকযুগের পুরোহিত ভোগ্যা কৃষ্ণাঙ্গ যুবতী দাসীর সঙ্গে আধুনিক ভারতের গলায় ফাঁস বাঁধা তিন বোনের মৌলিক তফাৎ কোথায়?

মহামতি ভীষ্ম স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'নারীদের এই দোষ—তারা সদবংশীয়া রূপবতী সধবা হলেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠা কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান রূপবান এবং বশীভূত পতির জন্যও তারা অপেক্ষা করতে পারে না। যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই। পুরুষের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপযৌবনবতী সুবেশা স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরও সেরূপ হতে ইচ্ছা করে···যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধার বিষ সর্প ও অগ্নি—এ সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।'

পিতামহ ভীষ্ম না হয় বিবাহ করেননি, কিন্তু অবতার রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যুদ্ধবিগ্রহ করে তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তুমি জেন এই রণ পরিশ্রম—সুহৃদগণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি—এ তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করার জন্যই আমি এ কাজ করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে। নেত্র-রোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষেও তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অংকে নিপীড়িত হয়েছে, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখেছে,

এখন যদি তোমাকে পূণগ্রহণ করি তবে কি করে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব ?…আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। তুমি সচ্চরিত্রা বা অসচ্চরিত্রা যাই হও, কুক্কুরভুক্ত হবির ন্যায় আমি তোমাকে ভোগের জন্য নিতে পারি না।'

মহাবীর অর্জুন সম্ভবতঃ কূটনৈতিক স্বার্থে বহু বিবাহ করেছিলেন। আজ যেমন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার জন্য তথা রাজনৈতিক স্বার্থে নাগাল্যাণ্ডে গিয়ে নাগাদের পোষাক পরেন আর শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেব গুরুদেব করেন, ঠিক তেমনি অর্জুন যেখানে যেতেন সেখানে একটি বিবাহ করতেন। সত্যবাদী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ার ঝোঁকে দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন, যিনি ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবের সম্পত্তি,—'রাজার ভাগ্যের পাশা খুশিমত মূষিকে নাচায়। ধর্মের জুয়ারী পুত্র বাঁধা রাখে প্রিয়ার যৌবন। কৃষ্ণার কবরী কাঁপে লম্পটের রক্তের তৃষ্ণায়। মধ্যরাতে কাক ডাকে শোনে না বধির দুর্যোধন।'

মহাভারতের 'রহস্যময়' চরিত্র প্রেমিক-প্রবর শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁর প্রেমিকা শ্রীরাধার প্রেমলীলা যুগে যুগে ভারতবাসীর কণ্ঠে কীর্তিত হয়েছে। বিদ্যাপতির মতো কবিরা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এ যুগের অনেক সাহিত্যিককেই লজ্জা দেবে! শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আর যাই থাক, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। এ যুগের অন্যতম পরিশ্রমী গবেষক অধ্যাপক অশোক রুদ্র লিখেছেন, 'বৃন্দাবন লীলা, যার অধিকাংশের মধ্যেই কৃষ্ণের আচরণ অজাতশ্মশ্রু অনভিজ্ঞ বালকের যৌন স্বপ্নের মতই পরিমিতিহীন এবং তার সঙ্গে তার মাতৃস্থানীয়া বয়স্কা নারীকূলের আচরণও একই স্তরের, যাকে জীবাত্মা পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের রূপক হিসাবে প্রচার করতে যে মানসিকতা লাগে তা নিঃসন্দেহে ব্যাধিগ্রস্ত।'

মহাকবি কালিদাস দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার প্রেম-কাহিনী নিয়ে অমর কাব্য লিখে গেছেন। সে কালের রাজারাজড়ার এই প্রেম বা মিলনের ভদ্র রূপটি ছিল গান্ধর্ব বিবাহ। একবার বিবাহটি সেরে এসে এলিট ক্লাসের এই প্রেমিকরা প্রায় কুলীন ব্রাহ্মণের মতোই প্রিয়ার সঙ্গে আর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। এ ধরনের প্রেমে নারী নিতান্তই ভোগ্য বস্তু, এবং প্রেমিকের ব্যবহার অতি-মাত্রায় লজ্জাহীন, দায়িত্বহীন। প্রেমিকের ক্ষণিক মোহের মূল্য দিতে হয়েছিল শকুন্তলাকে প্রায় এ যুগের সহায়হীন নারীর মতোই; আমরা সরোজ দত্ত'র 'শকুন্তলা' কবিতাটি স্মরণ করতে পারি—

দুর্বাসার অভিশাপ, অভিজ্ঞান অঙ্গুরী কাহিনী
স্বর্গ মিলনের দৃশ্য, মিথ্যাকথা হীন প্রবঞ্চনা—
রাজার লালসা-যূপে অসংখ্যের এক নারীমেধ
দৈবের চক্রান্ত বলি' রাজকবি করেছে রটনা।
গৃহস্বামী দেশান্তরে, অরক্ষিত দরিদ্রের ঘরে
নারী-মাংস লোভে রাজা মৃগ-মাংস এল পরিহরি—
অরুচি হয়েছে যার অবিশ্রাম নাগরী বিহারে
তাহার কথার ফাঁদে ধরা দিল অরণ্য কিশোরী।
স্তব্ধ আজি নাট্যশালা, নান্দীমুখ আতঙ্কে নির্বাক,
বিদীর্ণ কাব্যের মেঘ সত্যসূর্য উঠেছে অম্বরে—
দর্শক শিহরি করে নাটিকার মর্মকথা পাঠ;
'বালিকা গর্ভিণী হ'ল লম্পটের কপট আদরে'—
রাজার প্রসাদ ভোজী রাজকবি রচে নাট্যকলা,
অন্ধকার রঙ্গভূমি, ভূলুণ্ঠিতা কাঁদে শকুন্তলা।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জনৈক বিদেশী লেখক লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষ একটি ধর্মীয় মহাদেশ, রাজনৈতিক নয়।' একথা আজও প্রায় সমান ভাবেই সত্যি। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে উচ্চ-চিত্ত সমাজে উগ্র আধুনিকতার পূতিগন্ধ ছড়িয়ে পড়া সত্বেও, ভারতের

সাধারণ মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক চিন্তাও ধর্মের রিচিউয়্যাল আর প্রাতিষ্ঠানিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম-বেত্তাদের দাপটে আর প্রভাবে এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরোক্ষ কখনো কখনো প্রত্যক্ষ সমর্থনে এদেশের মহিলারা অবদমিত। সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাভাবিক সুবিধার জন্য হিন্দু মহিলাদের মননে গণ-তান্ত্রিক ও র‍্যাশনাল চিন্তাভাবনা কিছু পরিমাণে প্রবেশ করলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম-গোষ্ঠী ইসলামের অনুগামীদের ক্ষেত্রে তাও ঘটেনি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরাণ'-এর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে এবং কোন ধার্মিক মানুষকে বিন্দুমাত্র আঘাত দেবার অভিপ্রায় পোষণ না করেও এই পবিত্র গ্রন্থটি থেকে আলোচনার স্বার্থে কিছু অংশ উল্লেখ করছি, 'Women are your fields : go, then, into your fields as you please.' 2 : 223 ; or 'Men have authority over women because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient...As for those from whom you fear disobedience, admonish them and send them to beds apart and beat them.; 4 : 34. এই বিধানের সঙ্গে নারী সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ তফাৎ পাওয়া যায় না,—নারী সর্ব অবস্থাতেই পুরুষের অধীন ভোগ্য বস্তু। এ যুগের ফ্যাসিস্ট দর্শনেও মনে করা হয় ; পুরুষের কাজ যুদ্ধ ও উৎপাদন আর নারীর কাজ সন্তান উৎপাদন।

মধ্যযুগের ভারতে নারীর স্থান চরম অসম্মানের। বহু বিবাহের ছিল ব্যাপক প্রচলন। আমীর বাদশা বা রাজারাজড়া কেউই এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলাম বা ধর্মের বিধান অমান্য করলেও বহু বিবাহের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান এলিট সম্প্রদায় অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ ছিলেন। আজকের বা অদূর অতীতের হিন্দুদের দৃষ্টিতে একমাত্র ভালো মুসলমান শাসক ছিলেন সম্রাট আকবর, যিনি ধর্ম সমন্বয়ে আগ্রহী ও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন।

আজকের শাসকরাও পরধর্ম সহিষ্ণুতার বুলি উচ্চারণের সময় প্রায়শই আকবরের কথা বলে থাকেন। ধর্মপ্রেমী হলেও সম্রাট আকবর নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একথা বলা যায় না। তাঁর মালটি-ন্যাশনাল হারেম-এ তিন শতেরও বেশী স্ত্রী ছিল; সম্রাটের রাজ-নৈতিক প্রভাবে এর এক ধর্মীয় অনুমোদনও সংগ্রহ করা হয়েছিল। হায় নারী!

আমাদের দেশে আধুনিকতার সূচনা 'দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়'। ইংরেজ রাজত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন 'ভারতপথিক' রাজা রামমোহন। একুশ শতকের রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ব মূহূর্তে রূপ কানোয়ার 'সতী' হয়ে গেলেন। আজ তাই রামমোহনের নাম বার বার উচ্চারিত হচ্ছে, কারণ প্রচারিত ইতিহাসে রামমোহন সতীদাহ রদ করার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম আমলে, নেহেরু যাকে 'pure loot' বলেছেন, ইংরেজ বানিয়ার প্ররোচনাতেই সতীদাহ'র ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩ সালের পর থেকে বৃটেনের শিল্প-পুঁজিবাদের পরিকল্পনা মাফিক ভারত শোষণের পালা শুরু হবার পর বেণ্টিক সাহেব সতীদাহ রদ করেন। এ ছিল ব্রিটিশ-পুঁজিবাদের রিফর্মিস্ট চিন্তা। রামমোহন আইন করে সতীদাহ রদ করার পক্ষে ছিলেন না। অন্যদিকে সতীদাহ রদ করার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি প্রথম প্রদর্শন করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন নন। কিন্তু প্রচারিত ইতিহাস অনুসারে নারীমুক্তির পথ নির্মাতা হিসেবে বন্দিত হন রামমোহন। সতীদাহ রদ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও রামমোহন নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে মনে হয় না। রামমোহন মনে করতেন 'তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গন্যা হয়।' রংপুরে থাকার সময় 'ভারতপথিক' শৈব মতে এক 'যবনী'কে বিবাহ করেন যদিও এর পূর্বে তাঁর তিনবার বিবাহ হয়েছিল, তাঁর বালিকা বধূর অবশ্য অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। শৈব বিবাহ'কে আজকের বিচারে

উপপত্নি পোষণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শুধু শৈব বিবাহই নয়, ফ্যানি পার্কাস-এর বিবরণ থেকে জানা যায় 'বঙ্গীয় রেনেসাঁ'র ঘণ্টা বাজার পরেও রামমোহন তাঁর গৃহে বাঈজী নাচাতেন। ইংরেজ অভ্যাগতদের আনন্দদান করার উদ্দেশ্যে রামমোহন তাঁর বাড়ীতে অন্যান্য বাঈজীর সঙ্গে সে যুগের নামকরা নিকি বাঈজীকেও নৃত্য-প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বর্তমান বঙ্গ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়।' আজিকার বঙ্গ তথা ভারতীয় সমাজেও নিকি বাঈজীগন নৃত্য করিতেছেন—অভিজাত ক্লাব ও হোটেলে, মঞ্চে, রূপালী পর্দায়, দূরদর্শনে এবং প্রেমিক-প্রেমিকা সকল তাহা উপভোগ করিতেছেন!

কার্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখেছেন, 'পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা কৃষ্ণনগরেও প্রচলিত হইয়া উঠিল···সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড়প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয়ে লোকে পূর্ণ থাকিত···লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।' শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোন নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়—"ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ি করিয়া দিয়াছেন,' এই বলিয়া পরিচিত করিতেন।' মুৎসুদ্দি শহর কলকাতায় বঙ্গীয় রেনেসাঁর আমলে হুতোম লিখেছেন, 'আজব শহর কলকেতা/রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি/মিছে কথার কী কেতা।' শহর কলকাতা বা বঙ্গভূমি আজও সেই ট্র্যাডিশন অনুসরণ করে চলেছে। আজকের ভদ্রবাবুরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেন 'বান্ধবী চাই'। আমরা যে আরও আধুনিক হয়েছি!

রামমোহন যদি আধুনিকতার উদ্বোধক হন, মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী তাহলে জাতির মুক্তিদাতা—জাতির জনক। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ জীবন সম্পর্কে মহাত্মার চিন্তাভাবনা এক কথায়—

অস্বাভাবিক। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তাঁর উপলব্ধি হয়, 'She became too sacred for sexual love.' পরবর্তীকালে (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭) তিনি এক প্রার্থনা সভায় ঘোষণা করেন,—his aspiration was to become a eunuch not through operation, but to be made such through prayer to God.' এই অভিলাষ সিদ্ধ করার জন্য মহাত্মা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা তাঁর পক্ষে ফলপ্রসূ হলেও নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক নয় ; নারী তাঁর কাছে যন্ত্রমাত্র। এ সম্পর্কে নির্মলকুমার বসু তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, 'When I first learnt in detail about Gandhiji's prayog or experiment, I felt genuinely surprised. I was informed that he sometimes asked women to share his bed and even the cover which he used, and then tried to ascertain if even the least trace of sexsual feeling had been evoked in himself or his companion (এর মধ্যে তাঁর নাতনি মনুও ছিলেন). Personally I would never tempt myself like that ; nor would my respect for woman's personality permit me to treat her as an instrument of an experiment undertaken only for my own sake ...whatever may be the value of the prayog on Gandhiji's own case, it does leave a mark of injury on the personality of others who are not of the same moral stature as he himself is, and for whom sharing in Gandhiji's experiment is no spiritual necessity.' এই মহাদেশে প্রাচীন যুগ থেকে নারীকে বিবেচনা করা হয়েছে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে, আর মহাত্মাজী প্রবৃত্তি যথোচিত ভাবে দমিত হয়েছে কীনা এ পরীক্ষার জন্য নারীকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নারীর মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি এর কোনটিতে নেই। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এটাই স্বাভাবিক। অসুস্থ সমাজে নরনারীর সুস্থ সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষেই স্থাপিত হতে পারে, সর্বক্ষেত্রে নয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বলেছেন,—

'পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।'

নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সমতাবোধ-ই বোধহয় প্রেমের পূর্ব-শর্ত।

যুগে যুগে তবুও প্রেম নিয়ে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটে গেছে। কবিরা অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন কবিতা আর গান। বাইরে যাঁরা নারীস্তুতি রচনা করেন অন্তরে কি তাঁরা সকলেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল? অশোক রুদ্রমশাই একটি গল্প শুনিয়েছেন, গল্পটি আবার শোনা যেতে পারে,—'গল্পটা কল্পনা করা নয়। একেবারে নিরেট সত্য। গল্পের নায়ক-নায়িকারা সকলেই পাঠকদের অতি পরিচিত। বছর কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় দুই ব্যক্তির, যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। কথায় কথায় আমি কোন এক বিশেষ নারী কবির নাম জিজ্ঞাসা করি। তাঁর কবিতা সম্পর্কে এঁরা কি মনে করেন। এঁদের একজন বললেন, "ও-তো কবিতা লিখতেই পারে না। কোন মেয়েই পারে না।" অপরজন বললেন, "কোন প্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাই মেয়েদের মধ্যে কখনও থাকে না। এটা একটি শোচনীয় সত্য। আমি নারীজাতি খুবই ভালবাসি। কিন্তু শয্যায় ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থাতেই নারীর অবদান অকিঞ্চিৎকর।" এই কবিদ্বয়ের মধ্যে মনু, শ্রীকৃষ্ণ, আকবর, রামমোহন প্রমুখ লুকিয়ে আছেন। হায় কবি!

আজকাল নারীমুক্তির কথাটা খুব শোনা যাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে

উগ্র প্রসাধন চর্চিতা স্বল্প বসনা সুন্দরীরা সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছেন, যেন নারীর মেধা নেই, ধী নেই, প্রজ্ঞা নেই, হৃদয় নেই, আছে শুধু রূপ। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে নারীর পণ্য-রূপ ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠছে। সিনেমা আর পত্র-পত্রিকা মারফৎ বিবিধ বিকৃতি প্রচারিত হচ্ছে। উচ্চবিত্তের অনুকরণ প্রচেষ্টায় দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত। নারীমুক্তির প্রশ্নের যে সমাজ মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত, একথাটা বোধহয় 'মুক্ত-নারীদের' বোধগম্য হচ্ছে না। আমরা যে দু'শো বছর দাস ছিলাম, স্বাধীন চিন্তা করব কি করে ?

প্রেম মানুষকে সুন্দর করে, মহৎ করে, পূর্ণ করে, আদর্শ নিষ্ঠ করে। মহীতোষের 'বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর' দিয়েছিল 'রাশিয়ার লক্ষী-খেদানো বাদুড়টা'; তার আদর্শবোধের জন্যই মহীতোষ অমিয়াকে পেয়েছিল, অমিয়া পেয়েছিল মহীতোষকে। তাই অমিয়া বলতে পেরেছিল, "এসেছি তাঁরই কাজে। উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার। আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি'। অমিয়া বললে, 'জেলখানায়'।"

যে সব গ্রন্থ থেকে বিশেষ সাহায্য নিয়েছি—

রথীন দাশগুপ্ত : প্রকৃতি মানুষ ধর্ম শোষণ ; কলকাতা, ১৯৭১।

অশোক রুদ্র : ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন ; কলকাতা, ১৯৮৭

Ronald Segal : The Crisis of India ; Bombay, 1971.

The Koran ; Penguin Books, 1981

ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ।

—

চিত্রা দেব

বাংলা উপন্যাসের ভৌগোলিক সীমা দিন দিন বাড়ছে। দূরকে কাছে নিয়ে আসার দূরন্ত বাসনা উপন্যাসের কাহিনীকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লণ্ডন-প্যারিস-টোকিও-নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন। স্বদেশেও পট-পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত গতিতে। বাইরের জগতের সঙ্গে কি উপন্যাসের ভেতরের জগৎটাও বদলাচ্ছে? পরিবেশ ও পটভূমির সঙ্গে সঙ্গে কি বদলাচ্ছে মানুষের মন? মানবিক হৃদয়ানুভূতির কি পরিবর্তন হয়? বদলায় কি প্রেম, শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস কিংবা প্রত্যয় প্রবণতা?

সাধারণত, বাঙালী লেখক ও পাঠক দুজনেই কম-বেশি রোমান্টিক। ব্যক্তিজীবন যত বেশী তরঙ্গহীন মন তত বেশি বৈচিত্র্যমুখী। 'কিনু গোয়ালার গলি'র হরিপদ কেরানীরা স্বপ্ন দেখে আরব বেদুইনের মুক্ত জীবনের। জীবনে সে প্রেম দুর্লভ গল্প-উপন্যাসের চোরা পথে মনে তার নিত্য যাওয়া আসা শুরু হয়েছে প্রথম থেকেই। পৃথিবীর সব দেশেই একসময় রোমান্স ও প্রেম ছিল গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সেই সব আদর্শ সামনে রেখে বাঙালী লেখকেরা যখন উপন্যাস লিখতে বসলেন তখন তাঁদের অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছিল।

যদিও উপন্যাসের জন্মের আগেকার বাংলা সাহিত্যেও প্রেম ছিল। মধ্যযুগের ধর্মসাহিত্যে এসেছিল প্রেমের জোয়ার। তবু বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা সংস্কৃত কাব্য কিংবা বৈষ্ণব কবিতার নিরবচ্ছিন্ন দেহবাদের অনুপুঙ্খ বর্ণনাকে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেননি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এবং ভিক্টোরিয়ার সাহিত্যের শালিনতা-বোধের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা কাম ও প্রেমের সুস্পষ্ট তফাৎ খুঁজে পেয়েছেন।

সর্বক্ষেত্রেই প্রেমের দুটো স্তর আছে। প্রথমটা প্রাক্-বিবাহ পর্বের দ্বিতীয়টা বিবাহোত্তর জীবনের। 'বিবাহ' কথাটা ব্যবহার করা হল প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ; নয়ত, কষ্টিপাথরের নিরিখে প্রেমকে যাচাই করবার জন্যে বিবাহের প্রসঙ্গ তোলার দরকার নেই। এখানে হয়ত মিলন কথাটিই যুক্তিযুক্ত কিন্তু সর্বকালের ধারণা অনুযায়ী আমাদের কাছে মিলন ও বিবাহ সমার্থক শব্দরূপে গৃহীত হয়েছে বলে 'বিবাহ' শব্দটিই ব্যবহার করা হল। এই দুই পর্বের প্রেমকে বলা যেতে পারে পুর্বরাগ ও উত্তররাগ। বলাবাহুল্য প্রথমটিই মানুষকে আকৃষ্ট করে। সাহিত্যেও পূর্বরাগের চিত্র বেশি। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে দুজনের চোখের আলোয় পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করার আগ্রহ নিয়ে দুটি নরনারীর মন দেয়া-নেয়ার যে কাহিনী গড়ে ওঠে তার প্রতি আমাদের কৌতূহল অসীম।

বাংলা গল্প-উপন্যাস লিখতে বসে, আমার ধারণা, লেখকরা প্রথমে সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রেম নিয়ে। উনিশ শতকের সেই সমাজে বাঙালীর জীবনে প্রেম কোথায় ? সেখানে আছে শুধু বিবাহ। আট বছরের গৌরীদান সবচেয়ে পুণ্যের কাজ !

দেহে মনে যৌবন সঞ্চারের আগেই কম বয়সের ছেলে-মেয়েরা বিবাহিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে একে অপরের কাছে পুরনো হয়ে যেত খুব সহজে। তাদের জীবনে পরস্পরকে নতুন করে জানবার অবকাশ ছিল না। তাতে দাম্পত্য জীবনযাপনে কোন হানি হত না কিন্তু এই দৈনন্দিন জীবনের চেয়ে প্রেম আরও গভীর, আরও বড়, আরও মধুর। জৈব ক্ষুধাকে প্রেমে রূপান্তরিত করতে না পারলে তা উন্নততর সাহিত্যে পরিণত হয় না। এই রূপান্তরের জন্যে দেহকে দৈহিক উপভোগ থেকে কিছুদিন বঞ্চিত করতেই হয়, না হলে প্রেমের মধ্যে তা সার্থক হয় না। অবশ্য প্রেম এমনই এক অনুভূতি যার সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত বা নির্দিষ্ট রেখা বা মাত্রা স্থির করা যায় না। ভুবন-জোড়া প্রেমের ফাঁদ পাতা থাকলেও সকলেই প্রেমে পড়ে না। প্রেম

না থাকলেও জীবন চলে যায়, কিন্তু প্রেমহীনতার অভিশাপ বুকে নিয়ে উপন্যাসের নায়কের জীবন কাটানো খুবই শক্ত ব্যাপার। কাজেই বাঙালী ঔপন্যাসিকদের তাকাতে হল ইংরেজী সাহিত্যের দিকে। বাংলা উপন্যাসে প্রেম এল রোমান্সের হাত ধরে, ছদ্মবেশে। নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেমকে উপস্থিত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এর জন্যে তাঁকে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা, ঘটনা পরম্পরায় আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানা-পোড়েন, মান-অভিমান, লজ্জা-সঙ্কোচ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান—প্রেমের এই বিচিত্র গতি প্রকৃতি নিয়ে একালের লেখকরা বোধহয় চিন্তিত নন অথচ বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব বেশি ভাবতে হয়েছিল। কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ বিশেষ হত না, মেয়েরা থাকতেন অন্দরমহলে, পুরুষের কর্মজগতে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবার কোন সুযোগ মেয়েদের ছিল না। নিকট সম্পর্কের আত্মীয়তা ছাড়া দেখা-সাক্ষাৎও ঘটত না। এমনকি স্বামীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হত শুধু রাত্রে। এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রেমের রূপ ধরে আসত কাম। ভোগ-লালসায় দৈহিক স্তরের ওপরে ওঠার মতো ক্ষমতা কারোরই থাকত না। এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রেমের চিত্র আঁকার প্রথম প্রয়াস সম্ভবত নষ্টনীড়, চারুলতা ও অমলাকে নিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার দেখা হবার ঘটনাটিকে নাটকীয় করে তুলতেন। দুর্যোগের রাতে মন্দিরের দরজা ভেঙে জগৎসিংহের প্রবেশ ও তিলোত্তমার সঙ্গে দেখা হওয়া এমনি ঘটনা। নির্জন বনে নবকুমারের পথ হারানো ও সেখানে কপালকুণ্ডলার আবির্ভাবও এমনি নাটকীয় ঘটনা। নৌকো থেকে নেমে আশ্রয়ের জন্যে যে কুটীরে প্রবেশ করল নগেন্দ্র সেখানেই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শিয়রে বসেছিল কুন্দনন্দিনী, পুকুরঘাটে জলে ডোবা রোহিণীকে উদ্ধার করল গোবিন্দলাল—এই জাতীয় সব প্রথম সাক্ষাতের শুরুতেই আছে নাটকীয় আকস্মিকতা। দেখা হবার পরেই ছিল কথা বলার

পালা। সেও সহজ নয়। কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটে ভালবাসার কথা বলতে পারল না বলেই নগেন্দ্র ভুল বুঝল। সঞ্জীবচন্দ্র শুনেছিলেন, এক ভট্টাচার্য বামুন তার স্ত্রীকে আদর করেছিল, 'তুমি আমার ভুজ্জির চাল, তুমি আমার বিদায়ের ঘড়া' বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা বলেছিল, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। আজকের পাঠকের কাছে দুটোই সমান হাস্যকর! আসলে বাংলা উপন্যাসে প্রেম এসেছিল অতর্কিতে। তৎকালীন জীবনধারাতেও প্রেমের সঞ্চার ছিল আকস্মিক।

সামাজিক উপন্যাসের বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীকে বিধবা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে কুমারীর অভাব ছিল বিধবার নয়। বঙ্কিম নিজেও বলেছেন, 'হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙালী সমাজে ছিল না।' তাই উপন্যাসের প্রেমকে বাস্তব ভিত্তির ওপরে দাঁড় করাবার জন্যে সর্বপ্রথম বিধবাদেরই ডাক পড়ল। রোহিণী কুন্দনন্দিনীর পথ ধরেই এল 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'উমা'র বিনোদিনী (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়), 'স্রোতের ফুলে'র মালতী (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা,' পল্লীসমাজের 'রমা', বড়দিদির 'মাধবী', শ্রীকান্তের 'রাজলক্ষ্মী', চরিত্রহীনের সাবিত্রী ও কিরণময়ী, 'চতুরঙ্গের 'দামিনী' ও আরো অনেকে। সমাজ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাসেও এই ধরণের প্রেমের ছক পাল্টাতে শুরু করে।

অবশ্য বাঙালী লেখকরা যে বিবাহোত্তর প্রেমকে একেবারে বর্জন করেছিলেন তা নয়, পরকীয়া নয় স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও বঙ্কিম-উপন্যাসে আছে। একে নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন উত্তররাগ। আসলে তা পূর্বরাগেরই নামান্তর। শান্তি ও জীবানন্দ, সীতারাম ও শ্রী, ইন্দিরা ও তার স্বামী, পশুপতি ও মনোরমা, প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর স্বামী-স্ত্রী

হয়েও নানা কারণে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন—নতুন করে তাদের কাছে আসা ও ভালবাসা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ ধরণের আরও দুটি অসামান্য উপন্যাস শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা ও রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এবং তার পরেও বাংলা উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল প্রেম। সম্ভবত এ সময়কার সামাজিক পরিবেশেও প্রেম কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবি অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি বাংলা উপন্যাসের পালা বদলে আপন-আপন ভূমিকা রচনা করে নিচ্ছিল।

উপন্যাসের পটভূমি যেমন বদলাচ্ছিল গ্রামের জমিদারবাড়ি থেকে কলকাতার শিক্ষিত পরিবারে তেমনি দেখা-সাক্ষাতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল মন্দির, পুকুরঘাটের বদলে বিকেলবেলার চায়ের আসরে, প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির নিচে, বাড়ির ছাদে। বাংলা উপন্যাসের এসব মনোরম ছবি বিশেষ করে গোধূলির চায়ের আসর ব্রাহ্ম-সমাজের দান। তাঁরা নারী-শিক্ষা ও নারীপ্রগতির ব্যবস্থাই শুধু করেননি দিয়েছিলেন সুস্থ পরিবেশ। অবশ্য তখনও প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছে আকস্মিকতার মধ্যে নায়িকাকে কখনও পড়তে হয়েছে গুণ্ডার হাতে, হঠাৎ নায়ক এসে রক্ষা করেছে তাকে, আলাপ পরিচয়ের পথ খুলে যেত কিংবা রাস্তার মাঝে গাড়ির একটা ঘোড়া হয়ত উঠল ক্ষেপে। হৈ-হৈ ব্যাপারের মধ্যে নায়ক এসে বাঁচাল নায়িকাকে, পরিচয় হল কিংবা শিলং পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে একই পথে এসে গেল দুটো গাড়ি, দুর্ঘটনা হতে-হতে বেঁচে গেল, দেখা হল নায়ক-নায়িকার। চায়ের আসরে সে পরিচয় উঠল গাঢ় হয়ে। হাজারিবাগের মনোরম পরিবেশে নায়ক-নায়িকার হঠাৎ দেখা এরকম কত আছে। যোগেন বসু তাঁর 'মডেল ভগিনী'-তে ব্রাহ্মিকাদের নিয়ে যতই ব্যঙ্গ করুন না কেন বাংলা উপন্যাসে তাঁরা বারবার উপস্থিত হয়েছেন শুচিস্মিতা

লাবণ্য নিয়ে। 'গোরা'র ললিতা ও সুচরিতা, 'নৌকাডুবি'র হেমনলিনী, 'চার অধ্যায়ে'র এলা, শেষের কবিতা'র লাবণ্য, 'গৃহদাহ'র অবলা, 'দত্তা'র বিজয়াকে সেদিনের হিন্দু সমাজে খুঁজে পাওয়া যেত না।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেম অনেকটা ঘরোয়া, বাঙালীর পরিচিত পরিবেশে গড়ে উঠেছে। খুব কাছের মানুষকে ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে ভালবাসার কথা আছে শরৎ সাহিত্যে। সাধারণ হিন্দু সমাজকে নিয়েই উপন্যাস লিখতে হয়েছিল শরৎচন্দ্রকে। তাঁর অনেক রচনায় প্রেম এসেছে সখ্যের হাত ধরে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, শেখর-ললিতা, অতুল-জ্ঞানদা কিংবা দেবদাস-পার্বতীর জীবনে প্রেম এসেছে সখ্যতার সূত্রে, পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায়, বৈঁচির মালা গেঁথে দেবার মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর, ও রমেশচন্দ্রের মাধবী কঙ্কণেও ছিল বাল্যপ্রেম। দেবদাসের জীবনে এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। বাংলা সাহিত্যে দেবদাস শ্রেষ্ঠ না হোক সবার প্রিয় প্রেমিক চরিত্র। ব্যর্থ প্রেমিক মাত্রেই 'দেবদাস'। আসলে আবেগপ্রবণ বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে প্রতাপ কি অমরনাথের মতো দৃঢ় চরিত্রের প্রেমিক খাপ খায় না। দেবদাস আমাদের মনের মতো। সে অনেকদিন ধরে বাঙালী প্রেমিকদের প্রতীক। পার্বতীকে ভালবাসা, তাকে না পেয়ে সুরার আশ্রয় নিয়ে শেষে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া—প্রেমকে মহিমান্বিত করল জীবনে।

শরৎচন্দ্র প্রেমের ক্ষেত্রে আর একটু নতুনত্ব নিয়ে এলেন পতিতার প্রেমের মধ্যে। এ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শোনা গেলেও তিনি শাস্ত্র-নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই হৃদয়কে নীতিনিয়মের ওপরে প্রতিষ্ঠা করলেন। একে বড় রকমের আবিষ্কার হয়ত বলা যায় না, তবু সমাজে বেশ বড় রকমের ঝড় উঠেছিল সেদিন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে তিনি প্রেম নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তার মধ্যেও ছিল নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে বিশেষ সফল না হলেও ঘরোয়া

জীবনে আটপৌরে ভঙ্গীতে প্রেমকে উপস্থাপনা করার মধ্যেই তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা নিহিত রয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনেক কিছুই বদলায়, বদলায় প্রেমের পদ্ধতি, হয়ত বা প্রেমাস্পদও। বাংলা উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব নতুন নয়, 'বিষবৃক্ষে' যার সূচনা হয়েছিল সমাজ এবং পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে বদলে গেলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'চোখের বালি'তে উপন্যাসিকেরা মানসিক জটিলতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। গৃহদাহ, ঘরে বাইরে বা মালঞ্চে দেখা গেছে ত্রিভুজ প্রেমের তিনটি সুস্পষ্ট রূপকে। একদিন যাকে ভালবাসা যায় পরে সেই ভালবাসা অন্য পাত্রে অর্পণ করা যায় কি না এ প্রশ্ন চিরকালের। সমাজ মানুষকে সে স্বাধীনতা দেয় না কিন্তু মন? তাকে কে শাসনের বেড়াজালে বদ্ধ করবে? ঘরে যে এল না 'মনে তার নিত্য যাওয়া আসা' এই তো নিয়ম। অনেক সময় সবকিছু পেয়েও সুখী মানুষের মন বলে ওঠে 'ধরা সে যে দেয় নাই, যারে আমি সঁপিবারে চাই আপনারে'। সুতরাং প্রেমের ক্ষেত্রে জটিলতা থাকে, থেকেই যায়।

বাংলা উপন্যাসে দ্রুত পরিবর্তনের পথ ধরে এর পরেই এল প্রেমের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক বেশি, না মনের সঙ্গে বেশি সে নিয়ে বিতর্ক ও সংশয়। কল্লোল যুগের লেখকরা কঠোর বাস্তববাদী সেজে এলেন সাহিত্য জগতে। রোমান্টিক প্রেমকে বর্জন করবার হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা পেয়েছিলেন ফ্রয়েডীয় মতবাদ। ফ্রয়েড মানবমনের গভীরে পেয়েছিলেন এক নতুন মহাদেশের সন্ধান, যার ফলে জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই গেল বদলে।

বাংলা উপন্যাসে এ সময়ই বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রেমের উপন্যাস লেখা হয়। ইতিপূর্বে প্রেম ছিল উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিষয় কিন্তু সেখানে কাহিনীই ছিল প্রধান কাহিনীর ঠাস বুননের মধ্যে প্রেমই ছিল সবচেয়ে বর্ণাঢ্য নকশা কিন্তু এবার কাহিনী নয়, গবেষণা

শুরু হল প্রেমের প্রকৃতি নিয়ে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এসে সাদা-মাটা প্রেম কাহিনীকে অচল করে দিল। যেন, সুন্দর ফুলটি দেখে মুগ্ধ মানুষকে বৈজ্ঞানিক শোনালেন সাবধান বাণী, সাবধান, ঐ ফুলটি সুন্দর দেখছ, অন্তরালে রয়েছে সৃষ্টির কী বিপুল রহস্য, পুঞ্জীভূত কাম অতএব সাবধান ফুলটিকে সুন্দর বলার আগে ভেবে দেখ।' নানান পটভূমিতে নানান শতের চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে সোহিনীর ল্যাবরেটরি। অন্তত তখনকার বাংলা উপন্যাস পড়ে এ ধারণাই গড়ে ওঠে। এ সময় বঙ্গনারী সম্পূর্ণভাবে গৃহবন্দিনী নয়। একটু চুড়ির শব্দ কি গানের খাতা কি শাড়ির রঙিন আঁচলের আভায় আলোড়ন জাগায় না যুবকদের বুকে। কুড়িয়ে পাওয়া রুমালটা নৃপবালা না নীরবালার তাই নিয়ে শ্রীশ বা বিপিনের মতো গবেষণা করতে বসে না কেউ।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় কারণেও নারীরা ঘরের বাইরে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন। সহশিক্ষা ও মেলা-মেশার পথটাকে কিছুটা সহজ করে দিয়েছিল, উচ্চবিত্ত আধুনিক সমাজে স্বাধীনতা ছিল অনেকটা বেশি। তার ফলে প্রেম সমস্যা নিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হল। দিলীপকুমার রায় প্রশ্ন তুললেন, প্রেমে একনিষ্ঠতা অপরিহার্য কিনা ? একই সময়ে সমান আন্তরিকতা নিয়ে দুজনকে কি ভালবাসা যায় না ? বহুমুখী প্রেম হৃদয়ের দৈন্য না ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয় ? প্রশ্ন প্রশ্নই। উত্তর দেবার দায় পাঠক সমাজের ছিল না। লেখকই কি দিতে পেরেছিলেন ?

আরেক দল লেখক পরীক্ষা শুরু করলেন মুক্ত-প্রেম নিয়ে। আজকের দিনে এসবই পুরনো ব্যাপার এদেশেও এখন 'লিভ টুগেদা'র কথাটা কানে নতুন শোনাচ্ছে না। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' ও রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র বিষয়বস্তু বাধাবন্ধনহীন প্রেম। যদিও তাঁরা প্রেমকে ইন্দ্রিয় জগতের উর্ধ্বেই রেখেছিলেন। বোহেমিয়ান প্রেমের আদর্শে লেখা হ'ল একদিকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' অপর-

দিকে প্রিয় বান্ধবী, দিবারাত্রির কাব্য, বাসরঘর, রজনী হল উতলা,—ভালবাসার ওপর সমাজের নাম সই'য়ে বিশ্বাসী নন এসব উপন্যাসের প্রেমিক-প্রেমিকারা। মূল বিষয়বস্তু কিন্তু প্রেম মনস্তত্ত্ব—শরীরী চেতনা দিয়ে জৈব ক্ষুধাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা।

এই অতিরিক্ত বিশ্লেষণ প্রবণতাই বদলে দিল আজকের সমাজকে অর্থাৎ আধুনিক উপন্যাসের জগৎটিকে। রহস্যের যে আবরণ প্রেমকে ঘিরে থাকে বিজ্ঞান সে কুয়াশার আড়াল ছিঁড়ে ফেলেছে, বাকীটুকু গেছে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে কর্মক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে আসায়। শুধু প্রয়োজন নয়, নারীরা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছেন নিজেদের ভূমিকাটি স্পষ্ট করে তোলার জন্যে। এই পরিবেশে প্রেম যেন সমস্যা নয়। দেখা হওয়া, আলাপ করা, কোনটাই কষ্টকর নয়। বন্ধুত্ব সবার সঙ্গেই হতে পারে। সহকর্মী মানেই প্রেমিক নয়, সহপাঠিনী নয় প্রেমিকা। রাজনৈতিক মতাদর্শে যার সঙ্গে মতের মিল হয়েছে, মনের মিল খোঁজার প্রয়োজন সেখানে ঘটেনি।

সুনীল যমুনাকে দেখেছিল বিয়ে-বাড়িতে। আবার যখন দেখা হল, ভাল লাগল, তখন এগিয়ে এসে যমুনাই কথা বলল সহজভাবে। শেষ পর্যন্ত যমুনার সঙ্গে সুনীলের বিয়ে হয়নি তাতে যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তা ভাবেনি কেউ। সুনীল সহজভাবেই বলেছে, 'তোমার বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করলে না?' আমাদের জীবনে প্রেম, প্রেমের পদ্ধতি, প্রেম সম্পর্কিত ধারণা কেমন করে বদলাচ্ছে তার আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে কুড়ি বছর আগের অনুপম ও অঞ্জলির দ্বিধা ও সংকোচের পাশে বাপ্পা ও ঝুমঝুমের সহজ-স্বচ্ছন্দ মেলামেশায়।

তাদের প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেলেও জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এমন কথা আর বলা যেতে পারে না। এখন প্রেম আর সমগ্র জীবন নয়, জীবনের একটা দিক মাত্র। প্রেমিক-প্রেমিকারা আশা করে একজনের কাছে যা পেল না, আরেকজন তা দিয়ে জীবন পূর্ণ করে দেবে। বিশ্বযুদ্ধ,

দেশ ভাগ, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সব কিছুর সঙ্গেই প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নিটোল গল্পের মতো একটা প্রেমকাহিনীকে আধুনিক উপন্যাস থেকে তুলে আনা শুধু কঠিন নয়, মনে হয় অসম্ভব।

প্রেম সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও কি কমে আসছে? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণে প্রেমের ওপর একটা পাঁচ পাতার বিশাল প্রবন্ধ ছিল। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের সংস্করণে কিন্তু আর প্রেমের ওপর কোন পৃথক রচনা নেই। কারণ, যাই হোক না কেন, প্রেম সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল যে কমে আসছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে পূর্বরাগের ভূমিকা বড় নয়। ব্যস্ত জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে মন দেয়া-নেয়ার সময়ই বা কই? দু'জনের দেখা হচ্ছে কাজের ফাঁকে। কত না জায়গা রেষ্টুরেণ্ট, কফিহাউস, ট্রাম-বাস, কলেজ, সিনেমা-জলসা। ছুটিছাটায় তারা চলে যাচ্ছে বনভোজনে দল বেঁধে কিংবা শুধু দুজনে জলভ্রমণে নৌকোয় চড়ে।

এখনকার উপন্যাসের লক্ষ্যবস্তু শুধু প্রেম নয়, নায়ক-নায়িকার প্রেমে পড়া নয়, তার পরের কথা। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ যে দুজন আবিষ্কার করে বসে তারা পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে তখন দেখা দেয় সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা। উপন্যাস লেখা শুরু হল যারা আর্থিক বা সামাজিক কারণে প্রেমকে পরিণত রূপ দিতে পারছে না তাদের নিয়ে, যারা ভালবাসে অন্তরঙ্গভাবে দু-চারবার মিলিতও হয়েছে অথচ বিয়ের মধ্যে প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি তাদের নিয়ে, যারা ভালবেসে বিয়ে করেও নিজেদের ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে না পেরে মানসিক কষ্ট পাচ্ছে তাদের নিয়ে, যারা আইনের সাহায্যে বিয়ে ভেঙে ফেলেও মনের দিক থেকে প্রেমকে অস্বীকার করতে পারছে না তাদের নিয়ে।

হয়ত কিছুদিন পরেও এসব বিষয় পুরনো হয়ে যাবে। সমাজ বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে সমস্যার প্রকৃতি। বদলাচ্ছে মানুষের মন। পুরনো ছক ভেঙে যাচ্ছে। গড়ে উঠছে কি নতুন কোন বৃত্ত? ভাবকে বলয়িত করে নেবার একটু অবসর? না কি সেক্স আর লিবিডোই মানব-জীবনের শেষ কথা? প্রেমের মধ্যে কোন রহস্য নেই বলে তাকে নির্বাসন দেওয়া হবে সাহিত্য থেকে? সুদূর ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, তবে এখনই বাংলা উপন্যাসের জগৎ থেকে প্রেম বিদায় নিতে চলেছে মনে হয় না। প্রেমকে ভালবাসবার মতো মানুষ আমাদের মধ্যে চিরকালই ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে।

—